দ্যা রিভার্টস

ফিরে আসার গল্প

রূপান্তর

সামছুর রহমান ওমর

কানিজ শারমিন

আফগান যুদ্ধ কাভার করতে এসে তালেবানদের হাতে ধরা পড়লেন এক নারী সাংবাদিক। অন্যদিকে, ফিলিস্তিনের গাজায় এসে আটকে গেলেন এক ব্রিটিশ তরুণী। তারপর কী হলো তাদের?

একজন খ্রিষ্টান পাদ্রী, একজন ধার্মিক বৌদ্ধ, অনুশাসন মানা একজন হিন্দু যুবক আর মামার আমন্ত্রণে ফিলিস্তিনে ঘুরতে আসা পোল্যান্ডের এক ইহুদী তরুণ। চার ধর্মের চারজন। কেমন করে পাল্টে গেলেন সবাই?

বাবরি মসজিদ নিজ হাতে ভেঙেছেন বলবির সিং। এক সময়ে যা নিয়ে অনেক গর্ববোধ করতেন। কিন্তু তার মনে কীসের এত ব্যথা আজ? বাবরি মসজিদ ভেঙে দেয়া হাত আজ কেন মসজিদ গড়ার কাজে ব্যস্ত?

লন্ডনের বুকে বেড়ে ওঠা তিন যুবক। টাকা-পয়সা, অর্থ-বিত্ত, খ্যাতির কোনো অভাব নেই। তবুও শান্তি নেই মনে। শান্তির আশায় কত কী করে গেলেন! পেয়েছিলেন কি?

আধুনিক আমেরিকার দুজন মানুষ। একজন অবিশ্বাসী নাস্তিক। অন্যজন সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের স্বপ্নে বিভোর। দুজনের জীবনে নাটকীয় পরিবর্তন এল। কিন্তু কী করে?

MTV চ্যানেলের বিশ্বখ্যাত এক উপস্থাপিকা। পুরো ইউরোপের ঘরে ঘরে পরিচিত মুখ। একদিন দেখা হলো পাকিস্তানের বিশ্বকাপ জয়ী ক্রিকেটার ইমরান খানের সাথে। তারপর?

জানতে হলে পড়ুন 'দ্যা রিভার্টস: ফিরে আসার গল্প'। চিন্তা, দর্শন ও জীবন পরিবর্তনের মোট ১৩ টি গল্প নিয়ে সাজানো এই বই।

সামছুর রহমান ওমর।

জন্ম নোয়াখালী জেলায়। নোয়াখালী কারামতিয়া আলিয়া মাদ্‌রাসা থেকে দাখিল এবং তামিরুল মিল্লাত কামিল মাদ্‌রাসা থেকে আলিম সম্পন্ন করেছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগ থেকে মাস্টার্স শেষ করেছেন। বর্তমানে বাংলাদেশ সুপ্রিমকোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে আইনজীবী হিসেবে প্র্যাকটিস করছেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি দুসন্তানের জনক।

কানিজ শারমিন সিঁথি।

পৈতৃক বাড়ি ঢাকার দোহারে। জন্ম, বেড়ে ওঠা টাঙ্গাইলে। বিন্দুবাসিনী সরকারি গার্লস স্কুল থেকে এসএসসি এবং মোহাম্মাদপুর প্রিপারেটরী গার্লস স্কুল এন্ড কলেজ থেকে এইচএসসি পাস করেন। মাস্টার্স শেষ করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'তথ্যবিজ্ঞান ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা' বিভাগ থেকে। বর্তমানে তিনি অনলাইনভিত্তিক বিভিন্ন পোর্টালে নিয়মিত লেখালেখি করছেন।

প্রচ্ছদ: এস এম অর্ণব হাসান রিফাত

www.pathagar.com

দ্যা রিভার্টস : ফিরে আসার গল্প

রূপান্তর : সামছুর রহমান ওমর
কানিজ শারমিন সিঁথি

গার্ডিয়ান
পা ব লি কে শ ন

www.pathagar.com

দ্যা রিভার্টস : ফিরে আসার গল্প

রূপান্তর : সামছুর রহমান ওমর

কানিজ শারমিন সিঁথি

গার্ডিয়ান পাবলিকেশন

৩৪, নর্থব্রুক হল রোড, মাদরাসা মার্কেট (২য় তলা)

বাংলাবাজার ঢাকা- ১১০০

✆ ০১৭১০-১৯৭৫৫৮, ০১৯৯৮-৫৮৪৯৫৮

০২-৫৭১৬৫৫১৭

guardianpubs@gmail.com

www.guardianpubs.com

অনলাইন পরিবেশক:

www.rokomari.com

www.boibajar.com

প্রথম প্রকাশ : ১০ ফেব্রুয়ারি, ২০১৮

গ্রন্থস্বত্ব: লেখক

শব্দ বিন্যাস: মো: জহিরুল ইসলাম

প্রচ্ছদ: এস এম অর্ণব হাসান রিফাত

মুদ্রণ: মো: আমিনুল ইসলাম

মূল্য : ৩৫০.০০

ISBN- 978-984-92959-8-3

The Reverts by Shamsur Rahman & Kanij Sharmin.
Published by Guardian Publications, Price Tk. 350 Only.

www.pathagar.com

প্রকাশকের কথা

ইবলিশের চ্যালেঞ্জের মাধ্যমেই লড়াইটা শুরু হয়েছিল। আজ অবধি সে লড়াই অব্যাহতভাবে চলছে। তখন থেকে এখন, ইবলিশ তার মিশনে সদা তৎপর। জাহেলিয়াতের সমস্ত উপায়-উপকরণ ব্যবহার করে মানুষদের ঈমানচ্যুত করার প্রচেষ্টা চলেছে, চলছে। তবুও ইসলাম তার আপন মহিমায় ফুলেল সৌরভ বিলিয়ে যাচ্ছে পৃথিবীর প্রতি ইঞ্চি মাটিতে। স্বভাব বৈশিষ্ট্য দিয়ে ইসলাম ঈমানদারদের বিশ্বাসের ভিত্তিকে কেবল সুদৃঢ়ই করেনি; একই সাথে অবিশ্বাসীদের চিন্তার সাগরেও ঢেউ তুলেছে তুমুল বেগে। দুনিয়ার সকল তন্ত্র-মন্ত্র-আদর্শ ইসলামের পতাকাতলে লুটিয়ে পড়েছে অনিবার্যভাবে। আধুনিক সভ্যতার মোড়কে চাকচিক্যময় দুনিয়ার কৃত্রিম আলোকোজ্জ্বল উপস্থাপনাও জাহেলিয়াতকে রক্ষা করতে পারছে না। শান্তির সন্ধানে দিগভ্রান্ত লাখো মুসাফির পরম আশ্রয় হিসেবে ইসলামের বর্মই পরিধান করছে। এ যেন মরুর বুকে তৃষ্ণার্ত পথিকের শীতল পানির সন্ধান পাওয়া!

'দ্যা রিভার্টস : ফিরে আসার গল্প' বইয়ে আমরা এমনই তৃষ্ণার্ত ১৩ জন মানুষের ইসলামের পতাকাতলে প্রশান্তি খুঁজে পাওয়ার গল্প পড়ব। বিভিন্ন ধর্ম ও বিশ্বাসের ভাইবোনদের হৃদয়ের হাহাকার দেখব। ইসলামের কোন সম্মোহনী শক্তি তাদের টেনে ধরল, কোন সে পরশপাথর তাদের হৃদয়কে বিগলিত করল, কী তাদের ইসলাম গ্রহণের মতো এত বড় সিদ্ধান্ত নিতে স্পৃহা যোগাল- প্রতিটি গল্পে তার উত্তর পাবেন ইনশাআল্লাহ। অবিশ্বাসীরা প্রতিটি গল্পের সাথে নিজেদের জীবনধারা মিলিয়ে নিতে পারবেন। আমরা বিশ্বাসীরাও হৃদয় থেকে উপলব্ধি করতে সক্ষম হব, জন্মসূত্রে কত মূল্যবান পরশমণি পেয়েছি।

সামছুর রহমান ওমর ও কানিজ শারমিন দম্পতিকে বিশেষ ধন্যবাদ জানাতে চাই। বইটি নিয়ে উভয়ই অনেক শ্রম দিয়েছেন। অত্যন্ত প্রাঞ্জল ভাষায় গল্পগুলো সাজিয়েছেন। এই বইটি পাঠকদের হাতে তুলে দিতে পেরে *গার্ডিয়ান পাবলিকেশন* অত্যন্ত আনন্দিত ও উচ্ছ্বসিত। বইটি বাংলাভাষী পাঠকদের হৃদয় স্পর্শ করবে বলে আমাদের বিশ্বাস। বিশ্বাসের আলোয় আলোকিত হোক প্রতিটি প্রাণ।

মা'আসসালাম
নূর মোহাম্মাদ আবু তাহের
বাংলাবাজার, ঢাকা
৮ ফেব্রুয়ারি, ২০১৮

www.pathagar.com

www.pathagar.com

লেখকের কথা

আপনাদের একটা গল্প শুনাই। আমাদের খুব প্রিয় একটা গল্প।

খলিফা মামুনের সময়ের ঘটনা।

দেশব্যাপী খরা চলছিল। প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষ ক্ষুধা ও দরিদ্রের মাঝে থেকে কঠিন সময় পার করছিলেন। তেমনি এক প্রত্যন্ত গ্রামের মরুচারী বেদুইন ঠিক করলেন, খলিফার সাথে দেখা করবেন। জানাবেন তার কষ্টের কথা।

যেই ভাবা সেই কাজ। বেদুইন যাত্রা শুরু করলেন রাজধানী বাগদাদের পথে। অনেক দূরের পথ। বাহন বলতে কিছুই নেই। একমাত্র পায়ে হাঁটাই সম্বল। মরুভূমি পাড়ি দিয়ে পথ চলতে চলতে বেদুইন ক্লান্ত হয়ে পড়লেন। যতদূর চোখ যায়, পানির কোনো দেখা নেই। বেদুইন তবুও ক্লান্ত অবসন্ন দেহ টেনে নিয়ে সামনে চলল। খলিফার দেখা যে তাকে পেতেই হবে।

বেশ কিছুটা পথ চলার পর বেদুইন থমকে দাঁড়ালেন। এ কি! পানি দেখা যাচ্ছে? বেদুইন দৌড়ে এলেন। এক জায়গায় এক গর্তে আসলেই পানি জমে আছে। তৃষ্ণার্ত বেদুইন দুহাতের আজলা ভরে চুক চুক করে সবটুকু পানি পান করলেন। আহা! এ যে অমৃত! এত মিষ্টি, এত চমৎকার পানি যে আর জীবনেও সে পায়নি।

বেদুইন মনে মনে আল্লাহকে ধন্যবাদ জানালেন। তার মনে হলো, আল্লাহ অনেক মেহেরবান। এ পানি জান্নাতের না হয়ে পারেই না। আল্লাহ নিশ্চয় দয়া করে শুধু তার জন্যই এ পানি পাঠিয়েছেন। সে মনে মনে ভাবল, খলিফার কাছে যখন যাচ্ছি, তখন উনার জন্য উপহারস্বরূপ এ জান্নাতের নেয়ামত নিয়ে গেলে খলিফা যা খুশি হবেন না!

বেদুইন সে পানি একপাত্রে ভরে হাজির হলেন রাজদরবারে। খলিফা খেয়াল করলেন, এই অপরিচিত লোকটি এক কোণে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু কিছু বলছে না। বোধহয় সাহস করে উঠতে পারছে না।

www.pathagar.com

খলিফা নিজ থেকেই তার পরিচয় জানতে চাইলেন। লোকটি তার পরিচয় জানাল। তারপরে গর্বভরে বলল, 'মহামান্য খলিফা! অভাবে পড়ে আমি আপনার কাছে এসেছি। তবে আমি নিঃস্ব হলেও আপনার দরবারে একেবারে খালি হাতে আসিনি। আমি আপনার কাছে আসার সময় পথিমধ্যে এক জান্নাতি নেয়ামতের সন্ধান পেয়েছি। সে নেয়ামতের পানি আমি আপনার জন্য নিয়ে এসেছি। সে পানি এত মিষ্টি, এত চমৎকার...যার তুলনা পৃথিবীতে বিরল।'

খলিফা আগ্রহভরে সে পানি মুখে তুললেন। কয়েক চুমুক দিয়ে এক পাশে সরিয়ে রাখলেন। তারপর উজ্জ্বল চোখে বেদুইনের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তোমার নিয়ে আসা পানি আসলেই অত্যন্ত মিষ্টি এবং খুব চমৎকার। এর তুলনা সত্যিই বিরল। তুমি যে এত কষ্ট করে আমার জন্য এই পানি নিয়ে এসেছ, আমি এই জন্যে তোমার কাছে কৃতজ্ঞ। আমি তোমাকে কিছু স্বর্ণমুদ্রা দিচ্ছি। তুমি তা নিয়ে বাড়ি ফিরে যাও। এখান থেকে বেরিয়ে আর সামনে যাওয়ার দরকার নেই।'

দরবারে উপস্থিত লোকজন তো অবাক। কী এমন মহামূল্যবান পানীয়, খলিফা যার এত উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলেন! খলিফার দরবারে নিয়ম ছিল, কেউ কোনো খাবার জিনিস আনলে, খলিফা অন্যদেরকেও তা খেতে দেন। কিন্তু এই পানীয় খলিফা কাউকে খেতেও দিলেন না। আবার লোকটিকে বললেন, যেন সামনের দিকে না যায়। এসবের মানে কী?

লোকটি চলে যেতেই সবাই খলিফার কাছে এর ব্যাখ্যা জানতে চাইলেন।

খলিফা এক গাল হেসে বললেন 'এই পানির মতো এত বিস্বাদ পানি আমি আমার জীবনেও খাইনি। কাল রাতে বৃষ্টি হয়েছিল। পথের মাঝে কোনো এক গর্তে হয়তো বৃষ্টির পানি জমেছিল। লোকটা সেই পানি আমার কাছে বয়ে নিয়ে এসেছে। বেচারা মরুভূমির মানুষ। সুপেয় পানি খুব একটা চোখে দেখেনি। পাশাপাশি পথ চলতে চলতে তৃষ্ণার্ত ছিল। এ অবস্থায় এই পানি তার কাছে অমৃত মনে হয়েছে। সে আন্তরিকতা থেকেই আমার জন্য নিয়ে এসেছে। এখন আমি যদি আপনাদের কাউকে এই পানি খেতে দিতাম, তাহলে তো রহস্য ফাঁস হয়ে যেত। শুধু শুধু মানুষটা সবার সামনে লজ্জা পেত। আমি তাকে নিষেধ করেছি, যাতে সে সামনে না আগায়। কারণ, আর কিছুদূর গেলেই দজলা-ফোরাত। দজলা-ফোরাতের কাছে এই পানির স্বাদ তুচ্ছ। সে পানি পান করলে তার ভুল ভেঙে যেত। আমি চাইনি, লোকটা এক ধরনের অনুশোচনায় পুড়ুক। যেন তার এ অনুভূতি না হয়, হায় হায় আমি খলিফাকে কী দিয়ে এসেছি!'

www.pathagar.com

আমরা যারা ইসলামকে জন্মসূত্রে পেয়েছি, আমরা এর মর্ম বুঝতে পারি না। কিন্তু যারা অমুসলিম পরিবেশে বেড়ে উঠেছেন তারা বোঝেন 'ইসলাম' আল্লাহ তায়ালার কত বড় নেয়ামাত। তাদের অবস্থা মরুভূমির সেই তৃষ্ণার্ত মুসাফিরের মতো। তাদের হৃদয় অসীম তৃষ্ণায় শুষ্ক। প্রখর রৌদ্রে সুকোমল পানীয়ের মতোই 'ইসলাম' তাদের দেহ-মনে তৃপ্তি আনে। ইসলাম তাদের কাছে অনেক কষ্টে সাগর সেচে আনা মুক্তো দানার মতো। ঝলমলে উজ্জ্বল। যার জ্বলজ্বলে আলো আঁধারের মাঝেও জ্বালে আলোর রেখা।

এই বইয়ে আমরা চেষ্টা করেছি ১৩ জন মানুষের কাহিনি তুলে আনতে। হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান, ইহুদি... তারা এসেছেন একেকজন একেক ধর্ম থেকে। এদের মধ্যে আছেন বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ। এই বইয়ের কাহিনিগুলো বেশিরভাগই ইউটিউব থেকে সংগ্রহ করা। 'MTV থেকে মক্কা' ও 'মক্কার পথে' কাহিনি দুটো তাদের লেখা বই থেকে নির্বাচিত অংশের রূপান্তর। মুহাম্মাদ আমিরের কাহিনি লেখা হয়েছে কয়েকটি পত্রিকা ও অনলাইন পোর্টাল অবলম্বনে।

এই গল্পগুলোকে বই আকারে প্রকাশ করার সুযোগ দেয়ার জন্য বিশেষ ধন্যবাদ *গার্ডিয়ান পাবলিকেশন*-কে। ধন্যবাদ জানাই আমাদের আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ও অনলাইনের পাঠক-পাঠিকাদের, যারা নিয়মিত আমাদের উৎসাহ যুগিয়েছেন। পরিশেষে অপরিসীম কৃতজ্ঞতা আমাদের বাবা-মায়েদের প্রতি, যাদের ঐকান্তিক প্রেরণা ও উৎসাহ না পেলে লেখালেখির জগতে আমাদের হাতেখড়ি হতো না। আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কাছে প্রার্থনা, তিনি যেন আমাদের বাবা-মাকে তার প্রিয় বান্দা হিসেবে কবুল করে নেন। দুনিয়া ও আখিরাতে তাদের কল্যাণ দান করেন। আমিন।

'দ্যা রিভার্টস'-এর প্রতিটি কাহিনিই মর্মস্পর্শী। প্রতিটি গল্পই আঁধার থেকে আলোর পথে ফেরার আনন্দে উদ্বেল। প্রতিটি বর্ণনার ফাঁকে ফাঁকে লুকিয়ে আছে জীবনের সঠিক মানে খুঁজে পাওয়ার আকুতি, ইসলামের সংস্পর্শে এসে নিজের জীবনকে রাঙানোর পরিতৃপ্তি।

আসুন তাদের মতো করেই, আমরা জীবনকে সাজাই, জীবনকে রাঙাই।

'মুছে যাক সব হতাশা, কষ্ট, গ্লানি
চোখ জুড়ে থাক আশার চাহনি।'

সামছুর রহমান ওমর
কানিজ শারমিন সিঁথি
ঢাকা, ফেব্রুয়ারি– ২০১৮

www.pathagar.com

www.pathagar.com

সূচিপত্র

বন্দি থেকে মুসলিম ১৩
ইভন রিডলি

আমি ইউসুফ এস্টেস বলছি ৪১
ইউসুফ এস্টেস

আসুন বলি 'আলহামদুলিল্লাহ' ৫৮
লরেন বুথ

জীবনের মানে খুঁজতে গিয়ে ৬৬
আব্দুর রহিম গ্রিন

রহস্যময় কুরআন ৮৬
ড. জেফরি ল্যাং

বৌদ্ধ থেকে আলোর পথে ১০০
হুসাইন ইয়ি

মসজিদ ভাঙা হাত আজ মসজিদ গড়ার কারিগর ১০৪
মুহাম্মাদ আমির

শৈলেশের গল্প ১১৫
সালাহ উদ্দিন প্যাটেল

পথহারা এক মুসাফির ১২৪
ইউসুফ চেম্বারস

কমিউনিজমের হাত ধরে ১৩৩
ড. আবু আমিনাহ বিলাল ফিলিপস

মক্কার পথে ১৪৭
মুহাম্মাদ আসাদ

এক পপ স্টারের আত্মকাহিনি ১৬০
ইউসুফ ইসলাম

MTV থেকে মক্কা ১৬৬
ক্রিসটিন বেকার

www.pathagar.com

www.pathagar.com

বন্দি থেকে মুসলিম

ইভন রিডলি

এক

২০০১ সালের ৯ই সেপ্টেম্বর।

দিনটার কথা মনে হলেই এক ভয়ংকর দৃশ্য চোখের সামনে ভেসে ওঠে। দু-দুটো প্লেন এক এক করে ঢুকে গেল বিশাল টুইন টাওয়ারের পেটের ভেতর। ভোজবাজির মতো ধ্বসে পড়ল আকাশছোঁয়া দুটি টাওয়ার। জ্বলে-পুড়ে ছাই হয়ে গেল অনেক মানুষ। এই ঘটনাই যে আমার জীবনটা এমন করে পাল্টে দিবে, তা কে জানত!

ও হ্যাঁ, আমার পরিচয়টা আগে দিয়ে নিই। আমার নাম 'ইভন রিডলি'। পেশায় সাংবাদিক। আমি তখন কাজ করতাম লন্ডনের 'সানডে এক্সপ্রেস' পত্রিকায়।

আমাকে একজন ফোনে বলল, 'জলদি তোমার টিভি ছাড়ো, টুইন টাওয়ারে হামলা হয়েছে। সব চ্যানেল ব্রেকিং নিউজ দেখাচ্ছে'। টিভিতে যা দেখলাম, তা নিজের চোখকে বিশ্বাস করাতে পারছিলাম না। প্রথমটায় ভাবলাম, এটা বোধহয় কোনো দুর্ঘটনা। কিন্তু না, আমাকে অবাক করে দিয়ে কিছুক্ষণের মধ্যে দ্বিতীয় আরেকটি প্লেন সোজা ঢুকে গেল টাওয়ারে। নিমিষেই ধ্বসে পড়ল টুইন টাওয়ার, আমেরিকার অহংকার।

কিছু সময় পর সবার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল– এটি নিছক কোনো দুর্ঘটনা নয়। এটি ছিল পরিকল্পিত সন্ত্রাসী হামলা। আমি উপলব্ধি করলাম, পেশাগত কারণে খবর সংগ্রহের জন্য আমার খুব দ্রুতই নিউইয়র্ক যাওয়া উচিত।

কিন্তু আমেরিকাগামী সব ফ্লাইট বাতিল করা হয়েছে। বন্ধ করে দেয়া হয়েছে আমেরিকার সীমান্ত। পৃথিবীর যেকোনো প্রান্ত থেকে আমেরিকাতে ঢোকা এখন খুব কঠিন।

www.pathagar.com

লন্ডনের হিথ্রো এয়ারপোর্টে তখন আমেরিকান মানুষদের ভিড়। নিজ দেশে স্বজনদের কাছে ফেরার জন্য সবাই ব্যাকুল। দ্রুত আমেরিকায় ফিরতে সবাই সর্বোচ্চ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। পরিস্থিতি একটু স্বাভাবিক হলে তাদেরকেই অগ্রাধিকার ভিত্তিতে টিকেট দেয়া হচ্ছিল। অনেক চেষ্টায় চারদিন পর আমি নিউইয়র্কগামী প্লেনের টিকেট পেলাম।

বোর্ডিং পাসের জন্য অপেক্ষা করছি। এমন সময় আমার সম্পাদকের ফোন এল- 'রিডলি!'

আমি তাকে সারপ্রাইজ দেয়ার ভঙ্গিতে বলে উঠলাম, 'জানো, আমি টিকেট পেয়ে গেছি। অল্পক্ষণের মধ্যেই প্লেনে উঠতে যাচ্ছি।'

ওপারে কিছু সময়ের নিরবতা।

তারপর উত্তর এল, 'রিডলি! আমাদের পরিকল্পনায় কিছুটা পরিবর্তন এসেছে। তুমি সোজা পাকিস্তান চলে যাও। তারপর আফগানিস্তান।'

'কী!' আমি নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। 'আফগানিস্তান?'

'হুম! ঘটনার শুরু আফগানিস্তান থেকে। সারা পৃথিবীর চোখ এখন সেদিকেই থাকবে। তোমার যাত্রা শুভ হোক।' লাইনটা কেটে গেল।

আমার বাক্স বোঝাই শীতের কাপড়। আমি দাঁড়িয়ে আছি নিউইয়র্কগামী প্লেনের লাইনে। আমাকে কিনা এখন যেতে হবে মরুর দেশ আফগানিস্তানে। অবিশ্বাস্য! কী আর করা! আমেরিকার টিকেট বাতিল করে দুবাইয়ের টিকেট কাটলাম। দুবাই হয়ে পৌঁছালাম পাকিস্তানে।

আফগানিস্তানের ভিসা পাওয়ার জন্য আমি তিন-তিনবার চেষ্টা চালালাম। ভিসা পেলাম না। অথচ সংবাদ সংগ্রহের জন্য আফগানিস্তানে না গেলেই নয়। এখন উপায়?

বিবিসি'র সাংবাদিক জন থমসন এক অভিনব বুদ্ধি বের করল।

দুই

জন থমসন একদিন আমার কাছে এসে বলল, 'দেখ! আমি পুরোপুরি অদৃশ্য হয়ে গেছি'। জনের পা থেকে মাথা পর্যন্ত পুরোটাই কালো বোরকায় ঢাকা। সামনে বিরাট এক মূর্তি, অথচ তাঁর শরীরের কিছুই দেখা যাচ্ছে না।

www.pathagar.com

তাৎক্ষণিক আমার মাথায় দারুণ বুদ্ধি খেলে গেল। আমি ভাবলাম, 'আরে এরকম বোরকা পরে তো আমিও অদৃশ্য হয়ে যেতে পারি। তারপর ঢুকে যেতে পারি আফগানিস্তানে। জন থমসন অদৃশ্য হয়ে যেতে পারলে, আমি কেন নয়?'

আমার দুই গাইডের একজন পাকিস্তানি, আরেকজন জন্মসূত্রে আফগান। তাদের সাথে বসে দারুণ এক বুদ্ধি আঁটলাম। ঠিক হলো, আমরা বিয়ে বাড়ির লোক সাজব। আমি থাকব বোরকায় ঢাকা। তারপর কোনো বিয়ের অনুষ্ঠানে যাচ্ছি এমন ভাব করে ঢুকে পড়ব আফগানিস্তানে।

যেই ভাবা সেই কাজ।

একদিন আমরা পাকিস্তান সীমান্ত ঘেঁষে আফগানিস্তানের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম। আমাদের গাড়ি তখন চলছিল 'খায়বার পাস'[১] দিয়ে। খায়বার পাস পৃথিবীর সবচেয়ে বড় গিরি উপত্যকা। দুপাশে পাহাড় আর সবুজ ভূমিঘেরা চমৎকার সব দৃশ্য। আমার ধারণাই ছিল না, খায়বার পাস এত বড়! আমি মনে করেছিলাম, এটার দৈর্ঘ্য সর্বোচ্চ ৩০ গজ হবে। আসলে এর দৈর্ঘ্য ৩৪ মাইল। ইস! কী বোকাই না ছিলাম আমি!

আমার মনে তখন চিন্তার ঝড়। আফগানিস্তান! না জানি সেখানকার মানুষগুলো কেমন? বুশ-ব্লেয়ারের ভাষায় সেখানে 'শয়তানের শাসন' চলছে। মহিলারা চরম নির্যাতিত এবং নিষ্পেষিত জীবনযাপন করছে। অধিকার বলতে তাদের কিছুই নেই। তালেবান শাসকেরা এতই খারাপ যে, ছোট বাচ্চাদেরও ঘুড়ি উড়াতে দেয় না।

কিছুদিনের মধ্যে শুরু হবে যুদ্ধ। পৃথিবীর সবচেয়ে ধনী দেশ, সবচেয়ে গরিব দেশের উপর হামলা চালাবে। না জানি সেখানকার মানুষগুলো কী ভাবছে?

হঠাৎ ঝাঁকুনিতে আমার চিন্তার রেশ কেটে গেল। তাকিয়ে দেখি আমাদের গাড়ি থেমে গেছে। আমরা দাঁড়িয়ে আছি 'নো ম্যানস ল্যান্ডে'[২]। একটু দূরেই আফগানিস্তান সীমান্ত।

আমরা দুরু-দুরু বুকে এগিয়ে গেলাম চেকপোস্টের দিকে। ভয়াল দর্শন সব প্রহরী দাঁড়িয়ে আছে সেখানে। মাথায় পাগড়ি, ইয়া লম্বা আলখাল্লা, মুখে লম্বা দাড়ি। ভয়ংকর তাদের চাহনি। তাদের হাতের 'কালাশনিকভ' রাইফেল সূর্যের আলোয় চকচক করছে। আমার বুকের ভেতর তখন দুম দুম ড্রাম বাজছে। এতটাই জোরে যে, আমি নিজের কানে শুনতে পাচ্ছিলাম হৃদপিণ্ডের আওয়াজ।

একবার মনে হলো উল্টো দিকে ফিরে দৌড় দিই। কিন্তু তখন আর পেছন ফিরে যাবার উপায় ছিল না।

www.pathagar.com

অবাক কাণ্ড! ওরা আমার দিকে ভালো করে তাকালই না। একবারের জন্যেও না। হয়তো বিরাট বোরকার আড়ালে কোনো মহিলা ভেবেই। গাইডরা আমাকে ভিন্ন এক আফগানি মহিলা বলে পরিচয় দিল। ভুয়া একটি আইডি কার্ডও দেখাল।

একটু পরে গাড়িতে চড়ে বসলাম। আমার তখন দারুণ রোমাঞ্চ অনুভব হচ্ছিল, 'শেষ পর্যন্ত আফগানিস্তানে চলে এলাম। পুরুষ শাসিত আফগানিস্তান... যা নিয়ে পাশ্চাত্যে দুর্নামের শেষ নেই।'

আমরা এসে পৌঁছলাম 'জালালাবাদ'। এটা আফগানিস্তানের অন্যতম বড় এক শহর। একটা বড় মার্কেটের সামনে এসে গাড়ি থামালাম। দেখি, পুরুষেরা কাঁধে করে বাজারের বড় বড় ব্যাগ নিয়ে বেরুচ্ছে। ভাবলাম, 'বাহ, দারুণ তো! এখানে পুরুষেরা বাজার-সদাই করে। পাশ্চাত্যে তো শপিং মল থেকে বাজার-সদাই সব সময় আমাদের নারীদেরই করতে হয়।'

পরে জানলাম এখানকার নিয়মকানুন খুব কড়া। মহিলারা মাহরম পুরুষ ছাড়া অপরিচিত লোকদের সাথে কথা বলতে পারে না। নিয়ম নেই। আমি অনেক মহিলাকেও দেখতে পেলাম বোরকায় ঢাকা। তারা তাদের পুরুষ সঙ্গীদের সাথে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

মানুষগুলোর মুখের দিকে তাকিয়ে আমি অবাক হলাম। সবার চেহারা কেমন হাসিখুশি, সুখী সুখী ভাব। দুদিন পরে আমেরিকা উড়ে এসে এদের ঘাড়ে বোমা ফেলবে, সেটা নিয়ে এদের কোনো চিন্তাই নেই।

আমরা এলাম ছোট একটা গ্রামে। তখন কী এক উপলক্ষ্যে সেখানে বেশ আনন্দ ফুর্তি চলছিল। গ্রামের লোকজন গাইডের কাছে আমার পরিচয় জানতে চাইল। গাইড পশতু[৩] ভাষায় বিড়বিড় করে কী বলে গেল, আমি তার এক বিন্দু বিসর্গও বুঝতে পারলাম না। তবে এতটুকু বুঝলাম, গাইডের উত্তর শুনে তারা মোটেও খুশি হয়নি। তারা ভাবছিল, চারদিকে এখন যুদ্ধ যুদ্ধ ভাব, এর মধ্যে গাইড এক পশ্চিমা নারীকে নিয়ে এল এখানে। ব্যাটার আক্কেল জ্ঞানটা কী শুনি!

তার উপরে মোল্লা উমরের[৪] কড়া নিষেধাজ্ঞা ছিল 'কোনো লোক পশ্চিমা বিদেশিকে সাহায্য করলে তার জন্য কড়া শাস্তি পেতে হবে'। স্বভাবতই তারা গাইডের উপর খুব ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। ভেতরে ভেতরে ভয়ও পাচ্ছিল, না জানি কখন ধরা পড়ে যায়!

আফগানরা জাতিগতভাবে ফুর্তিবাজ ও হাসিখুশি। খুব বেশিক্ষণ মনমরা হয়ে থাকা এদের ধাতে নেই। কিছুক্ষণের মধ্যে তাদের ভয় কমে এল। দু-একজন মহিলা দোভাষীর মাধ্যমে আমার সাথে কথাও বলা শুরু করল।

www.pathagar.com

বিশ বছর বয়সী এক মেয়েকে জিজ্ঞেস করলাম, 'এই যে দুদিন পরে যুদ্ধ শুরু হচ্ছে, তোমার ভয় করছে না?'

বিরক্তিমাখা স্বরে সে উত্তর দিল 'আর বলবেন না। আমার খুব রাগ লাগছে।

আমি জানতে চাইলাম 'কেন?'

সে বলা শুরু করল, 'আমি ছিলাম নার্সিং ইনিস্টিটিউট থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এক নার্স। বছর দুয়েক আগে তালেবানরা হঠাৎ করেই সে প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দিল। আমি চলে এলাম গ্রামে। ভেবে দেখুন, আজ যদি আমি ঠিকভাবে আমার প্রশিক্ষণ শেষ করতে পারতাম, তাহলে এই যুদ্ধের সময় আমি কত কাজ করতে পারতাম! আহতদের সেবা করা, চিকিৎসার ব্যবস্থা করা....তা না, আমি এখন হাত পা গুটিয়ে এই অজপাড়া গাঁয়ে এসে পঁচে মরছি।'

কথার মাঝখানে এক বয়স্ক মহিলা আমাদের সামনে এসে দাঁড়ালেন। তার চেহারায় তাচ্ছিল্য, দুহাত কোমরে রাখা। আমাকে ভালোমতো নিরীক্ষণ করে জানতে চাইলেন, 'এই মেয়ে! তোমার ছেলে-মেয়ে আছে?'

আমি উত্তর দিলাম, 'আছে, একটা মেয়ে'।

'মোটে একটা?'

'জ্বি, মোটে একটা'

তিনি আমার বুকের উপর সজোরে একটা ধাক্কা মারলেন, 'তোমরা পশ্চিমা নারীরা আসলেই হতভাগা। তোমাদের বাচ্চা হয় মোটে একটা দুইটা। আমাকে দেখ। আমার সন্তান মোট পনেরো জন। যুদ্ধের মাঠে যখন তোমাদের সব সৈন্য মারা যাবে, আমি তখনো একে একে সন্তান জন্ম দিতে থাকব।'

এটা ভাবার কোনো কারণ নেই, আফগান মহিলারা লাজুক লাজুক আর জড়সড় মাটির মূর্তি। আমি মনে মনে ভাবছিলাম, 'বাপরে! এই যদি হয় মহিলার তেজ, তবে পুরুষেরা না জানি কেমন?'

আমি পাল্টা প্রশ্ন করলাম, 'এই যে আমেরিকা এসে আপনাদের উপর বোমা ফেলবে, আপনাদের ভয় করছে না?'

তিনি সমান তেজে উত্তর দিলেন, 'আসুক না আমেরিকান সৈন্য! এই গ্রামে যদি আসে, আর আমি যদি হাতের কাছে পাই, তবে জামা কাপড় ছিঁড়ে নিজ হাতে আমি ওদের শায়েস্তা করব।'

www.pathagar.com

একটু শান্ত হয়ে তিনি আবার বললেন, 'দেখ! তোমাদের ওখানে যে দুর্ঘটনা ঘটেছে, তার জন্য আমরা দুঃখিত। কিন্তু তাতে আমাদের কী দোষ! এর জন্য আমেরিকানরা কেন আমাদের উপর বোমা মারতে চাইছে? আমরা কি কিছু করেছি?'

আমি তখন মনে মনে ফুঁসছিলাম। 'কী? টুইন টাওয়ার হামলা এদের কাছে নেহায়েত একটা দুর্ঘটনা? যেখানে ছয় হাজারের অধিক মানুষ জ্বলে পুড়ে মারা গেল, যেখানে সুবিশাল টুইন টাওয়ার ধ্বসে পড়ল, প্রাণ বাঁচাতে একশ তলা থেকে মানুষ স্বেচ্ছায় লাফিয়ে পড়ল... এত বড় ঘটনাকে এরা দুর্ঘটনা বলে কী করে?'

পরে ভেবে দেখলাম, আসলে এদের দোষ নেই। তালেবান শাসনে বিদেশি টিভি দেখা বারণ। এরা তো জানেই না সে দৃশ্য, সে ঘটনা কতটা ভয়াবহ ছিল!

গ্রামে থাকতে থাকতে বিকেল হয়ে এল। আমাদেরকে নিয়ে ভয়, উৎকণ্ঠা আবার মানুষগুলোর চেহারায় ফিরে এল। অনেক বলে কয়ে তাদের কাছ থেকে দু-চারটা ছবি নিলাম। বিদায় নিয়ে একটু এগুতেই দেখি গ্রামের অদূরে গেইট বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। শুনতে পেলাম, পাকিস্তান তাদের সীমান্ত বন্ধ করে দিয়েছে। কাউকে আসতেও দিচ্ছে না, যেতেও দিচ্ছে না। পরদিন সকালে গিয়ে দেখি একই অবস্থা।

আমি পড়লাম মহা ঝামেলায়। আমার সম্পাদক যদি জানেন, আমি আফগানিস্তানে গিয়ে নিখোঁজ হয়ে গেছি, তাহলে বিশ্ব মিডিয়ায় হইচই পড়ে যাবে। চারদিকে আতংক ছড়াবে। আমাকে যে করেই হোক এখান থেকে বের হতে হবে।

কিন্তু কীভাবে?

গাইড বলল, 'উপায় একটা আছে। আমাদেরকে চোরাচালানের রাস্তা ধরে ফিরতে হবে'।

'ওয়াও!' আমি মনে মনে বেশ রোমাঞ্চ অনুভব করছিলাম, 'চোরাচালানের রাস্তা দিয়ে পালান? এটা তো দারুণ রোমাঞ্চকর আর শিহরণ জাগানো ব্যাপার হবে। আমি আমার পত্রিকার জন্য ভালো একটা স্টোরি লিখতে পারব'।

আমি ভেবেছিলাম স্মাগলিং রুট হবে পাহাড়ের খাঁজে খাঁজে গোপন কোনো রাস্তা। মাঝে মাঝে ঝোপ জঙ্গলেও লুকিয়ে থাকতে হবে। ওমা! অবাক কাণ্ড। যে রাস্তা ধরে সীমান্তের কাছে গেলাম, সেখানে দেখি বিরাট বাজার বসেছে। কেউ উট বিক্রি করছে, কেউ বিক্রি করছে কার্পেট, কারও হাতে বিক্রির জন্য বিনোদনের বিভিন্ন জিনিসপত্র।

অনেক পুরুষকে দেখলাম। তারা এসেছেন যুদ্ধের জন্য নাম লিখাতে; যেন 'বড় শয়তান' আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা যায়।

www.pathagar.com

আমার পায়ে ছিল আফগান জুতা। পথ চলতে চলতে তা ছিঁড়ে পা ফেটে রক্ত ঝরছিল।

আমি গাইডকে বললাম, 'দেখ! সীমান্ত তো আর মাত্র দশ মিনিটের পথ। কোনো বাহন নেয়া যায় না? আর হাঁটতে পারছি না।'

সে আমার দিকে সন্দিহান দৃষ্টিতে তাকাল, 'আপনি কি গাধায় চড়তে পারবেন?'

'গাধা!' মনে মনে ভাবছিলাম 'আরে বেটা! আমি ঘোড়ায় চড়েছি, ঘোড়া নিয়ে দৌড়েছি। আর সে আমি এই পিচ্চি গাধায় চড়তে পারব না!'

আমার ইশারা পেয়ে সে একটা গাধা নিয়ে এল। গাধার পিঠে যেই না বসেছি, অমনি তা উল্কার বেগে বিদ্যুৎ গতিতে আমাকে নিয়ে দৌড় দিল। কোনোভাবেই নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারছিলাম না। আমার হাত পা উপরে-নিচে বাতাসে ঢেউয়ের মতো উঠানামা করছিল। মনে হচ্ছিল, আমি যেন একটা নিয়ন্ত্রণহীন বাদুড়, যে নিজের ভারসাম্য ধরে রাখতে সমান তালে তার পাখা নাড়ছিল।

চিন্তা করুন, বিরাট আলখাল্লার মতো বোরকা পরা একজন গাধার উপরে বসে হাত-পা ছুড়ছে, আর গাধা ছুটছে দিগ্‌বিদিক ভুলে...দূর থেকে নিশ্চয়ই আমাকে কিম্ভূতকিমাকার ভূতের মতোই লাগছিল।

গাধাকে নিয়ন্ত্রণ করতে যেই না নিচের দিকে ঝুঁকেছি, অমনি আমার বোরকার ভেতর থেকে ক্যামেরা পড়ে গেল। ক্যামেরা তালেবান শাসনে পুরোপুরি নিষিদ্ধ। আমিও তাল সামলাতে না পেরে নিচে পড়ে গেলাম।

নিজেকে সামলে নিয়ে মাথা তুলে দেখি একজন ভয়ালদর্শন তালেবান সৈনিক জ্বলন্ত দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন...

তিন

আমি যখন লন্ডন ফিরে বান্ধবীদের এই ঘটনা বলেছিলাম, ওরা তখন জিজ্ঞেস করেছিল, 'আচ্ছা সেই মুহূর্তে তোমার অনুভূতি কী হয়েছিল? যখন লোকটা তোমার দিকে অমন করে তাকিয়ে ছিল, আর তুমি বুঝে গেলে তোমার খেলা শেষ?'

আমি হেসে বলেছিলাম, 'মনে হয়েছিল, বাহ! লোকটা তো দেখতে দারুণ আর হ্যান্ডসাম! তার ছিল সবুজ ঝকঝকে চোখ, চকচকে দুটি গাল আর ঘন কালো দাড়ি।'

www.pathagar.com

অবশ্য এমন অনুভূতি ছিল সেকেন্ডেরও কম সময়ের জন্য।

আপাদমস্তক বোরকায় ঢাকা থাকায় সে আমার চেহারা দেখতে পায়নি। আমি তার হাতে ক্যামেরাটা দিয়ে চোখ বন্ধ করে দাঁড়িয়েছিলাম। ভাবলাম, এক্ষুনি আমার জীবন শেষ হয়ে যাবে। মনে মনে অপেক্ষা করছিলাম, কখন একটা বুলেট এসে আমার কপাল ফুটো করে দেয়।

কয়েক সেকেন্ড পরে চোখ মেলে লোকটাকে দেখতে পেলাম না। একটু খেয়াল করতেই দেখি, তিনি সে অদূরে আমার দুই গাইডের দিকে তাকিয়ে চিৎকার করছেন আর জিজ্ঞেস করছেন, 'কোন সাহসে ক্যামেরা এখানে নিয়ে আসা হয়েছে?'

মার খেয়ে গাইডদের একজনের নাক দিয়ে দরদর করে রক্ত ঝরছে। আরেকজন চেষ্টা করছিল পরিস্থিতি সামাল দিতে। তাদের ঘিরে অন্তত শ খানেক লোকের ভিড়।

'এই তো সুযোগ!' আমি আনন্দচিত্তে ভাবছিলাম, 'আমি তো সহজেই সীমান্তঘেঁষা লোকগুলোর সাথে মিশে গিয়ে পাকিস্তানে পালিয়ে যেতে পারি।' আমাদের মধ্যে আগেই কথা ছিল, পরিস্থিতি বেগতিক দেখলে যে যেভাবে পারা যায় পালিয়ে যাবার চেষ্টা করবে।

আমি কয়েক পা বাড়িয়েছিলাম। পরক্ষণেই চোখের সামনে গাইডের রক্তাক্ত চেহারা ভেসে উঠল। মনে হলো, ওদের এভাবে পেছনে রেখে আমি পালিয়ে যেতে পারি না। আমার কিছু একটা করা উচিত। আমি সোজা লোকগুলোর ভেতর দিয়ে সেই সৈনিকের কাছে যেতে চাইলাম। কিন্তু লোকেরা আমাকে ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিচ্ছিল। ভাবখানা এমন, 'এই পুরুষ মানুষের কাজ কারবারের ভেতর মহিলাদের আবার কী?'

আমি এবার আমার চেহারা থেকে বোরকা সরিয়ে ফেললাম। চিৎকার দিয়ে বলে উঠলাম, 'কেউ কি আমাকে যেতে দিবেন?'

সমস্ত কোলাহল থেমে গেল। চারদিকে তখন শুনশান নিরবতা। মনে হলো একটা পিন পড়ে গেলেও কেউ তার শব্দ শুনতে পাবে।

মুসা ﷺ-এর সময় যেমন নীল দরিয়া দুধারে সরে গিয়ে রাস্তা তৈরি হয়েছিল, লোকেরা তেমনি দুপাশে সরে গিয়ে আমাকে রাস্তা করে দিল। আমি সোজা চলে এলাম সেই সৈনিকের সামনে। হাত পেতে বললাম, 'আমার ক্যামেরা কি ফেরত পেতে পারি?'

তার চেহারা হয়েছিল দেখার মতো। চোয়াল নিচের দিকে ঝুলে পড়েছিল, দুচোখ বিস্ফোরিত। নীল নয়না, স্বর্ণকেশী এক পশ্চিমা নারী এভাবে বোরকার আড়াল থেকে বের হয়ে আসবে- ভূত দেখলেও বোধহয় এতটা চমকে যেত না।

www.pathagar.com

আমি মনে মনে ভাবলাম, 'যাক! সমস্যার সুন্দর সমাধান হয়ে গেল। এখন নিশ্চয় তারা পশ্চিমা কোনো নারীর উপর হাত তুলবে না। আর আমার গাইড দুজনও বেঁচে যাবে।' তাকিয়ে দেখি, গাইডদের মুখে রাজ্যের অন্ধকার। সমস্যার সমাধান করতে গিয়ে আমি আরও বিপদ ডেকে আনলাম নাকি?

একটু আত্মস্থ হতেই সেই সৈনিক গাইডদের দিকে তাকিয়ে আবার চিৎকার দেয়া শুরু করল। একটু পরে আমাদের তিনজনকে একটা গাড়িতে আলাদা করে তুলল। গাড়ি চলতে শুরু করলে কী নিয়ে যেন তাদের মধ্যে তর্ক-বিতর্ক শুরু হলো। কথার মাঝখানে ড্রাইভার হঠাৎ করে গাড়ি থামিয়ে দিল। সেই তালেবান সৈনিক আমাকে গাড়ি থেকে নামিয়ে নিয়ে গেল এক নির্জন জায়গায়। আমাকে উল্টো দিকে মুখ করে দাঁড়াতে বলে লোকটা অদৃশ্য হয়ে গেল। আমি তো অবাক! কী ব্যাপার ব্যাটা গেল কোথায়?

আমি যেখানটায় ছিলাম, তার চারদিকে ছিল অসংখ্য নুড়ি পাথর। আমার সারা শরীর দিয়ে আতংকের হিম স্রোত বয়ে গেল। সর্বনাশ! দেখে মনে হয় এটা কোনো বধ্যভূমি। সেই লোক নিশ্চয় আশেপাশের গ্রামে গিয়ে মানুষদের ডেকে বলছে, 'একটা পশ্চিমা মহিলা ধরা পড়েছে। দশ মিনিটের মধ্যে তাকে পাথর মারা হবে। কে কে যাবে এসো! আমরা পাথর মেরে তাকে খতম করে দিই।'

আফগানিস্তানে একটা অদ্ভুত ব্যাপার খেয়াল করলাম। এই দেখি কোথাও কোনো জনমানুষের চিহ্ন নেই, আবার এই দেখি একগাদা মানুষের ভিড়।

কয়েক মিনিট পরে দেখলাম, এক দল ভয়ংকর দর্শন মানুষ আমার দিকে এগিয়ে আসছে। সংখ্যায় অন্তত ৭০-৮০ জনের কম হবে না। তারা আমার দিকে একটু একটু করে এগিয়ে আসছিল। আমার মনে হলো, নিশ্চয় তারা কাছে আসছে নিশানা ঠিক করার জন্য। যাতে পাথর মারলে ঠিকঠাক আমার গায়ে এসে লাগে। আমার বুকের ভেতর তখন একরাশ ভয়, আতংক। মনে চিন্তার ঝড়, এখান থেকে বেঁচে কি ফিরতে পারব কখনো?

আসলে ব্যাপার ছিল ভিন্ন। আফগানিস্তানে পুরুষের জন্য মাহরাম মহিলা ছাড়া অন্য মহিলাদের চেহারা দেখা ছিল নিষিদ্ধ। তাই আমার মতো একজন পশ্চিমা নারীকে তারা অবাক চোখে দেখছিল। তারা এগিয়ে আসছিল, যাতে আমাকে ভালো করে দেখা যায়। নিজেকে তখন মনে হচ্ছিল চিড়িয়াখানার খাঁচায় বন্দি আজব কোনো প্রাণী।

একটু পরে সেই আফগান সৈনিক বোরকা পরা এক মহিলাকে নিয়ে ফিরে এল। আমার বোরকা আগেই খুলে গিয়েছিল। পরনে ছিল সালোয়ার আর হাঁটু পর্যন্ত লম্বা কামিজ। মহিলা এসে আমার সারা শরীর সার্চ করা শুরু করল।

www.pathagar.com

আমার এতক্ষণের ভয় উদ্বেগ কেটে গিয়ে এবার প্রচণ্ড রাগ লাগছিল। 'ও! এই তাহলে ব্যাপার! তারা নিশ্চয়ই এখন আমাকে মারবে না। মারলে নিশ্চয় সার্চ করত না। শুধু শুধু এই ভয়াল দর্শন লোকগুলো আমাকে ভয় পাইয়ে দিয়েছিল। আর সৈনিকটা চাইলে নিজেই তো আমাকে সার্চ করতে পারত, যেমনটা ব্রিটিশ পুলিশ করে। আলাদা করে এই মহিলাকে আনার কী দরকার ছিল?'

সত্যি কথা বলতে, আফগান সৈন্যরা অন্তত পশ্চিমাদের চেয়ে অনেক বেশি শালীন আর ভদ্র ছিল।

আমার মেজাজ তখন সপ্তমে। প্রচণ্ড রেগে গিয়ে কামিজ মাথা পর্যন্ত উঠিয়ে তাদের বললাম, 'এই দেখ! আমার কাছে কোনো অস্ত্র নেই। এত সার্চ করার কী হলো?'

'লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা...' মুহূর্তের মধ্যে লোকগুলো সব উল্টো দিকে ফিরে দাঁত মুখ খিচে এমনভাবে দৌড় দিল, যেন ভূতে তাড়া করেছে।

পরে বুঝেছিলাম, আফগানিস্তানে কোনো মহিলার জন্য এমন আচরণ অত্যন্ত অশোভন। বোরকা পরা সে মহিলা আমার গালে থাপ্পড় মেরে বসল। আমার এমন অশালীন, অসভ্য আচরণ দেখে সে মহিলা দারুণভাবে ধাক্কা খেয়েছিল।

যখন নিশ্চিত হওয়া গেল আমার কাছে কোনো অস্ত্র নেই, তারা আবার আমাকে গাড়িতে তুলে নিল।

এবার গন্তব্য জালালাবাদ। তাদের গোয়েন্দা সদর দফতর।

চার

জালালাবাদ পৌঁছার পর আমি গোয়েন্দা বিভাগের প্রধানের মুখোমুখি হলাম। তিনি কিছুটা ইংরেজি বুঝতে পারেন। আমার বিস্তারিত ঠিকানা, টেলিফোন নম্বর লিখে দিতে বললেন। যাতে নিশ্চিত হওয়া যায়, আমি আসলেই সাংবাদিক কিনা।

আমি সব লিখে দিলাম।

তখন খাবারের সময় হয়ে এসেছিল। তিনি আমাকে খাবারের টেবিলে আমন্ত্রণ জানালেন, 'আসুন আমরা খাবার খাই'।

আমি দৃঢ় স্বরে বললাম, 'আমাকে আগে পরিচিতদের কাছে টেলিফোন করতে দিতে হবে।'

www.pathagar.com

তিনি মাথা নাড়লেন 'দুঃখিত। এই মুহূর্তে সেটি সম্ভব নয়।'

আমিও অনড় 'যতক্ষণ না আমাকে ফোন করতে দেয়া হবে, ততক্ষণ আমি কোনো খাবার স্পর্শ করব না।'

পৃথিবীর সবচেয়ে নিকৃষ্ট, নিষ্ঠুর, বর্বর শাসকগোষ্ঠীর কাছে একজন মহিলার এমন আবেদন বিশেষ কোনো গুরুত্ব পাবার কথা না। আমি খাচ্ছি কি খাচ্ছি না, তা নিয়ে তাদের কোনো মাথা ব্যাথা থাকার কথা নয়।

কিন্তু অবাক করার মতো বিষয় হলো, আমি খাব না জেনে তিনি খুব হতাশ হলেন। একটু কী খারাপও লাগছিল তার?

আমি আমার সিদ্ধান্ত থেকে একটুও নড়িনি। প্রতিদিন তিনবেলা তারা আমার জন্য খাবার নিয়ে আসত। সামনে পাটি বিছিয়ে দিত। তাতে থাকত রুটি, ভাত ও অন্যান্য খাবার। সাথে এক জগ পানি। তারা আগ বাড়িয়ে আমার হাত ধুয়ে দিত। ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে তাদের কণ্ঠে অনুনয় ঝরে পড়ত 'বোন! এমন করে থাকবেন না। আপনি আমাদের বোন, আমাদের অতিথি। আপনি না খেয়ে থাকলে আমরা কষ্ট পাব।'

আমার মনে হতো, পৃথিবীখ্যাত নিষ্ঠুর গোষ্ঠীর এ কেমন আচরণ? তারা কি আমার কথা বুঝতে পারছে না? নাকি এসবই আমার মনটাকে নরম করার জন্য তাদের অভিনয় মাত্র?

সত্যি কথা বলতে, ধারণা করেছিলাম আমার সাথে হয়তো আবু গারীব ও গুয়ান্তানামো বে কারাগারের বন্দিদের মতোই চরম নিষ্ঠুর আচরণ করা হবে। এমনকি ধর্ষণ, শ্লীলতাহানির মতো পরিস্থিতিরও মুখোমুখি হওয়া বিচিত্র কিছু নয়।

এখন ভাবি, আল্লাহকে ধন্যবাদ আমি পৃথিবীর নিষ্ঠুরতম গোষ্ঠীর হাতে পড়েছিলাম। সুসভ্য আমেরিকানদের হাতে নয়।

তৃতীয়দিন সকালে তারা একজন ডাক্তার নিয়ে এলেন। ডাক্তার ছোটখাটো মানুষ। জার্মানিতে পড়াশোনা করেছিলেন। তিনি এসে আমার চোখ দেখলেন, নাড়ি দেখলেন, কান, মুখ গহ্বর ভালো করে পরীক্ষা করলেন। আমি ভাবছিলাম, কাউকে ফাঁসির দণ্ড দেয়ার আগে যেভাবে ডাক্তাররা পরীক্ষা করেন সব ঠিক আছে কিনা, ইনিও বোধহয় সেভাবেই আমার পরীক্ষা করছেন।

এরপর তিনি প্রেশার মাপলেন। একবারের জায়গায় দুবার। তার চেহারা কিছুটা চিন্তিত।

তাকে আস্বস্ত করতে আমি বললাম, 'প্রেশার নিয়ে চিন্তিত হবার কিছু নেই। দীর্ঘদিন ধরেই আমার প্রেশার অনেক হাই।'

www.pathagar.com

তিনি মাথা নাড়লেন 'আপনার প্রেশার একদম নরমাল।'

যে মানুষের একটু পরে তালেবানের হাতে ফাঁসি হবে, তার প্রেশার স্বাভাবিক হয় কী করে!

তিনি আমার অবিশ্বাসী চাহনি দেখে বললেন, 'এই যে আপনিই দেখুন'। আমি দেখলাম। আসলেই তাই।

আমি বললাম, 'খুব ভালো। এটা তালেবানের মহত্ত্ব যে তারা আমার প্রেশার ভালো করে দিয়েছে।'

ডাক্তারের এক ছেলে- হামেদ। সে আমার সাথে দোভাষীর কাজ করত। পঞ্চম দিন সকালে সে খুব উৎফুল্ল চিত্তে আমার কাছে দৌড়ে এল। তার হাতে জালালাবাদ থেকে প্রকাশিত একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা। বলল 'ম্যাডাম! এই দেখুন পত্রিকায় আপনার খবর ও ছবি বেরিয়েছে।'

পত্রিকার প্রথম পাতায় রয়টার্স৫ থেকে নেয়া আমার দুটো ছবি। প্রথম পাতার অর্ধেকটা জুড়ে লাল কালির বিশাল শিরোনাম, তার নিচে অল্প একটু খবর। মূলত খবরের চেয়ে শিরোনামই কয়েক গুণ বড়।

আমি জানতে চাইলাম, ওখানে কী লেখা আছে?

হামেদ আমাকে পড়ে শোনাল সেই শিরোনাম, 'তালেবান ইভন রিডলির ব্লাড প্রেশার ভালো করে দিয়েছে, এজন্য সে খুবই খুশি।'

ষষ্ঠ দিন আমার রুমে, একদল লোক সাথে নিয়ে উচ্চপদস্থ এক কর্মকর্তা এলেন। তার চেহারা গম্ভীর, ভয় জাগানিয়া। তার নেতৃত্বে আমার জিজ্ঞাসাবাদ চলল প্রায় রাত ৮-৯ টা পর্যন্ত। তারা অবশ্য কখনোই আমাকে শারীরিক নির্যাতনের ভয় দেখায়নি। তারা শুধু আমাকে বলত, তাদের কথামতো কাজ না করলে, তাদেরকে সাহায্য না করলে বছরের পর বছর এখানে বন্দি হয়ে থাকতে হবে।

আমি ভাবতাম, এই লোকগুলো সম্পর্কে আমি এ যাবতকাল যা শুনে এসেছি, তাতে তাদের সাথে সুন্দর আচরণ করি আর নাই করি, তারা ঠিক ঠিক তাদের ইচ্ছেমতো কোনো একদিন আমাকে মেরে ফেলবে। তাই ঠিক করলাম, মরতে যখন হবেই তখন আর ভালো আচরণ করে লাভ কী। আমি অত্যন্ত আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে তাদের সাথে কথা বলা শুরু করলাম।

হামেদ আমাদের মাঝে দোভাষী হয়ে কথা আদান-প্রদান করত।

www.pathagar.com

আমি যতই উত্তেজিত আর আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে কথা বলতাম, তারা ততই আমার সাথে নরম আচরণ করত। আমাকে বলতেন, 'আরে বোন! আপনি এত ক্ষেপে যাচ্ছেন কেন? আপনি আমাদের বোন, আমাদের অতিথি।'

মাঝে মাঝে তো হামেদ আমাকে বলত, 'আপনি এত উত্তেজনাপূর্ণ আক্রমণাত্মক ভাষায় কথা বলেন, তা আমি আফগান ভাষায় তাদের কাছে অনুবাদ করতে প্রচণ্ড ভয় পাই।'

একদিন সকালে হামেদ খুব ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে আমার কাছে এল। তার চোখ মুখ শুকনো, চেহারায় সুস্পষ্ট ভয়ের ছাপ, 'আপনার কাছে আজ অত্যন্ত সম্মানিত একজন ভিআইপি গেস্ট আসবেন। দয়া করে তার সাথে সম্মানের সাথে কথা বলবেন। তার সাথে কোনো ধরনের অসভ্য আচরণ করবেন না।'

আমি জানতে চাইলাম 'কে সেই লোক? কে এমন ভিআইপি যার নাম নিতেও হামেদ ভয় পাচ্ছে? মোল্লা ওমর?'

হামেদ মাথা নাড়লো, 'একটু পরেই দেখতে পাবেন'।

আমার মনে চিন্তার ঝড়। আমার সাথে দেখা করতে কে এমন আসতে পারে?

আমার ভাবনার মাঝেই দরজার কড়া নড়ে উঠল।

পাঁচ

যদিও আমি ছিলাম বন্দি, কিন্তু দরজার চাবি আমার কাছেই থাকত। তারা দেখা করতে আসলে দরজার কড়া নাড়তেন, আমি ভেতর থেকে খুলে দিতাম।

দরজা খোলার পর যে লোকটা আমার সামনে এসে দাঁড়ালো, তাকে দেখে আমার শরীরের পশম খাড়া হয়ে গেল। এক মুহূর্তের জন্য রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে গেল।

বিগত ছয় ছয়টি দিন আমি ধর্ম নিয়ে আলোচনা সযত্নে এড়িয়ে চলেছি। আর এখন কিনা আমি একজন শীর্ষস্থানীয় ধর্মীয় গুরু, মাওলানার মুখোমুখি।

আফগান দেশটা ধূলি ধূসরিত মরু অঞ্চল। কিন্তু লোকটার পরনে সুন্দর পরিষ্কার আইভরি রঙয়ের লম্বা আলখাল্লা, লম্বায় মাটি ছুঁই ছুঁই। এতটাই বড়, তার পা যেন তার মধ্যে পুরো অদৃশ্য হয়ে গেছে। মুখে মার্জিত, সুন্দর করে ছাটা ঘন দাড়ি। মাথায় আইভরি রঙয়ের সুন্দর পাগড়ি। চোখ দুটো হালকা বাদামি।

www.pathagar.com

চোখে মুখে ব্যক্তিত্বের প্রখর দীপ্তি। হাতে ছিল তাসবিহ। তিনি অনবরত তাসবিহ জপে চলেছেন।

আরও একটা বিষয় ছিল যা একটু অন্যরকম, অদ্ভুত একটু। তার চেহারায় ছিল আলোর দ্যুতি। যেন ভেতর থেকে আসা কোনো আলোকচ্ছটা তার চোখেমুখে নাচছে। আমি যখন পরে মুসলিমদের সাথে এই অনুভূতি শেয়ার করি, তারা উত্তর দিয়েছিল, 'সুবহানাল্লাহ! এটা হলো 'নূর' যা পুণ্যবান মানুষদের চেহারা থেকে বের হয়।'

একটু আত্মস্থ হতেই আমি তাকে বসার জন্য অনুরোধ করলাম। ঠিক হাটা নয়, তিনি যেন ভেসে ভেসে এসে বসলেন। তার হাতের তাসবিহ তখনো চলমান, মুখে মুচকি হাসি।

তিনি এবার মুখ খুললেন, 'আপনার ধর্ম কী?'

এইরে, শুরু হয়ে গেল! উত্তর দিলাম, 'আমি খ্রিষ্টান'।

তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'কেমন ধরনের খ্রিষ্টান? রোমান ক্যাথলিক[৬], প্রোটেস্ট্যান্ট[৭], অ্যাংলিক্যান[৮], না ব্যাপ্টিস্ট?'[৯]

'আমি প্রোটেস্ট্যান্ট।'

'ইসলাম সম্পর্কে আপনার ধারণা কী?' তার তাসবিহ এক মুহূর্তের জন্যও থামেনি।

'ওহ, ইসলাম!' আমি বলে চললাম, 'ইসলাম একটা চমৎকার ও অসাধারণ ধর্ম।'

আসলে ইসলাম সম্পর্কে আমার তেমন কোনো ধারণা ছিল না। যেটুকু জানতাম, তাও ভুল-ভাল, মিডিয়া থেকে জানা।

আমি প্রায় দুই মিনিট ধরে ইসলামের বড়ত্ব ও মহত্ত্ব নিয়ে কথা বলে গেলাম।

তিনি আমার দিকে তাকিয়ে মুচকি মুচকি হাসছিলেন আর এক মনে তাসবিহ জপে যাচ্ছিলেন।

আমি থামতেই তিনি বললেন, 'ইসলাম হলো সুন্দরতম ধর্ম।'

'একদম ঠিক বলেছেন' আমি আবারও মনের মাধুরী মিশিয়ে ইসলাম নিয়ে সুন্দর সুন্দর কথা বলে চললাম। হামেদ আমার কথাগুলোকে পশতু ভাষায় অনুবাদ করে দিচ্ছিল।

তিনি আগের মতোই মুচকি মুচকি হেসে তাসবিহ জপে যাচ্ছিলেন।

www.pathagar.com

এখন বুঝি, তিনি হয়তো তখন মনে মনে ভাবছিলেন 'এই মহিলা আস্ত একটা হাদারাম! জানে না কিছুই, আবার আমাকে বোকা বানানোর চেষ্টা করছে।'

আমি কথা শেষ করলে হাসি হাসি মুখে তিনি বললেন, 'তাহলে আপনি নিশ্চয় এখন ইসলাম গ্রহণ করতে চান?'

আমি দেখলাম, এ তো মহাবিপদ! নিজের ফাঁদে এখন নিজেই আটকা পড়েছি।

যদি এখন 'হ্যাঁ' বলি, তাহলে দুদিন পরে এরা আমায় নিয়ে পাথর মেরে হত্যা করবে। বলবে, এই মহিলা ইসলামের কিছুই মানে না। আবার যদি না বলি, তাহলেও আমাকে মেরে ফেলবে। বলবে, তুমি ইসলামের অবমাননা করেছ।

আমার মাথায় তখন ঘুরপাক খাচ্ছিল, সুন্দর জবাব কী হতে পারে।

শেষে বললাম, 'দেখুন বন্দি অবস্থায় থেকে আমি এত বড় সিদ্ধান্ত নিতে পারি না। তবে কথা দিচ্ছি, যদি আপনারা আমাকে ছেড়ে দেন, আমি কুরআন পড়ব আর ইসলাম নিয়ে গবেষণা করব।'

তিনি একটি কথাও বললেন না। মুচকি হেসে উঠে দাঁড়ালেন এবং আগের মতোই দৃশ্যত হাওয়ায় ভেসে ভেসে তিনি বেরিয়ে গেলেন। হামেদ তার পেছন পেছন ছুটল।

কয়েক মিনিট পরে হামেদ ফিরে এল 'আপনি মুক্তি পেতে যাচ্ছেন। রেড ক্রিসেন্টের একটি প্লেনে করে আপনাকে ফেরত পাঠিয়ে দেয়া হবে।'

'ইয়েস!' আমি তখন আনন্দে আত্মহারা। 'কী চমৎকার বুদ্ধি খাটিয়ে মাওলানাকে কাবু করে আমি মুক্তির পথ বের করে নিয়েছি।'

বেলা গড়ালে কাবুলগামী একটি ট্রাকে চড়ে বসলাম। সাত ঘণ্টার ধূলি ধূসরিত এবড়ো-থেবড়ো রাস্তা ধরে চলার পর আমরা কাবুল পৌঁছালাম। কাবুল থেকে আমাদের গাড়ি এয়ারপোর্ট পার হয়ে সামনের দিকে চলতে লাগল।

আমি ভাবছিলাম, নিশ্চয় তালেবানের হাতে আরও বিদেশি বন্দি আছে। সবাইকে নিয়ে একসাথে রেডক্রিসেন্টের প্লেনে করে আমরা ফিরে যাব।

সে রাতে আফগান চরিত্রের আরেকটি দিক আমার কাছে পরিষ্কার হলো। আফগানরা সরাসরি কোনো খারাপ খবর আপনাকে দিতে চাইবে না, যাতে আপনি কষ্ট পান। তারা বিষয়টিকে অন্যভাবে উপস্থাপন করবে।

গাড়ি আমাকে নিয়ে পৌঁছল এক জেলখানার সামনে। তৃতীয় বিশ্বের কোনো কারাগার যেমন হয়। অন্ধকার, স্যাঁতস্যাঁতে। একটা রুমে দুজন মহিলা আমাকে অভ্যর্থনা জানাল 'আজ রাতে আপনি এখানেই থাকবেন।'

www.pathagar.com

'না না! আপনাদের কোথাও কোনো ভুল হচ্ছে', আমি প্রতিবাদ করলাম 'আমার তো রেডক্রসের প্লেন ধরে দেশে ফিরে যাবার কথা।'

অবশেষে খারাপ সংবাদটা আমাকে দেয়া হলো। আমি একজন বিদেশি মহিলা, কোনো পাসপোর্ট ভিসা ছাড়াই এখানে এসেছি। তাই আমাকে এর জন্য শাস্তি পেতে হবে।

'তোমরা কোনোভাবেই আমার সাথে এ আচরণ করতে পার না।' আমি চিৎকার করে বললাম, 'আমি একজন ব্রিটিশ!'

তারা একজন অন্যজনের দিকে তাকিয়ে হাসছিল। ঠিক সেই মুহূর্তে পাশের রুমের দরজা খুলে গেল। দেখি, হিজাব পরা ছয় জন মহিলা। তাদের একজন আমার দিকে এগিয়ে এলেন 'আপনি কি রেডক্রসের?'

'আরে আপনি তো ইংরেজিতে কথা বলছেন!' আমি অবাক।

'হ্যাঁ। কারণ আমি অস্ট্রেলিয়ান' তিনি উত্তর দিলেন 'এই তিনজন জার্মান আর ওই দুজন আমেরিকান।'
'তার মানে আপনারা তো খ্রিষ্টান, যারা সমাজ সেবামূলক কাজ করেন। মুসলমানদের মাঝে খ্রিষ্টধর্মের প্রচার ও ধর্মান্তকরণের অপরাধে যাদের আটক করা হয়েছে।'

তারা উত্তর দিলেন 'আপনি ঠিক ধরেছেন।'

আমি দ্বিগুণ উৎসাহ নিয়ে বললাম 'দেখুন তো কাণ্ড! আমাকে রেডক্রসের বিমানে করে দেশে ফেরত পাঠানোর কথা। ভুল করে এখানে নিয়ে আসা হয়েছে। আমি এই মহিলাদের সেটা বোঝানোর চেষ্টা করছি, কিন্তু তারা কিছুতেই তা বুঝছে না।'

তারা এগিয়ে গিয়ে দুজন আফগান মহিলার সাথে কথা বলা শুরু করলেন। একটু পরে তাদের উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় আর চেহারার মুখভঙ্গি দেখে বুঝতে পারলাম, আমার কোথাও যাওয়া হচ্ছে না। অন্তত আজ রাতে নয়।

অস্ট্রেলিয়ান তরুণী আমার দিকে এগিয়ে এসে বললেন, 'আপনি চাইলে আমাদের সাথে একই রুমে থাকতে পারেন।'

বিগত কয়েক দিনের মধ্যে এই প্রথম আমি কোনো নারী সঙ্গী পেলাম। তার উপর তারা ছিলেন ইংরেজিভাষী। তাদের সাথে কথা বলে আমি হয়তো একটু হালকা হতে পারব।

আমি ওদের রুমে এসে ঢুকলাম। তৃতীয় বিশ্বের আর দশটা জেলখানার মতোই রুমটা ছিল শ্রীহীন।

www.pathagar.com

হঠাৎ কী হলো জানি না, দারুণ এক অবসাদ আমাকে পেয়ে বসল। আমি নিদারুণ কান্নায় ভেঙে পড়লাম। এ ছিল আমার বন্দি জীবনের প্রথম অশ্রু। মনে হলো, আমার ভেতরের এত দিনকার সব প্রতিরোধ তালেবানরা সফলতার সাথে ভেঙে চুরমার করে দিয়েছে।

নিজেকে শান্ত করতে আমি সিগারেট ধরাতে চাইলাম। তালেবান শাসনে এমনিতে সিগারেট নিষিদ্ধ। তবে যখন তারা বুঝল আমি সিগারেট খাই, আমাকে বেশ কয়েকটা এনে দিয়েছিল।

গাল বেয়ে তখনো আমার অশ্রু গড়িয়ে পড়ছিল। আমি কাঁপাকাঁপা হাতে ঠোঁটের কোণে সিগারেট রেখে লাইটার দিয়ে ধরানোর চেষ্টা করছি। আমি আমার সঙ্গীদের দিকে তাকিয়ে বললাম, 'আমি একটা সিগারেট ধরালে কিছু মনে করবেন না তো?'

'অবশ্যই মনে করব' উত্তর শুনে ধাক্কার মতো লাগল। 'এই রুমটা ধুমপান মুক্ত, ধুমপান করতে হলে বাইরে চলে যান।'

পোড়া কপাল আমার! ধুমপানমুক্ত রুমেই কিনা আমার ঠাঁই হলো! পরক্ষণেই তারা জানালেন এই রুমে তারা এখন মিটিং করবেন।

'মিটিং!' আমি চমকে উঠলাম।

'হ্যাঁ। আমরা রোজ দুবার মিটিং করি।'

হঠাৎ করে আমার মাথায় অন্য চিন্তা খেলে গেল। 'দুবার মিটিং! পালানোর কোনো মতলব নেই তো? হয়তো তারা কোনো প্ল্যান করেছেন! এখন আলোচনা করবেন, কী করে প্ল্যান মোতাবেক কাজ করা যায়'।

নিকোটিনের নেশা আমার মাথা থেকে উবে গেল। আমি বেশ উৎসাহ নিয়ে বললাম, 'আমি কি আপনাদের সাথে থাকতে পারি?'

তারা সম্মতি দিলেন। আমি খুব আগ্রহ নিয়ে তাদের কাজ দেখছিলাম। ছয়জন মহিলা গোল হয়ে নিচে বসলেন। একজন তার ব্যাগ থেকে কী একটা বের করলেন।

কী ওটা? এই কারাগারের কোনো স্কেচ; যাতে কী করে পালান যায়?

ছয়

যা দেখলাম, তাতে আমার বিস্ময়ের সীমা রইল না। ব্যাগ থেকে বের করে আনা বস্তুটি আসলে একখণ্ড 'বাইবেল।'

www.pathagar.com

অবিশ্বাস্য! যে মহিলাদের ধর্মান্তরিত করার অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়েছে, যাদের শরীয়া আইনে বিচার হবে, তারা কিনা তালেবানের জেলে বসে প্রকাশ্যে বাইবেল পড়ছে। আমার মনে হলো, যেকোনো মুহূর্তে তালেবানের প্রহরী বিপুল বেগে ছুটে আসবে আর মহিলাদেরকে আচ্ছামতো পেটাবে।

কিন্তু না, তেমন কিছুই হলো না।

অবশ্য পরে আমি কুরআন পড়ে বুঝেছিলাম, মুসলিমরা ভিন্ন ধর্মালম্বীদের বিশেষ করে ইহুদি-খ্রিষ্টানদের সম্মান করে। তাদের ধর্ম পালনে কোনো বাধা দেয় না। আর তালেবান ঠিক এই কাজটাই করেছিল। অবশ্য সে সময় আমি তা বুঝিনি। আর বোঝার কথাও না।

ছয়জন প্রায় বিশ মিনিট ধরে বাইবেল থেকে পড়ে গেলেন। এরপর হাতে লেখা একটা কাগজ বের করলেন। শুরু হলো ধর্মীয় গীত গাওয়া। আস্তে আস্তে নয়, একেবারে উচ্চস্বরে। খুবই হাসি-খুশি, প্রাণচঞ্চল আর প্রাণবন্ত সে গানের সুরে পুরো রুম যেন গম গম করছিল।

আমি বাইরে এসে পর পর তিনটি সিগারেট শেষ করলাম।

সে রাতে আমি কংক্রিটের উপর পাতলা মাদুর বিছিয়ে ঘুমিয়েছিলাম। পরদিন সকালে আমাকে এক প্রস্থ পরিষ্কার কাপড় দেয়া হলো।

তালেবানদের হাতে বন্দি থাকা অবস্থায় কেউ আমাকে ধর্ষণ করেনি, শ্লীলতাহানি করেনি। এমনকি আবু গারীব কারাগারের মতো উলঙ্গ করে চোখ বন্ধ অবস্থায় কেউ আমার ভিডিও করেনি। বুঝতেই পারছেন, আমেরিকানদের হাতে বন্দি মানুষগুলোর চেয়ে আমার অভিজ্ঞতা ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন।

রুমের বাইরে খোলা চত্বরের একদিকে পানির ব্যবস্থা ছিল। আমি আমার কাপড় চোপড় ধুয়ে দড়িতে শুকাতে দিলাম। একপাশে বসে আমি তখন আমার পুরোনো দিনের কথা ভাবছি। এমন সময় হন্তদন্ত হয়ে জেলার এলেন। জেলার ছিলেন লম্বা চওড়ায় বিশাল মানুষ। মুখভর্তি ঘন লম্বা দাড়ি। চেহারা যথারীতি গুরুগম্ভীর, ভয়ংকর।

তিনি ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বেশ জোরে চেঁচিয়ে বললেন, 'ওই সব কাপড় সরান।'

আমি বললাম, 'সমস্যা কী? ওগুলো তো আমার কাপড়। শুকাতে দিয়েছি।'

www.pathagar.com

তিনি আবারও বললেন, 'ওই কাপড় সরান।'

'আরে ভাই, সমস্যা কী আপনার? দেখছেন না, আমি কাপড় ধুয়ে শুকাতে দিয়েছি। এখান থেকে সরালে কাপড় কি শুকাবে?'

তিনি আবারও বললেন, 'ওই কাপড়গুলো ঢাকুন।'

'লোকটার কী মাথা খারাপ নাকি! বারবার কেবল এক কথাই বলে যাচ্ছে। আরে কাপড় ঢেকে রাখলে শুকাবে কী করে? আজব!'

এবার লোকটি একটা কাপড়ের দিকে ইঙ্গিত করে বলল, 'ওটা সরান'। মুখ তখনো তার অন্যদিকে ফেরানো।

এতক্ষণে আমি বুঝলাম, তিনি আমার অন্তর্বাসের দিকে ইঙ্গিত করছেন। আমি বললাম, 'সমস্যা কী? এটাতো মহিলাদের ওয়ার্ড। এখানে কাপড় সরাতে হবে কেন?'

লোকটি রাগ করে বলল, 'আমি বলছি, সরান।'

আমিও সমান তেজের সাথে বললাম, 'পারলে আপনি নিজে সরান, নয়তো এখান থেকে ভাগেন!'

আমি ভাবলাম, লোকটা মনে হয় রাগে ফেটে পড়বে। তা নয়, লোকটা হন হন করে বেরিয়ে গেল।

অন্তত পনেরো মিনিট পরে আবার ফিরে এলেন। সাথে আফগানিস্তানের পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী। আমি ভাবলাম, এই লোকগুলোর উপর দুদিন পরে আমেরিকা এসে বোমা ফেলবে। এটা নিয়ে এদের মধ্যে কোনো বিকার নেই। সামান্য একটা অন্তর্বাস নিয়ে এখানে রীতিমতো পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী এসে হাজির।

মন্ত্রী আমাকে অনুরোধ করলেন, 'দয়া করে আপনি কি এটা সরাবেন?'

আমি উত্তর দিলাম, 'আচ্ছা, এই মহিলা ওয়ার্ডে আপনারা ছাড়া তো আর কোনো পুরুষ মানুষ নেই। বারবার এটা সরাতে বলছেন কেন? আপনারা চলে গেলেই তো হয়। এটা নিয়ে এত হইচইবা কেন করছেন?'

তিনি ব্যাখ্যা দিলেন 'মহিলা ওয়ার্ডের উপরেই তালেবান সৈনিকেরা থাকে। তারা যদি জানালা দিয়ে উঁকি দেয় আর আপনার 'ওই' জিনিস তাদের চোখে পড়ে, তবে তাদের মনে পাপ ঢুকবে।'

আমি বললাম, 'তাদের বলেন, তারা যেন বাইরে না তাকায়। তাহলেই তো ঝামেলা চুকে যায়!'

www.pathagar.com

তিনি বললেন, 'এটা সম্ভব নয়।'

আমি ভাবলাম, আমেরিকা খামোখাই বি-৫২ বোমারু বিমান নিয়ে আফগানিস্তানের উপর বোমা ফেলতে আসছে। এত কিছু না-করে এক প্লেন ভর্তি নারী সৈন্য পাঠিয়ে দিত। তারা প্রত্যেকেই তাদের অন্তর্বাস আকাশে-বাতাসে নাড়া দিত। ব্যাস! তালেবান সব কই পালাত, তাদের টিকিও খুঁজে পাওয়া যেত না–

আসলে গভীরভাবে তলিয়ে দেখলে এই মানুষগুলোর মনের পবিত্রতা, চরিত্রের সুন্দর দিকটি যে কারও কাছেই পরিষ্কার হয়ে উঠবে।

যাহোক, আমাদের তর্ক-বিতর্ক চলতেই থাকল। কে জিতল, কে হারল, জানি না। ইতোমধ্যে আমার কাপড়-চোপড় সব শুকিয়ে গেল।

৯ম দিনের মাথায় সেই মন্ত্রী আমার এখানে আবার এলেন। সাথে আরেকজন মানুষ। দেখলে মনে হয়, এই মানুষটির পক্ষে ঠাণ্ডা মাথায় হাসতে হাসতে যে কাউকে খুন করা সম্ভব।

তারা এসে আমাকে বললেন, 'আপনাকে আমাদের কিছু জিজ্ঞাসা করার আছে।'

'যথেষ্ট হয়েছে'। আমি বিরক্তি মাখা স্বরে উত্তর দিলাম, 'আপনাদের অসংখ্য প্রশ্নের জবাব দিয়েছি। আর নয়। নতুন করে আমার কিছু বলারও নেই।'

কিন্তু তারা নাছোড়বান্দা। আবার শুরু হলো তর্ক-বিতর্ক। দুপক্ষের একে অন্যের প্রতি শাপ-শাপান্ত চলল। শেষে আমি মেজাজ ঠিক রাখতে না পেরে এমন দুঃসাহসিক কাজ করে বসলাম, যা আমি জীবনেও করিনি।

আমি সেই তালেবান অফিসারের মুখে থুথু ছিটিয়ে দিলাম। আমার ভেতরটা এতটাই তেঁতে ছিল।

সে অফিসার দ্রুত চলে গেল। পরক্ষণেই, এক নারী অফিসার ছুটে এলেন 'এ আপনি কী করলেন? আপনার সাহস তো কম নয়! এভাবে একজন অফিসারের মুখে থুথু মেরেছেন! আপনাকে বেত্রাঘাত করা হবে। আপনি সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গেছেন।'

ঘটনার আকস্মিকতায় আমিও হতভম্ব। ভেবে পাচ্ছিলাম না, আমার কী করা উচিত। মনের ভেতর দুঃশ্চিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছিল। আমাকে কি জনসম্মুখে বেত্রাঘাত করা হবে? আল জাজিরা টিভিতে কি তা প্রচার হবে? বেত্রাঘাতের ব্যথা না জানি কেমন!

চিন্তায় আমার মুখ শুকিয়ে আসছিল।

www.pathagar.com

দশ-পনেরো মিনিট পর গেইট খোলার আওয়াজ পেলাম। আমার সঙ্গী খ্রিষ্টান বোন উৎকণ্ঠিত স্বরে বললেন 'ওরা ফিরে এসেছে!'

তিন তিনজন খ্রিষ্টান বোন আমাকে আড়াল করে ঘিরে ধরলেন। চিৎকার করে বলতে লাগলেন 'প্রভু যিশু! করুণা কর। ইভন যেন কোনো ব্যথা অনুভব না করে।'

তাতে আমার ভয় বাড়ল বৈ কমলো না। নিজেকে আমি মনে মনে এমন কাণ্ডের জন্য অভিশাপ দিচ্ছিলাম।

শুনতে পেলাম, একটু একটু করে তাদের পায়ের আওয়াজ এগিয়ে আসছে...

সাত

খানিক পরেই সেই হাসি মুখের ঠাণ্ডা মাথার খুনি ফিরে এলেন। তার হাতে সেই জিনিস যার জন্য বিগত নয়টি দিন আমি অনশন করে চলছি।

তিনি হাতে থাকা স্যাটেলাইট মোবাইল ফোন আমাকে দেখিয়ে দেখিয়ে বললেন, 'যারা যারা চাও মোবাইল ব্যবহার করে আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবদের সাথে কথা বলতে পার। কেবল মাত্র এই ব্রিটিশ মহিলা ছাড়া। সে আমাদের সাথে দুর্ব্যবহার করেছে, আমাদের গায়ে থুথু ছিটিয়েছে।'

চিন্তা করা যায়! এই ছিল পৃথিবীর নিকৃষ্ট নিষ্ঠুর শাসকগোষ্ঠীর আমাকে দেয়া শাস্তি ও নির্যাতনের নমুনা!

ফোন হাতে পেয়ে আমার সাথের মহিলারা খুব খুশি হলেন। মাসের পর মাস তাদের পরিবার-পরিজনের সাথে কথা হয়নি। এই সুযোগ বলতে গেলে তারা লুফে নিলেন।

আমার ভেতরটা পুড়ে যাচ্ছিল। বলতেই হয়, তালেবানের বুদ্ধিবৃত্তি অত্যন্ত উন্নতমানের। তারা খুব সূক্ষ্মভাবে আমাকে আহত করতে পেরেছিল।

আমার সাথে এক আমেরিকান বোন এগিয়ে গেলেন সেই হাসি হাসি মুখের মানুষটির দিকে। 'দেখুন! আজ নয় দিন হলো ইভন এখানে বন্দি। দয়া করে তাকেও একটু কথা বলতে দিন। অন্তত তার মেয়ের সাথে কথা বলুক প্লিজ'।

সেই হাসি হাসি মুখ দৃঢ় স্বরে উত্তর দিল, 'উঁহু! সে আমাদের সাথে খারাপ ব্যবহার করেছে। তাকে অবশ্যই শাস্তি পেতে হবে।'

www.pathagar.com

সেদিন বিকেলে কোনো রকম আগাম ঘোষণা ছাড়াই তালেবানরা আমাকে অন্যদের থেকে আলাদা করে ফেলল। আমার সমস্ত কাপড়-চোপড়সহ আমাকে দোতলার একটি রুমে নিয়ে এল। সেখানে একজন সিনিয়র অফিসার থাকতেন। আমার জন্য তা খালি করা হলো। রুমটি আফগানিস্তানের স্ট্যান্ডার্ড হিসেবে ভালোই।

অফিসার আমার দিকে ফিরে বললেন, 'আপনি নিচের রুমগুলো নিয়ে অভিযোগ করেছিলেন। আজ রাতে এখানেই থাকবেন। কাল সকালে আপনাকে দেশে পাঠিয়ে দেয়া হবে ইনআশাল্লাহ।'

আমি কিছুটা বিরক্তি সহকারে বললাম, 'সব কথার শেষে কি একটা 'ইনশাআল্লাহ, ইনশাআল্লাহ' বলেন, কিন্তু কখনোই তা ঘটে না?'

আসলে আমি ইনশাআল্লাহ শব্দের মানে জানতাম না। এখন আমি জানি 'ইনশাআল্লাহ' মানে 'আল্লাহ যদি চান'।

তারা আমাকে রুমে রেখে আমার হাতে চাবি দিয়ে গেল। আমি ভেতর থেকে দরজা লাগিয়ে দিলাম।

আমার রুম থেকে কাবুল শহরের বিরাট অংশ দেখা যেত। আমি বিছানায় আধশোয়া হয়ে জানালা দিয়ে দূরের নয়নাভিরাম পর্বতমালা দেখছিলাম।

মন আমার নানা চিন্তায় বিক্ষিপ্ত। 'কতবারই তো আমাকে বলা হলো, ইনশাআল্লাহ তুমি বাড়ি যাচ্ছ। কিন্তু সেই ইনশাআল্লাহ তো আজও আসেনি। এবারেও কি তাই? তারা কী বুঝে আমাকে খ্রিষ্টান বোনদের থেকে আলাদা করে নিলেন? তাদের আসলে মতলব টা কী? তারা কি সত্যিই আমাকে মুক্তি দিবে? নাকি সকাল হতেই মেরে ফেলবে?'

হঠাৎ আমার খাটটা দুলে উঠল। প্রচণ্ড শব্দে আমার চিন্তার জট ছিঁড়ে গেল। বাইরে তাকিয়ে দেখি, আলোর ঝলকানিতে গোটা আকাশ আলোয় আলোকিত।

বুঝতে পারলাম যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। সেই রাতে ইঙ্গ-মার্কিন জোট পঞ্চাশ টার উপরে ক্রুজ মিসাইল নিক্ষেপ করেছিল কাবুলের উপর।

ক্রুজ মিশাইলের আওয়াজ অন্তত ২০ মাইল দূর থেকেও শোনা যায়। একটি বোমা এসে পড়ছিল আমাদের জেলখানার আধ মাইলের মধ্যে।

আমি এর আগেও অনেক যুদ্ধের সংবাদ কাভার করেছি। জানি না, এত দিন কেন বিষয়টা খেয়াল করিনি।

www.pathagar.com

সে রাতে এক নতুন উপলব্ধি হলো আমার 'এমন নির্বিচার বোমা বর্ষণ থেকে কেউ বাঁচতে পারবে না। পালানোর কোনো পথ নেই। এই বোমা নারী-শিশু-বৃদ্ধকে আলাদা করতে পারে না। এই বোমাতে যেমন শাসক গোষ্ঠী মরবে, ঠিক তেমনি মুহূর্তেই বেসামরিক অতি সাধারণ নারী-পুরুষ-শিশুও নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। হতে পারে ব্রিটিশ কোনো বোমার আঘাতে এই আমি ব্রিটিশ নাগরিকও মারা পড়েছি। টনি ব্লেয়ার হয়তো সব দায়ভার চাপাবে তালেবানের ঘাড়ে। ব্যস! মিটে গেল সব।'

আমি সত্যিই খুব ভয় পেয়েছিলাম। ভাবলাম, ব্রিটেনের সাথে যুদ্ধ। এখন আর আমাকে ছেড়ে দেয়ার কোনো কারণই নেই।

পরের দিন সকালে আমার দরজার কড়া নড়ে উঠল।

আমাকে বলা হলো, 'আপনি জলদি আসুন। আপনার জন্য নিচে গাড়ি অপেক্ষা করছে। আপনাকে পাকিস্তান পৌঁছে দেয়া হবে।'

আমি এক বিন্দুও বিশ্বাস করিনি।

নিচে নেমে দেখি, আসলেই একটা গাড়ি আমার জন্য অপেক্ষা করছে। আমি গাড়িতে চড়ে বসলাম। জালালাবাদ হয়ে আমার গাড়ি এসে পৌঁছল পাকিস্তান সীমান্তে।

আমাকে পাকিস্তানি সীমান্ত রক্ষীদের হাতে হস্তান্তর করে দেয়া হলো।

আমি যখন 'নো ম্যান্স ল্যান্ডে' এসে পৌঁছালাম, মুহুর্মুহু ক্যামেরার ফ্ল্যাশ জ্বলে উঠল। অসংখ্য সাংবাদিক আমার দিকে ছুটে এল 'আপনার সাথে তালেবান কেমন আচরণ করেছিল?'

আমি এক মুহূর্ত ভাবলাম। তারপর মুখ খুললাম 'অত্যন্ত সম্মানজনক ও মর্যাদাপূর্ণ।'

পশ্চিমা সংবাদ মাধ্যম আমার উত্তরে ভীষণ হতাশ হলো। তারা এমন কিছু মোটেও আশা করেনি। তারা চাইছিল 'আবু গারীব' টাইপের কিছু একটা। তাদের প্রত্যাশা ছিল, আমার দুই গালে থাকবে আঘাতের চিহ্ন। দুচোখে থাকবে অশ্রুধারা।

তারা ভেবেছিল, আমি এসে বলব 'আমার সাথে অত্যন্ত খারাপ ব্যবহার করা হয়েছে, আমাকে ধর্ষণ করা হয়েছে কিংবা আমাকে অত্যন্ত বর্বরোচিতভাবে পেটানো হয়েছে।'

আফসোস! সে রকম কিছুই হয়নি। সত্যি কথাটাই আমাকে বলতে হয়েছে। দুঃখজনক হলেও সত্যি, কিছু মানুষের জন্য এই সত্যটা হজম করা কঠিন।

দু সপ্তাহ পরে আমি লন্ডন ফিরে এলাম। একদিন আমার পাকিস্তানি গাইড পাশা আমাকে ফোন করল, 'ম্যাডাম! জালালাবাদের সেই ছোট গ্রামটির কথা কি আপনার মনে আছে? সেই গ্রামটি বোমার আঘাতে পুরো নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।'

www.pathagar.com

আমি সান্ত্বনার ভঙ্গিতে বললাম, 'দেখ পাশা! যুদ্ধ যখন চলে তখন এরকম অনেক ঘটনাই ঘটে যা ঠেকানো যায় না। এটা একটা দুর্ঘটনা মাত্র।'

পাশা উত্তর দিল, 'ম্যাডাম! টানা তিন দিন ধরে যখন একটা গ্রামের উপর নির্বিচারে বোমা ফেলা হয়, তখন আপনি তাকে দুর্ঘটনা বলেন কী করে?'

আমার কাছে এর কোনো জবাব ছিল না। আমি বুঝতে পারছিলাম, ইচ্ছে করেই বেসামরিক লোকদের টার্গেট করে নির্বিচারে বোমা ফেলা হচ্ছে। যাতে এক ইঞ্চি পরিমাণ জায়গাও সে বোমার বাইরে না থাকে।

অবশ্য এর কিছু দায় তালেবানেরও ছিল।

যুদ্ধ শুরুর পরপরই তালেবান সকল পশ্চিমা সাংবাদিকদের দেশ থেকে বের করে দিয়েছিল। সাংবাদিক যে দেশেরই হন না-কেন, তাদেরকে তাদের মতো করেই তথ্য সংগ্রহ করতে হয়। পশ্চিমা সাংবাদিকরা না থাকাতে গোটা বিশ্ব বুঝতেই পারেনি, নির্বিচারে বোমা মেরে ইঙ্গ-মার্কিন জোট কী পরিমাণ হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছিল।

এই ঘটনা আমাকে দারুণভাবে প্রভাবিত করেছিল। আমি যুদ্ধবিরোধী আন্দোলনে সক্রিয় হয়ে উঠলাম।

একই সময়ে তালেবানকে দেয়া আমার প্রতিশ্রুতির কথা মনে পড়ে গেল। তারা তাদের কথা রেখেছে। আমাকে নিরাপদে মুক্তি দিয়েছে। আমি তো কথা দিয়েছিলাম, মুক্তি পেলে আমি কুরআন পড়ব, ইসলাম নিয়ে গবেষণা করব।

এবার আমার প্রতিশ্রুতি রক্ষার পালা।

আট

আমি কুরআন পড়া শুরু করলাম।

কিছু মুসলিম আমার এই কুরআন পড়ার কথা জানতে পারল। তাদেরই একজন আমাকে দিলেন আব্দুল্লাহ ইউসুফ আলীর ইংরেজি অনুবাদ। এই অনুবাদের শেষের দিকে ইনডেক্স দেয়া ছিল। এই যেমন; নারী বিষয়ে কুরআনে কোথায় কী বলা হয়েছে, আল্লাহ সম্পর্কে কী আছে, নবি, ফেরেশতা ও পরকাল সম্পর্কে কুরআনের ভাষ্য কী, ইত্যাদি।

ভাবলাম, যাক ভালোই হলো। খুব সহজেই নির্দিষ্ট বিষয় সম্পর্কে জানতে পারব। আমি প্রথমে ভাবলাম, নারী সম্পর্কিত আয়াতগুলো পড়া যাক। দেখা যাক, কুরআন নারীদের সম্পর্কে কী বলে? বিশেষ করে কুরআন কীভাবে নারীদেরকে পুরুষদের অধীনস্থ করে রাখতে, অবদমিত করে রাখার কথা বলে?

www.pathagar.com

আমি নারী সম্পর্কিত আয়াতগুলো পড়া শুরু করলাম। পাশাপাশি এ সম্পর্কে আরও ভালো করে বুঝার জন্য ইসলামিক বই-পত্রও হাতের কাছে রাখলাম।

অবিশ্বাস্য! আমি যা পেলাম, বিশ্বাসই করতে পারছিলাম না। কুরআন কোনো রকম দ্বিধা ছাড়াই পরিষ্কার ভাষায় ঘোষণা করছে, আল্লাহর কাছে আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে, শিক্ষার ক্ষেত্রে নারী পুরুষ একই মর্যাদার এবং একই কাতারের।

প্রথম ইসলাম গ্রহণকারী ছিলেন একজন নারী (হযরত খাদিজা রা.)। ইসলামের পথে প্রথম শহীদও ছিলেন একজন নারী (হযরত সুমাইয়া রা.)। ইসলামের প্রথম দিন থেকেই নারীরা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এসেছিলেন। এমনকি পুরুষদের পাশাপাশি তারা যুদ্ধও করেছিলেন।

উহুদ যুদ্ধের সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছিলেন, 'আমি আমার সামনে পেছনে যেদিকেই তাকাচ্ছিলাম, দেখলাম এক নারী বীর বিক্রমে যুদ্ধ করে আমাকে শত্রুদের হাত থেকে বাঁচানোর চেষ্টা করছিলেন।'

বুঝতে পারছিলাম না, ইসলামে নারীরা নির্যাতিত, নিষ্পেষিত...এই ধারণা আমরা কোথায় পেলাম? কে আমাদের মনে এই বিষ ঢুকিয়ে দিয়েছে? আমি তো কোথাও এমন কিছু খুঁজে পেলাম না। শিক্ষা, সম্পত্তি, তালাক সব ক্ষেত্রেই নারীর অংশ আছে, আছে অধিকার। আজ আমরা নারী অধিকারের কথা বলি। দৃশ্যত মনে হয়, আধুনিক নারীদের আইন-কানুনগুলো যেন ইসলামিক আইনের দ্বারাই অনুপ্রাণিত।

আমি ইসলামকে নতুন দৃষ্টিতে দেখা শুরু করলাম। আমার মনে হলো, ইসলাম ও নারী সম্পর্কে তো জানলাম, এবার দেখা যাক মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষগুলো কেমন? বিশেষত নারীরা।

আমি পৃথিবীর যে প্রান্তেই গিয়েছি সেটা হোক পাকিস্তান, সৌদি আরব, কানাডা, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া কিংবা নিউজিল্যান্ড... আমি মুসলিম বোনদের পেয়েছি বিভিন্ন পেশার, বিভিন্ন যোগ্যতার অধিকারী হিসেবে।

কয়েক বছর আগেও হিজাবধারী কোনো মহিলাকে দেখলে আমার মনে হতো, আহা বেচারি! কত নির্যাতিত আর পরাধীন অবস্থার ভেতরেই না আছে! ঘর থেকে বাইরে আসতে তাদের কী কষ্টই না করতে হয়েছে!

এখন আমি হিজাবধারী বোনদের দেখলে বোঝার চেষ্টা করি, এদের মধ্যে কে ডাক্তার, কে ইঞ্জিনিয়ার, কে আইনজীবী, কে শিক্ষক, কে পিএইচডি করছেন, কে এমফিল করছেন... কে তার পেশার পাশাপাশি তার পরিবার, সমাজ গড়াতে সময় দিচ্ছেন। আমি এখন আর তাদের বাহ্যিক পোশাক দিয়ে বিচার করি না। ভাবি, পর্দার আড়ালের মানুষটি আসলে কেমন।

www.pathagar.com

আমার মনে আছে, কানাডার এক বোন আমাকে বলেছিলেন, 'Yvonne, My head might be covered, but mind is not. (ইভন! আমার মাথা ঢাকা থাকতে পারে, কিন্তু আমার মন-মনন-চিন্তা অবরুদ্ধ নয়, স্বাধীন'।) আমি তার কথায় এক বিশাল শিক্ষা পেয়েছিলাম।

মুসলমানদের আরেকটা বিষয় খুব চমৎকার, তাদের রয়েছে চমৎকার সামাজিক বন্ধন।

যাহোক, তখনো আমি শাহাদাহ উচ্চারণ করিনি। ইসলাম নিয়ে গভীর পড়াশোনা করছিলাম। যদিও বাজারে জোর গুঞ্জন ছিল, আমি বোধহয় ইসলাম কবুল করেছি।

একদিন আমার কাছে একটা ফোন এল 'সিস্টার ইভন! আপনাকে ইসলামে স্বাগতম।' তিনি ছিলেন প্রিন্সটাউনের চরম মতাদর্শী ইমাম, আবু হামজা আল মাসরি।[৯]

আমি উত্তর দিলাম, 'আপনাকে ধন্যবাদ। তবে আপনার ধারণা সঠিক নয়। আমি এখনো শাহাদাহ উচ্চারণ করিনি। আশা করি ইনশাআল্লাহ স্বল্প সময়ের মধ্যে আমি আমার সিদ্ধান্ত নিতে পারব।'

তিনি বললেন, 'সমস্যা নেই বোন। আপনি আপনার মতো করে সময় নিন। ভালোমতো অধ্যয়ন করুন, জানুন, বুঝুন। ইসলাম গ্রহণের সিদ্ধান্ত হবে আপনার জীবনের সবচেয়ে কঠিন সিদ্ধান্ত। আমরা আপনার জন্য দোয়া করি, যাতে আল্লাহ আপনাকে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করেন, আপনাকে হিদায়া দেন।'

আমি বিশ্বাসই করতে পারছিলাম না, তিনি এই ভাষায় কথা বলছেন। এক চোখে পট্টি বাধা এই ইমামের বদনামের শেষ ছিল না। ট্যাবলয়েড পত্রিকাগুলো ছিল তার নানা কিচ্ছা কাহিনিতে ভরপুর।

আমি উত্তরে বললাম, 'আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। আমি সময়ে সময়ে আমার অগ্রগতি সম্পর্কে আপনাকে জানাব'– আমি ফোনটা রেখে দিচ্ছিলাম।

তিনি বললেন, 'এক মিনিট! শুধু একটা বিষয় আপনাকে বলতে চাই। আপনি যদি আগামিকাল বাইরে বের হন, আর মুসলিম হওয়ার আগে কোনো বাসের নিচে চাপা পড়ে মারা যান'... তার কণ্ঠ এবার মেঘের মতো গর্জে উঠল 'তাহলে আপনার জায়গা হবে...সোজা জাহান্নামে!'

'ধন্যবাদ!' আমি ফোনটা রেখে দিলাম। ভেতরে ভেতরে আমার খুব নার্ভাস লাগছিল। আমি জলদি শাহাদাত পড়ার জন্য উদগ্রীব হয়ে উঠছিলাম।

www.pathagar.com

অবশেষে ২০০৩ সালের ৩০ই জুন, সকাল ১১:৩০ এ আমি আমার শাহাদাহ উচ্চারণ করলাম, 'আশহাদু আন লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ, ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ।' আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই আর মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর বান্দা ও রাসূল'। আমি যোগ দিলাম পৃথিবীর সবচেয়ে বড়, সবচেয়ে আপন এক বিশাল পরিবারে। আমি বিশ্বাস করি, পৃথিবীর যে প্রান্তেই আমি থাকি না কেন, আমার মুসলিম ভাইবোনেরা আমাকে আপন করে নিবেন।

পরিচিতি

ব্রিটিশ সাংবাদিক ইভনের জন্ম ২৩ই এপ্রিল ১৯৫৮ ইংল্যান্ডের ডারহামে। তার পেশাগত জীবন শুরু হয় Stanley News পত্রিকার মাধ্যমে। এরপরে তিনি The Sunday Times, The Independent on Sunday, The Observer, the Daily Mirror সহ বিশ্ববিখ্যাত বেশ কয়েকটি পত্রিকায় রিপোর্টার ও সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ২০০১ সালে টুইন টাওয়ারে হামলার পর তিনি আফগানিস্তানে ছদ্মবেশে প্রবেশ করেন সংবাদ সংগ্রহের জন্য। এক পর্যায়ে তালেবানের হাতে তিনি বন্দি হন। তার বন্দি হবার খবরে সারা বিশ্বে হইচই পড়ে যায়। তার প্রতি তালেবানদের মার্জিত ব্যবহার তাকে ইসলাম নিয়ে ভাবতে অনুপ্রাণিত করে। একসময় ইসলাম নিয়ে গভীর অধ্যয়ন শেষে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন।

পরবর্তী জীবনে তিনি ইরাক, আফগানিস্তান, ফিলিস্তিনসহ বিভিন্ন যুদ্ধবিরোধী আন্দোলনে সম্পৃক্ত হন। বিভিন্ন মিডিয়া, প্রচার মাধ্যমে ইসলাম ও মুসলিমদের বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে সোচ্চার হন। তালেবানের হাতে বন্দি হওয়া ও তার আগে পরের সময়কাল নিয়ে তার লেখা বই In the Hands of Taliban সারা বিশ্বে দারুন আলোচিত হয় ও সাড়া ফেলে। তার লেখা বইগুলোর মধ্যে আরো আছে Ticket to Paradise, Torture-Does it work? ইত্যাদি। উপরে বর্ণিত কাহিনি ২০০৩ সালে নিউজিল্যান্ডে দেয়া এক বক্তৃতার রূপান্তর।

ব্যক্তিগত জীবনে তিনি এক কন্যা সন্তানের জননী।

পাদটিকা

১. খায়বার পাস : আফগান পাকিস্তান সীমান্তের বিখ্যাত গিরি উপত্যকা ও পথ। এটি দৈর্ঘ্যে প্রায় ৩৩ মাইল। সমুদ্র পৃষ্ঠের ৬০০-১০০০ ফুট উপরের এই বিশাল পাহাড়ি রাস্তা আফগানিস্তানের কাবুলের সাথে পাকিস্তানের পেশোয়ারকে যোগ করেছে। একসময় খাইবার পাস ঐতিহাসিক সিল্ক রোডের অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিল।

২. নো ম্যান্স ল্যান্ড : নো ম্যানস ল্যান্ড বলতে বুঝায়, বিবাদমান দুটি পক্ষের মধ্যকার এমন একটি স্থান, যার উপরে আসলে কোনো পক্ষেরই নিয়ন্ত্রণ নেই। সাধারণত দুটি পক্ষ যখন একে অপরের সাথে সামনা-সামনি যুদ্ধে লিপ্ত হয়, তখন দু-পক্ষের মাঝে এমন কিছু স্থান থাকে, যেটি অতিক্রম করা কিংবা তাতে অবস্থান করাটাকে দু-পক্ষই ঝুঁকিপূর্ণ মনে করে। দুটি পক্ষই এমন এলাকায় অবস্থান করা থেকে বিরত থাকে। বিরোধপূর্ণ অনেক সীমান্তেই এমন 'নো ম্যানস ল্যান্ডে'র দেখা মিলে।

www.pathagar.com

৩. পশতু : আফগানিস্তানের অন্যতম জাতীয় ভাষা। দেশের প্রায় শতকরা ষাট ভাগ মানুষ পশতু ভাষায় কথা বলেন। পাকিস্তানের মোট জনসংখ্যার প্রায় ১৫% মানুষের মাতৃভাষা পশতু।

৪. মোল্লা উমর : পুরো নাম মোল্লা মুহাম্মাদ উমর। তালেবান শাসিত আফগানিস্তানের প্রধান রাষ্ট্র নায়ক ও অন্যতম প্রধান ধর্মীয় নেতা। ১৯৯৬-২০০১ সাল পর্যন্ত তিনি আফগানিস্তানের রাষ্ট্রপ্রধান ছিলেন। ২০১৩ সালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

৫. রয়টার্স : বিশ্ববিখ্যাত আন্তর্জাতিক সংবাদ মাধ্যম। ইংল্যান্ডের লন্ডনে এর সদর দপ্তর।

৬. রোমান ক্যাথলিক : খ্রিষ্ট ধর্মের সুপ্রাচীন শাখা। পৃথিবীব্যাপী প্রায় ১৩০ কোটি মানুষ এই ধর্মীয় গোষ্ঠীর অনুসারী। ইতালীর রাজধানী রোমের ভেতরে ছোট্ট এক রাষ্ট্র 'ভ্যাটিক্যান সিটি'। ভ্যাটিক্যান সিটির চার্চের যিনি প্রধান, তার উপাধী হলো 'পোপ'। বিশ্বব্যাপী ক্যাথলিক খ্রিষ্টানদের তিনিই প্রধান আধ্যাত্মিক ও ধর্মীয় গুরু।

ক্যাথলিকদের বাইবেলে মোট ৭৩ টি অধ্যায়। ক্যাথলিকরা বিশ্বাস করে আদি ও অবিনশ্বর ঈশ্বর একজনই। কিন্তু তিনটি রূপে তার প্রকাশ; স্বর্গীয় পিতা, পুত্র তথা যিশু এবং পবিত্র আত্মা। ক্যাথলিকরা মনে করে ধর্মীয় বিধান মানার ক্ষেত্রে চার্চ এবং বাইবেলের বাণী দুটোরই সমান গুরুত্ব আছে। ক্যাথলিক ধর্ম মতে চার্চের প্রধান পুরোহিতরা হবেন পুরুষ এবং অবিবাহিত। তাদের মতে পোপ হলেন নিষ্পাপ ও সকল পাপমুক্ত। পবিত্র আত্মার মাধ্যমেই তিনি সব সিদ্ধান্ত নেন। তাই পোপের কথাই আইন, তিনি সমগ্র চার্চের প্রতিনিধিত্ব করেন। ক্যাথলিকরা বিশ্বাস করে চার্চের প্রধান পাদ্রী কিংবা পুরোহিতের কাছে গিয়ে দোষ স্বীকার করে নিলেই, পাপ মার্জনা হয়ে যায়।

৭. প্রোটেস্ট্যান্ট : প্রায় ৯০ কোটি মানুষের এই ধর্মমত খ্রিষ্ট ধর্মের দ্বিতীয় বৃহত্তম শাখা। ক্যাথলিকদের সাথে এই মতের প্রধান পার্থক্য চার্চের কতৃত্ব নিয়ে। প্রোটেষ্ট্যান্টরা চার্চ ও চার্চের পাদ্রীদের অভ্রান্ত ও ঐশ্বরিক মনে করেন না। বিখ্যাত জার্মান দার্শনিক, খ্রিষ্টিয় পন্ডিত মার্টিন লুথারের হাত ধরেই এই মতবাদের জন্ম। প্রোটেস্ট্যান্টদের বাইবেলে অধ্যায়ের সংখ্যা ৬৬টি। প্রোটেস্ট্যান্টরা বিশ্বাস করেন, বাইবেলই ধর্মীয় আইনের একমাত্র উৎস। চার্চ কিংবা গীর্জার পুরোহিতের এক্ষেত্রে কোনো ভূমিকা নেই। তারা মনে করেন, চার্চের কাছে গিয়ে দোষ স্বীকার করলেই পাপের মার্জনা হয় না। মানুষের মুক্তি মিলবে তার বিশ্বাস ও কাজের উপরে।

৮. অ্যাংলিকান : এরা মূলত চার্চ অব ইংল্যান্ডের প্রোটেস্ট্যান্ট মতের অন্য একটি ধারা।

৯. ব্যাপ্টিস্ট : ব্যাপ্টিস্টরাও প্রোটেস্ট্যান্টদের আরেকটি ধারা। তারা এক ঈশ্বরে বিশ্বাস করে। তাদের অনেকেই আছেন যারা মদ, জুয়া, নাচ-গান ইত্যাদিকে খারাপ চোখে দেখেন। এগুলো বাদ দিয়ে শুদ্ধ জীবনযাপনের কথা বলেন। তাদের আলাদা চার্চ আছে।

১০. আবু হামজা আল মাসরি : মিসরে জন্ম নেয়া আবু হামজা ছিলেন ফিসবুরি পার্ক মসজিদের ইমাম। তিনি বসনিয়াতে সার্বদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন। তার এক হাত ছিল কাটা, এক চোখ নষ্ট। ছাত্র হিসেবে ব্রিটেনে এসে সেখানেই ইঞ্জিনিয়ারিং সমাপ্ত করেন। বিধর্মীদের উপর আক্রমণ, বোমাবাজি ইত্যাদিকে সমর্থন করে কুখ্যাতি অর্জন করেন। বিবিসিসহ অনেক আন্তর্জাতিক প্রচার মাধ্যম তাকে নিয়ে প্রতিবেদন প্রচার করে। ২০০৪ সালে ব্রিটিশ পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে। ১১ টি অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত হয়ে তার যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়। তিনি বর্তমানে ব্রিটেনের জেলে বন্দি আছেন।

www.pathagar.com

আমি ইউসুফ এস্টেস বলছি

ইউসুফ এস্টেস

এক.

আমার নাম ইউসুফ এস্টেস। আমাকে চিনেছেন তো?

আপনারা যারা পিস টিভি দেখেছেন তারা আমাকে চিনবেন। ঐ যে বিরাট জুব্বা গায়ে লম্বা দাড়িওয়ালা সাদা চামড়ার আমেরিকান। আমার দর্শকবৃন্দ বলে থাকে, আমি নাকি মজা করে কথা বলি। কী জানি!

আমার জীবনে মজার কিছু ঘটনা আজ আপনাদের সামনে তুলে ধরব। আমাকে অনেকেই জিজ্ঞাসা করেন, আপনি তো ছিলেন খ্রিষ্টান ধর্মযাজক। আপনার মতো মানুষ কী করে মুসলিম হলেন?

এ প্রশ্ন কেবল মুসলমানদেরই নয়, একই প্রশ্ন অনেক অমুসলিমরাও করেন। বিশেষ করে খ্রিষ্টানরা। তারা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেন, 'তুমি কী করে ধর্ম ত্যাগ করলে? মনে হয় যিশুর বাণী তুমি ভালো করে বোঝনি। বুঝলে কী আর খ্রিষ্টধর্ম ছেড়ে মুসলিম হতে পারতে?'

যাহোক, আপনাদেরকে আমি আমার মুসলিম হবার গল্প শোনাই।

আমার বাড়ি আমেরিকার টেক্সাসে। আমি আর আমার বাবা দুজনেই ছিলাম গির্জার মিনিস্টার। আমরা একদিকে ধর্ম প্রচার করতাম। অন্যদিকে পারিবারিক ব্যবসা দেখাশোনা করতাম। সত্যি বলতে কী, ধর্মপ্রচারের চেয়ে আমাদের ব্যবসার কাজই বেশি হতো। নানা ধরনের ব্যবসার সাথে আমাদের সম্পর্ক ছিল।

একদিন আমার বাবা আমাকে বললেন, 'আমি একজন নতুন মানুষের সাথে ব্যবসা করতে যাচ্ছি। লোকটার বাড়ি মিসর।'

www.pathagar.com

আমি উত্তর দিলাম 'বাহ! ভালো তো! আমরা এখন দেশের সীমা ছাড়িয়ে বিদেশী লোকের সাথে ব্যবসা করতে যাচ্ছি। আমাদের ভিজিটিং কার্ডে লেখা থাকবে, আন্তর্জাতিক ব্যবসায়ী। ভাবতেই ভালো লাগছে।'

বাবা বললেন, 'এই লোকের বাড়ি মিসরের কায়রোতে। ঐ যে নীল নদ, মমি আর স্ফিংসের শহর!'

আমি বললাম, 'হুম! তাহলে তো ওই লোকের সাথে দেখা করাটা বেশ হবে!'

বাবা বললেন, 'তবে একটা কথা। মানুষটি মুসলিম।'

সেদিনের কথা আমার আজও মনে পড়ে। আমাদের বাড়িতেই বাপ-বেটার কথা হচ্ছিল। আমি কথা বলতে বলতে রান্নাঘর থেকে বসার ঘরে আসছিলাম। বাবার শেষের কথা শুনে আমি রীতিমত থমকে গেলাম। আমি যেখানটায় ছিলাম সেখানেই আটকে গেলাম, 'কী বললে? মুসলিম! এ অসম্ভব!'

আমরা টিভিতে জিমি সোগার্ট, প্যাট রবার্টসন...এরকম অনেক ধর্মযাজকের কথা শুনতাম। আমরা জানতাম, মুসলিমদের চেয়ে খারাপ মানুষ আর নেই। যত খারাপ কাজ সব তাদের দ্বারাই হয়। হাইজ্যাক, ছিনতাই, খুন...সব।

আমাদেরকে বলা হতো মুসলমানরা এমন যে, এরা ঈশ্বরেও বিশ্বাস করে না। তারা মরুভূমির ভেতরে একটা কালো বাক্সের পূজা করে আর দিনে পাঁচ বার মাটিতে চুমু খায়। এরকম একজন মুসলিমের সাথে কথা বলা, ব্যবসা করা!

আমি আবার জোর দিয়ে বললাম, 'এ অসম্ভব!'

বাবা বললেন, 'সে আসলেই মানুষ হিসেবে চমৎকার। আগে তো তার সাথে দেখা কর।'

আমার কাছে ব্যাপারটা মোটেও ভালো লাগছিল না। আমি কোনভাবেই মেনে নিতে পারছিলাম না।

বাবা অনেকটা আমার উপর জোরই খাটালেন, 'দেখ! আমি চাই তুমি তার সাথে দেখা কর, কথা বল। ব্যস!'

শেষে আমি রাজি হলাম, ঠিক আছে। তবে তার সাথে দেখা করব রবিবারে'।

তার সাথে দেখা করার আগে আমার ইচ্ছে আমি চার্চ থেকে ফিরব। হাতে থাকবে ক্রুশ আর বগলের নিচে বাইবেল। আমার মাথায় থাকবে 'যিশুখ্রিষ্টই আমার প্রভু' সম্বলিত ক্যাপ। এ অবস্থায়ই আমি ওই অবিশ্বাসী মুসলিমটার সাথে দেখা করব, যাতে তার ভেতরের শয়তানটা আমাকে দেখে পালিয়ে যায়।

www.pathagar.com

ঠিক রোববার দিন আমি চার্চ থেকে ফিরে আসলাম। বাসায় ফিরে আমি সেই মুসলিম লোকটার খোঁজ করলাম। আমার মনে হচ্ছিল, লোকটা হবে বিরাট আলখাল্লায় ঢাকা, বিশাল দাড়ির অধিকারী কেউ। তার মাথায় থাকবে আরবদের মতো রোব, কোমরে গুঁজে থাকবে বিরাট তলোয়ার।

আমি এদিক-সেদিক তাকাচ্ছিলাম। কই, তেমন কাউকে তো দেখছি না। বাবাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'কই? সেই মুসলিম লোকটা কই?'

বাবা আঙ্গুল তুলে দেখালেন, 'ঐ তো সে।'

এই লোক? আমি কিছুটা অবাক হলাম। এতো খুবই সাধারণ সাদাসিধে একজন মানুষ। তার মুখে লম্বা দাড়ি নেই, এমনকি মাথাও চুলহীন, খালি। আমি হাত বাড়িয়ে তার সাথে পরিচিত হলাম। তার নাম মুহাম্মাদ। প্রাথমিক আলাপচারিতার পর শুরু হলো প্রশ্নোত্তর। অনেকটা জেরার মতোই বলতে পারেন।

'তুমি কি ঈশ্বরে বিশ্বাস কর?'

'জ্বি।'

'ইবরাহিম, সুলেমান, দাউদ এদেরকে মানো?'

'জ্বি, মানি।'

আরে এতো দেখি সবই মানে! প্রথমে ভেবেছিলাম, মুসলমানরা বোধহয় হিন্দুদের মতো। যখন দেখলাম এই লোক ইবরাহিম, সুলেমান, দাউদকে মানে, তখন ভাবলাম এরা বোধহয় ইহুদিদের মতোই।

তাই এবার জিজ্ঞাসা করলাম, 'আর যিশুকে মানো?'

সে উত্তর দিল, 'জ্বি মানি'।

আমি তো মনে মনে মহাখুশি। যাক এই লোককে খুব সহজেই খ্রিষ্টান বানানো যাবে। আমি তাকে নিয়ে এবার চায়ের টেবিলে বসলাম। খাওয়া-দাওয়ার ফাঁকে ফাঁকে চলতে থাকল আমাদের আলাপচারিতা। বলতে গেলে সব কথা আমিই বলছিলাম। আমি তার সামনে বাইবেল থেকে পড়তে শুরু করলাম, আর তাকে খ্রিষ্টান ধর্মের বিভিন্ন কিছু বুঝানোর চেষ্টা করছিলাম।

তিনি একটি কথাও বলেননি। মনোযোগী শ্রোতার মতো চুপচাপ শুনে যাচ্ছিলেন। আমি ভাবলাম, তিনি স্বল্প শিক্ষিত এবং ধর্ম সম্পর্কে কম জানা একজন মানুষ।

আজ সেসব কথা ভাবলে মনে হয়, তখন কী ইডিয়টই না ছিলাম আমি! আসলে তিনি ছিলেন আল আজহার ইউনিভার্সিটি থেকে পাস করা একজন গ্র্যাজুয়েট।

www.pathagar.com

পরের রমজানে তিনি মসজিদে থাকা শুরু করলেন। মূলত তিনি ইতেকাফ করছিলেন। কিন্তু আমরা সেটা বুঝিনি।

আমি বাবাকে বললাম, 'দেখ, লোকটার থাকার ভালো কোনো ব্যবস্থা নেই।'

বাবা বললেন, 'কী বলো! আমি তো জানি তার টাকা পয়সা ভালোই আছে। এমন তো হবার কথা নয়।'

আমি বললাম, 'আমি নিজ কানে শুনেছি, তিনি মসজিদে থাকা শুরু করেছেন।'

আমাদের খ্রিষ্টানদের কাছে কোনো লোক চার্চে থাকা মানে, লোকটা অত্যন্ত হতদরিদ্র কিংবা অসহায়।

আমি বাবাকে বললাম, 'এক কাজ করি। আমি তাকে বলি যেন তিনি আমাদের সাথে থাকেন।'

বাবা বললেন, 'শুধু শুধু এমন কিছু করতে যেও না। তিনি হয়তো মাইন্ড করতে পারেন।'

আমি তাও জিদ ধরলাম 'আহা! বলেই দেখি না!'

পরে একদিন আমি মুহাম্মাদকে আমাদের সাথে থাকার প্রস্তাব দিলাম। তিনি বললেন, 'না! আমি মসজিদে ভালোই আছি আর সেখানেই থাকতে চাই।'

আমি বললাম, 'আমাদের কোনো অসুবিধা নেই। আপনি আমাদের সাথেই থাকুন।'

তিনি আবারও বললেন, 'না না! আমার কোনো অসুবিধা নেই। আমি সেখানেই ভালো আছি।'

আহারে বেচারা! তার জন্য আমার মায়াই লাগছিল। 'কষ্ট করে মসজিদে থাকছে, কিন্তু আত্মসম্মানবোধের জন্য আমাদের সাথে থাকতে রাজিও হতে পারছেন না।'

আমি তার আত্মসম্মানের দিকে চিন্তা করে প্রস্তাব করলাম, 'আপনি ইচ্ছে করলে এর জন্য আমাদের ভাড়াও দিতে পারেন।'

তিনি জিজ্ঞাসা করলেন 'কত?'

আমি বললাম 'সপ্তাহে পনেরো ডলার'। আমেরিকার মতো জায়গায় সপ্তাহে পনেরো ডলার আসলে কিছুই না।

তিনি কিছুটা ইতস্তত করছিলেন। আমি তার ইতস্তত ভাব দেখে বললাম 'সাথে খাবার ফ্রি।' খাওয়াসহ একদিন থাকতে গেলেই যেখানে পনেরো ডলারের বেশি খরচ হয়,

www.pathagar.com

সেখানে কিনা পুরো সপ্তাহের জন্য মাত্র পনেরো ডলার! আমি ভাবছিলাম, আমাদের সাথে থাকলে তার সাথে আরও বেশি কথা বলা যাবে। কোনভাবে হয়তো তাকে আমি খ্রিষ্টান ধর্মে দীক্ষিত করতে পারব।

তিনি এবার সায় দিলেন, 'আচ্ছা ঠিক আছে।'

ফিরে এসে বাবাকে বললাম, 'দেখলে তো, তাকে কীভাবে রাজি করিয়ে নিলাম!'

আমি তো আর জানতাম না, আসলে তিনিই মনে মনে আমাদের সাথে থাকতে চাইছিলেন। তিনি জানতে চাচ্ছিলেন, আমেরিকানদের চলাফেরা, চাল-চলন, সংস্কৃতি কেমন। বিশেষ করে যারা ধর্ম প্রচার করে তাদের।

দুই

আমরা একসাথে ব্যবসা শুরু করলাম।

কখনো কখনো আমরা টেবিল চেয়ার সাজিয়ে বিভিন্ন পণ্য সামনে নিয়ে বসতাম।

একটা অদ্ভুত ব্যাপার লক্ষ্য করলাম। যখনই কেউ সামনে থেকে কোনো জিনিস নিতে চাইত, তিনি পেছন থেকে আরেকটি ভালো মানের জিনিস ক্রেতার দিকে এগিয়ে দিতেন।

আমি বললাম, 'মুহাম্মাদ, আমরা সাধারণত মানের দিক দিয়ে কিছুটা খারাপ জিনিসগুলো সামনে রাখি। আর ভালোগুলো রাখি পেছনে। যাতে একটু খারাপ মানের পণ্যগুলো আগে বিক্রি হয়ে যায়। তুমি আবার আগ বাড়িয়ে মানুষকে পেছন থেকে দিতে গেলে কেন?'

তিনি বললেন, 'এ আমার দ্বারা সম্ভব নয়।'

'কেন?'

'কারণ, আমার ধর্ম আমাকে শিক্ষা দেয়, বিক্রির সময় ভালোটাই ক্রেতাকে বুঝিয়ে দিতে, মন্দটা নয়।'

আচ্ছা! তিনি তাহলে তার ধর্মকে সেরা বুঝাতে চাইছেন! আমি আপাতত চুপ করে গেলাম। তবে এতে আমাদের লাভের অংক কমে গেল।

তার সাথে থেকে থেকে আমি আরও অনেক কিছু শিখলাম। তিনি ছিলেন বিনয়ী, শিক্ষিত এবং খুব বুদ্ধিমান একজন মানুষ। আমাদের মধ্যে অনেক বিষয় নিয়ে কথা হতো।

www.pathagar.com

তিনি চাইলে যেকোনো বিতর্কে আমাকে খুব সহজেই নাস্তানাবুদ করে দিতে পারতেন। কিন্তু লোকটা এতটাই বুদ্ধিমান ছিলেন, তিনি বুঝতে পারছিলেন আমি কী করতে আর কী বুঝাতে চাইছি। তিনি ইচ্ছে করেই প্রায় সব বিতর্কে আমাকে জিতিয়ে দিতেন।

আমাদের এলাকায় একজন নামকরা খ্রিষ্টান পাদ্রী ছিলেন। তিনি বিশাল এক ক্রুশ হাতে রাস্তায় ঘুরে বেড়াতেন; যাতে লোকজন তার কাছে এগিয়ে আসে আর তার সাথে কথা বলে। তিনি এভাবে মানুষকে বাইবেলের বাণী শুনাতেন।

একবার তিনি খুব অসুস্থ হয়ে গেলেন। আমি হাসপাতালে তাকে দেখতে গেলাম। সেখানে তার পাশে আরেকজন মানুষের সাথে আমার দেখা হলো। এই মানুষটি ছিলেন খুব চুপচাপ। কারও সাথেই তেমন একটা কথা বলতেন না। দেখেই বুঝা যেত তার জীবনের উপর দিয়ে প্রচণ্ড ঝড় বয়ে গেছে। দুঃখী দুঃখী আর হতাশায় ঢাকা যন্ত্রণা-ক্লিষ্ট চেহারা।

আমি তাকে সান্ত্বনা দিতে গেলাম, 'মন খারাপ করবেন না। ইউনুস নবির ঘটনা জানেন তো? তিনি গহীন সাগরে মাছের পেটে দিন কাটিয়েছিলেন। মাছের পেটে থাকা... ভাবা যায়! খাবার নেই, পানি নেই, নেই পর্যাপ্ত আলো-বাতাস। এ অবস্থায়ও তিনি ঈশ্বরকে ভোলেননি। ঈশ্বর তাকে মাছের পেট থেকে উদ্ধার করেছেন। আপনার অবস্থা নিশ্চয় তার চেয়ে খারাপ নয়। ঈশ্বরের উপর ভরসা রাখুন। তিনি নিশ্চয়ই আপনার সকল বিপদ-আপদ দূর করে দিবেন।'

'হুম', যেন অনেক অনিচ্ছা নিয়ে জবাব দিলেন।

আমি জানতে চাইলাম, 'আপনার নাম কী?'। কোনো জবাব নেই।

আমি আবার বললাম, 'আপনার বাড়ি কোথায়?'

তিনি উত্তর দিলেন, 'ভেনাস'।

ভেনাস! বুঝতে পারলাম, তিনি আমার সাথে কথা বলতে চাইছেন না। তাই বিরক্তি নিয়ে বুঝাতে চাইলেন, তিনি ভিন গ্রহের মানুষ!

আমি হাসপাতালে গিয়ে প্রায়ই তার সাথে কথা বলতে চেষ্টা করতাম। তাকে নিয়ে এদিক-সেদিক হুইল চেয়ারে ঘুরতাম। একদিন দেখি তিনি কাঁদছেন। আমাকে দেখে বললেন, 'আমার কিছু দোষ স্বীকার করার আছে।'

খ্রিষ্টান ধর্মের নিয়ম অনুযায়ী ক্যাথলিক ফাদারের সামনে মানুষজন দোষ স্বীকার করে থাকে। কিন্তু আমি তো প্রোটেস্ট্যান্ট, ক্যাথলিক নই।

www.pathagar.com

সে কথা তাকে বলতেই তিনি উত্তর দিলেন, 'আমি তা খুব ভালো করে জানি। কারণ, আমি নিজেই একজন ক্যাথলিক ফাদার।'

'ইয়া খোদা!' আমি মনে মনে ভালোই লজ্জা পেলাম 'ইনি নিজে একজন ক্যাথলিক ফাদার, আর আমি কিনা তাকে বাইবেল বুঝাচ্ছিলাম। এ যেন মায়ের কাছে নানা বাড়ির গল্প।'

'দেখুন, আমি খুব খারাপ সময়ের মধ্য দিয়ে গেছি। তিনি বলতে থাকলেন, 'হার্ট অ্যাটাকসহ জীবনের আরো নানা ঝড়-ঝঞ্ঝার মধ্যে দিয়ে আমাকে যেতে হয়েছে। আমার মনটা ভালো নেই। আমি দুঃখিত আপনার সাথে অসৌজন্যমূলক আচরণ করেছি, খারাপ ব্যবহার করেছি' এ কথা বলে তিনি কাঁদতে থাকলেন।

লোকটার জন্য আমার খুব মায়া হলো। আমি তাকে জড়িয়ে ধরে সান্ত্বনা দিলাম।

দিন কয়েক পরে হাসপাতালে গিয়ে মানুষটাকে আমি আর দেখতে পেলাম না। কী ব্যাপার, গেল কোথায়? আমি হাসপাতালের রিসিপশনে গিয়ে খোঁজ নেয়া শুরু করলাম।

রিসিপশনিস্ট মহিলা আমাকে জানালেন, 'তিনি বাড়ি চলে গেছেন।'

'বাড়ি! তার তো কোনো বাড়ি নেই, নেই কোনো পরিবার।'

মহিলা কিছুটা ঝাঁঝাল কণ্ঠে উত্তর দিল, 'সে কথা আমাকে বলছেন কেন। তিনি কোথায় আছেন- সেটা দেখা নিশ্চয়ই আমাদের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে না।'

'তাহলে তার ফাইলটা আমাকে দাও। সেখানে নিশ্চয় তার ঠিকানা দেয়া থাকবে। ওটা দেখে আমি খুঁজে নিতে পারব তিনি কোথায় গিয়েছেন।'

'যে কাউকে ফাইল দেখানোর নিয়ম নেই।'

আমি মহিলার চোখের দিকে তাকালাম। তারপর কঠিন স্বরে বললাম 'দেখ, এই লোক অসুস্থ! তার যদি কিছু একটা হয়ে যায়, তাহলে আমি কিন্তু তোমার আর তোমাদের এই হাসপাতালের বিরুদ্ধে মামলা করব। তখন কিন্তু তোমরা তার দায় এড়াতে পারবে না।'

মহিলা নিতান্ত অনিচ্ছা সহকারে ফাইলটা আমার দিকে এগিয়ে দিল। ফাইলে দেখলাম, একটা আশ্রয় শিবিরের নাম লেখা। যাদের কোনো ঘর বাড়ি নেই, থাকার নির্দিষ্ট কোনো জায়গা নেই, তারা ওখানে থাকেন।

www.pathagar.com

আমি গিয়ে সেখানেই তাকে পেলাম। তিনি তখনো ক্র্যাচে ভর দিয়ে হাঁটেন। আমাকে দেখে তিনি আবার অঝোরে কাঁদতে শুরু করলেন, 'দয়া করে আমাকে এখান থেকে বের করে নিয়ে যাও। এখানকার পরিবেশ আমার আর সহ্য হচ্ছে না।'

আমি তাকে আমার বাড়িতে নিয়ে এলাম। আমার বাড়িতে তখন দুজন অতিথি। একজন ক্যাথলিক, আরেকজন মুসলিম। আমার চিন্তা ছিল ক্যাথলিক ফাদারকে দাওয়াত দিয়ে প্রোটেস্ট্যান্ট বানানো, আর মুসলিম মুহাম্মাদকে খ্রিষ্টান।

মানুষ কী ভাবে, আর কী হয়!

আমরা রাতে গোল হয়ে বসে ধর্ম নিয়ে আলোচনা করতাম। আমার বাবার বাইবেল ছিল কিংস জেমস[১] সংস্করণ। আপনারা যারা জাকির নায়েক কিংবা আহমেদ দীদাতের লেকচার শুনেছেন, তারা হয়তো এই বাইবেল সম্পর্কে শুনে থাকবেন।

আমার পছন্দ ছিল ১৯৫৩ সালের রিভাইসড স্ট্যান্ডার্ড ভার্সন। আমার বাইবেলের ভূমিকায় আবার বলা ছিল, কিংস জেমস ভার্সনে মারাত্মক ভুল-ত্রুটি আছে। এই দুই বাইবেল নিয়ে আমাদের বাপ-বেটার প্রায়ই তর্ক হতো। আমি বলতাম এটা ঠিক, তিনি বলতেন ওটা।

আমার বউয়ের হাতে ছিল জিমি সোগার্টের বাইবেল। সেটি আবার আমাদের চেয়ে পুরাদস্তুর আলাদা।

ক্যাথলিক ফাদারের বাইবেল ছিল আবার আরেক রকম। তার সাথে আমাদের অনেক কিছুই মিলে না। আমাদের বাইবেলে অধ্যায় ৬৬, আর তার বাইবেলে ৭৩। খাবার টেবিলে এই নিয়ে ভালোই একটা গোল বাঁধত। আমি একটা বলছি, তো বাবা বলছে আরেকটা। আমার বউ বলে অন্যটা, আর ক্যাথলিক ফাদার পুরোপুরি ভিন্ন কিছু। কারও সাথেই কারও অধ্যায়, লাইন, বাক্য...কিছুই মিলে না।

আমাদের এই তর্ক-বিতর্কের মাঝে মুসলিম মুহাম্মাদ চুপচাপ শান্ত হয়ে বসে থাকতেন। একদিন আমিই তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'হে মুহাম্মাদ! তোমাদের কুরআনের সংস্করণ কয়টা?'

তিনি জবাব দিলেন, 'কুরআনের ভিন্নভিন্ন কোনো সংস্করণ নেই। এর একটাই সংস্করণ, যা তার আদি আরবি ভাষাতেই সংরক্ষিত আছে। এটি সেই কিতাব যার মধ্যে কোনো সন্দেহ-সংশয় নেই, যা মুত্তাকীদের জন্য পথ প্রদর্শক।'

www.pathagar.com

আমি তো অবাক! বেটা বলে কী? কুরআন নাকি এখনো তার আদি ও আসল ভাষাতে সংরক্ষিত আছে। আমার মনে হচ্ছিল, বেটা নিশ্চিতভাবেই গুল মারছে, না হয় মিথ্যা বলছে।

আমি আরবি জানতাম না। তাই পরীক্ষা করে দেখতেও পারছিলাম না, আসলেই তার দাবি সঠিক কিনা। তিনিও আর যুক্তি-তর্ক দিয়ে তা প্রমাণ করতে যাননি।

শুধু আমার চিন্তার সাগরে একটু ঢেউ তুলে গেলেন মাত্র।

তিন

আমাদের বাইবেলের মধ্যে এত বৈপরীত্য, এত সংস্করণ, অথচ কুরআনের কোনো সংস্করণ নেই। সত্যি কথা বলতে আমার এতদিনের বিশ্বাসের মূলে বড় ধরনের ঝাঁকুনি লাগল। প্রথমবারের মতো আমি আমার বিশ্বাস নিয়ে ভাবা শুরু করলাম।

খ্রিষ্টান ত্রিত্ববাদ নিয়ে আপনাদের ধারণা আছে তো? তাহলে একটু বলে নেই। খ্রিষ্টানরা বিশ্বাস করে স্রষ্টা এক, তবে তার তিনটি রূপ। পিতা, পুত্র আর পবিত্র আত্মা। পিতা বলতে মূলত স্বর্গে থাকা ঈশ্বরকেই বুঝায়। পুত্র হলেন যিশু। আর পবিত্র আত্মা হলো পৃথিবীর সব কার্যকারণের পেছনের ঈশ্বরের নির্দেশনা। এই তিন মিলেই ঈশ্বর। তারা আলাদা আলাদা সত্ত্বা, কিন্তু সবাই মিলে এক।

এত দিন আমি খুব সরল মনেই এই ত্রিত্ববাদের ধারণা বিশ্বাস করে এসেছিলাম। এখন আমার মধ্যে এ নিয়ে নানা প্রশ্নের উদয় হলো। ওই যে ক্রুশ হাতে নেয়া খ্রিষ্টান পাদ্রীর কথা বলেছিলাম, বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করতে আমি তার কাছে গেলাম।

তাকে গিয়ে বললাম, 'আমি এই ত্রিত্ববাদের ধারণাটা আরও ভালো করে বুঝতে চাই।'

তিনি অবাক হলেন, 'তুমি তো তা খুব ভালো করেই জানো।'

'হ্যাঁ, এই মতবাদের ইতিহাস ও ব্যাখ্যা জানি। কিন্তু আসলে আমি বলতে চাইছি, সহজ ভাষায় মানুষকে কী করে বুঝাতে পারি, ঈশ্বরের তিন অংশ, তিনটাই স্বতন্ত্র, কিন্তু তিনে মিলে তিন নয় বরং একই ঈশ্বর।'

'আচ্ছা ঠিক আছে, আমি তোমাকে বুঝাচ্ছি' তিনি বলা শুরু করলেন 'ধরে নাও, এটা একটা আপেলের মতো। আপেলের মধ্যে কী দেখতে পাও? আপেলের বাইরে লাল রঙয়ের চামড়া, ভেতরে সাদা অংশ। তারও ভেতরে থাকে আপেলের দানা। এই তিন মিলেই পুরো একটা আপেল। ক্লিয়ার?'

www.pathagar.com

বাড়ি ফেরার পথে আমি এই যুক্তি নিয়ে ভাবছিলাম। ভাবছিলাম, আমি মুসলিম মুহাম্মাদকে কী করে এই ব্যাখ্যা দিব। মনে মনে তার সাথে আমার আলাপচারিতা কল্পনা করছিলাম। হঠাৎ মনে হলো, এই ব্যাখ্যা তিনি কোনোভাবেই মেনে নিবেন না। তিনি হয়তো বলবেন, আপেলের ভেতরে দানা তো একাধিক থাকে, তবে কি ঈশ্বরও অনেক বেশি হয়ে যাচ্ছে না?

আমি আবার সেই পাদ্রীর কাছে ফিরে এলাম, 'আপেলের ভেতরে যদি অনেকগুলো দানা থাকে, তাহলে তিনে মিলে এক এটা বুঝাব কী করে?'

তিনি বললেন, 'আচ্ছা ঠিক আছে। আপেলের উদাহরণ ভুলে যাও। মনে কর একটা ডিম। তার বাইরে খোসা থাকে। ভেতরে সাদা অংশ। আর তার মধ্যে হলুদ কুসুম। এই তিনে মিলে হয় একটা ডিম। এবার ঠিক আছে?'

আমি আবার ভাবতে ভাবতে বাড়ি ফিরছিলাম। হঠাৎ মনে হলো, আচ্ছা ডিমের ভেতরে তো মাঝে মাঝে দুইটা কুসুম থাকে। তাহলে তো ঈশ্বর চারজন হয়ে যাচ্ছে। নাহ, এই উদাহরণটাও ঠিক যুতসই হলো না।

মুহাম্মাদ বলেছে, তার ধর্মে ঈশ্বর একজনই। আর আমাদের ধর্মে তিনজন মিলে একজন; যুক্তির দিক দিয়ে আমাদেরটা ঠিক বুঝে আসছিল না।

দিন কয়েক পরে বাজারে এক পরিচিত ধর্ম প্রচারকের সাথে দেখা হলো। তাকে বললাম, 'দেখ! এই ত্রিত্ববাদের ধারণাটা ঠিক আমার মাথায় ঢুকছে না।'

'কী! তুমি একজন ধর্মযাজক, আর তুমিই কিনা ত্রিত্ববাদ বুঝতে পারছো না!' তিনি বলতে গেলে প্রায় আঁতকে উঠলেন।

'হ্যাঁ, সত্যি বলতে আসলেই তা আমার কাছে অযৌক্তিক ঠেকছে। তিনজন মিলে একজন হয় কী করে?'

'আচ্ছা ঠিক আছে। অন্যভাবে বুঝার চেষ্টা কর। ধর, আমি একজন। আমার আছে স্ত্রী আর পুত্র। এই তিনজন মিলে হয় একটি পরিবার। ঈশ্বরও অনেকটা তেমনই'।

'কিন্তু যদি আরেকটা সন্তান হয়, তাহলে তো চারজন হয়ে গেল। কিংবা ধরো, স্বামী-স্ত্রীর যদি ডিভোর্স হয়ে যায়, তাহলে তো পরিবার আর থাকল না। দুই জন ঈশ্বরের মধ্যে তালাক হয়ে যাওয়া, এটা কি ভালো শোনায়?'

না, কোনো উত্তরই যুতসই মনে হচ্ছে না। আমি গেলাম মুহাম্মাদের কাছে। জিজ্ঞাসা করলাম, 'আচ্ছা! তোমাদের কাছে ঈশ্বরের রূপ কিংবা পরিচয় কী?'

www.pathagar.com

ভাবুন তো, তিনি কী উত্তর দিয়েছিলেন? তিনি কুরআনের সূরা ইখলাস পাঠ করে গেলেন, 'বলো, আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয়। তিনি কারও মুখাপেক্ষী নন। তিনি কাউকে জন্ম দেননি, তিনি কারও ঔরসে জন্মাননি। কোনো একটা জিনিসও তার সাথে তুলনীয় নয়।'

'আহ, কী সুন্দর আর সহজ-সরল বক্তব্য। আমার বিবেক-বুদ্ধি-মনও এমনটাই সমর্থন করে'– আমি মনে মনে ভাবছিলাম। যদিও সবার সামনে তা স্বীকার করতে পারিনি।

আপনাদের কিছু মজার কথা বলি। গোটা বাইবেলে ত্রিত্ববাদ (Trinity) শব্দটাই নেই, অথচ কুরআনে আছে। আল্লাহ কুরআনে সূরা নিসার ১৭১ নং আয়াতে বলেছেন, 'তোমরা বলো না আল্লাহ তিনজন'। বাইবেল শব্দটাও বাইবেলে নেই। গ্রিক শব্দ বাইবেলের মানে হলো বই। অথচ শব্দটার অস্তিত্ব কুরআনে খুঁজে পাওয়া যায়; যেমন আহলে কিতাব।

আমি কুরআনে এরকম আরও অনেক কিছুই খুঁজে পাই, যা যুক্তি ও বুদ্ধির দিক দিয়ে সহজ এবং গ্রহণযোগ্য। এমন অনেক কিছু আছে, যার সুন্দর ব্যাখ্যা বাইবেলে নেই, কিন্তু কুরআনে আছে। যদিও মুখে আমি কখনোই স্বীকার করিনি।

একদিন আমার বাসায় থাকা সেই ক্যাথলিক ফাদার মুসলিম মুহাম্মাদের সাথে তাদের মসজিদে গেলেন। ফিরে আসার পরে আমরা তাকে ঘিরে ধরলাম, 'বলুন তো দেখি, সেখানে আপনি কী দেখলেন? মুসলমানেরা মসজিদে কী করে? পশু জবাই দেয়? আনন্দ ফুর্তি করে?'

'না! তারা শুধু কেবলামুখি হয়ে দাঁড়িয়ে নামায পড়ে। নামায শেষ হলে সবাই মসজিদ ছেড়ে বেরিয়ে যায়।'

'কী! খালি নামায পড়ে আর কিচ্ছু হয় না? আচ্ছা বলুন দেখি, সেখানে কী বাদ্য বাজানো হয়?'

'সেখানে কোনো বাদ্য বাজানো হয় না।'

এই লোক বলে কী! গান বাদ্য ছাড়া আবার ঈশ্বরের উপাসনা হয় নাকি? আমরা খ্রিষ্টানরা চার্চে গান বাদ্য ছাড়া স্রষ্টার উপাসনা চিন্তাই করতে পারি না।

আমি এবার মুহাম্মাদের দিকে ফিরলাম, 'তোমরা মসজিদে বাদ্য বাজাও না?'

তিনি উত্তর দিলেন, 'না'।

www.pathagar.com

'সারা পৃথিবীতে তোমাদের কতগুলো মসজিদ আছে?'

'লক্ষ লক্ষ'।

আমার মাথায় দারুণ এক বুদ্ধি এল। আমার নিজের বাদ্যযন্ত্র, পিয়ানো ইত্যাদির ব্যবসা আছে। আমি যদি এই সব মসজিদে পিয়ানো আর বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র সরবরাহ করতে পারি, তবে তো অল্প দিনেই বিরাট কোটিপতি হয়ে যেতে পারি।

যাকগে, কয়েক মাস পরের কথা। সেটা ছিল ১৯৯১ সালের জুলাইয়ের একদিন। সেই ক্যাথলিক ফাদার মুসলিম মুহাম্মাদের সাথে সেদিনও মসজিদে গিয়েছেন। অনেকক্ষণ হয়ে গেল তাদের আর ফেরার নাম নেই। কী ব্যাপার, দুজনে গেল কই? নির্দিষ্ট সময়ের আরও অনেক পরে দেখি মুহাম্মাদ ফিরে এসেছে।

মুহাম্মাদ তো এল, কিন্তু সাথের এই লোকটা কে? আরে...একি! এ আমি কী দেখছি? বিরাট সাদা জুব্বায় আবৃত লোকটা...

'পিট! তুমি... তুমি...' বিস্ময়ের ধাক্কা আমি কোনোভাবেই সামলে উঠতে পারছিলাম না। 'তুমি মুসলমান হয়েছ?'

ক্যাথলিক সেই ফাদারের নাম ছিল পিটার জ্যাকবস। তিনি দৃপ্ত কণ্ঠে উচ্চারণ করলেন, 'আশহাদু আন লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ, ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ।'

সবকিছু কেমন এলোমেলো লাগছিল। আমি নিজে মনের অজান্তে কুরআনের ব্যাখ্যা মানুষের সামনে তুলে ধরছি। এখানে এক ক্যাথলিক ফাদার মুসলিম হয়ে বসে আছেন। এদিকে আমার বাবাও দেখি ক্যাথলিক ফাদারের মুসলিম হবার খবর বেশ ভালোভাবেই নিয়েছেন।

আসলে সব হচ্ছেটা কী? আমারই বা কী করা উচিত এখন। ভাবলাম, আমার বউয়ের সাথে এ নিয়ে কথা বলা দরকার।

'ওগো শুনেছ! ক্যাথলিক ফাদার পিটার মুসলিম হয়ে গেছে। কুরআন হাদিসের বাণী নাকি তার কাছে সঠিক আর যৌক্তিক ঠেকছে' আমি বউকে গিয়ে বললাম।

'শুনলাম। এবার আমার কথা শোনো'। বউয়ের পরের কথা শুনে আমার মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল। 'আমি তোমার কাছে ডিভোর্স চাই'।

বলতে এলাম কী, আর এ আমি কী শুনছি!

www.pathagar.com

চার

'আরে আরে, উল্টাপাল্টা কী বলছ এসব! তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি? তোমার কি ধারণা আমি ইসলামের গুণগান করতে এসেছি? নাকি ভেবেছ, আমি মুসলমান হয়ে যাব? আমি হব মুসলমান! ইয়াক! এ তুমি ভাবলে কী করে?'

সে বলল, 'আমি ডিভোর্স চাইছি, কারণ কোনো মুসলিম একজন খ্রিষ্টানের সাথে বিয়ে বন্ধনে আবদ্ধ থাকতে পারে না।'

'আরে...আস্তে...আস্তে...বললাম তো...আচ্ছা, আমি খোদার নামে কসম করে বলছি, আমি জীবনেও মুসলিম হব না। তাহলে এই খ্রিষ্টান মুসলমানের বিয়ে হবার কথা আসছে কোথা থেকে? আর আমি যদি মুসলিম হতামও আমি যতদূর জানি, একজন মুসলিম পুরুষ একজন খ্রিষ্টান নারীকে বিয়ে করতে পারে। তাহলে সমস্যাটা কোথায়?'

'এখানেই তো সমস্যা। একজন মুসলিম নারী ভিন্ন-ধর্মী পুরুষকে বিয়ে করতে পারে না'। সে খুব শান্ত স্বরে উত্তর দিল, 'আমি মুসলিম হবার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।'

আমার আজও মনে আছে, আমি খাটের কিনারে বসে কথা বলছিলাম। তার উত্তর শুনে খাট থেকে পড়েই গিয়েছিলাম প্রায়।

আমার মনে হলো আর ভয়ের কিছু নেই, নেই লুকোচুরির কিছু। আমার অন্তর বোধহয় এর জন্য অনেক আগ থেকেই প্রস্তুত হয়ে ছিল। হয়তো নিজের কাছে নিজে স্বীকার করে নিতে সাহস হচ্ছিল না। আমি উৎফুল্ল হবার ভঙ্গি করে বললাম, 'তাহলে আমিও তোমাকে সুংসবাদ দিই। আমি নিজেও মুসলিম হয়ে যাবার চিন্তা করছি'।

'আমি তোমার কথা মোটেও বিশ্বাস করি না।'

'হ্যাঁ! সত্যি বলছি। আমি নিজেও এ নিয়ে ভাবছিলাম। যাক ভালোই হলো, দুজন একইসাথে মুসলিম হওয়া যাবে। এখন স্বামী-স্ত্রী দুজনই তো মুসলিম। তাহলে তো আর কোনো সমস্যা থাকল না, ডিভোর্সেরও দরকার হচ্ছে না। কী বল?'

'তুমিই তো সেই লোক যে কিছুক্ষণ আগে কসম কেটে বলছিলে, জীবনেও মুসলিম হবে না। আবার এখন আমার সাথে তাল মিলিয়ে বলছ, তুমিও মুসলিম হবে। তোমার কোন কথাটা সত্যি? হয় তুমি এখন মিথ্যা বলছ, নয় আমাকে খুশি রাখতে একটু আগে মিথ্যা বলেছ। ঘুরেফিরে তুমি একটা মিথ্যাবাদী। আর আমি কোনো মিথ্যাবাদীর সাথে ঘর করতে চাই না।'

www.pathagar.com

আমি টলতে টলতে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে এলাম। আমি মুহাম্মাদকে ডাক দিলাম। বাইরে টেক্সাসের সুন্দর রাত। নির্মল প্রাকৃতিক পরিবেশে হাঁটতে হাঁটতে আমরা ইসলাম নিয়ে কথা বলছিলাম। আমি মুহাম্মাদের কাছ থেকে ইসলামের বিশ্বাস, নানা বিধি-বিধান জেনে নিচ্ছিলাম। এবারে আর কোনো বিতর্কের উদ্দেশ্য নয়, সত্যিই মন থেকে বোঝার জন্য।

আমার মনে আছে, কথা বলতে বলতে প্রায় ভোর হয়ে এসেছিল। আমি তখন মনে মনে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছি। যদিও এ ছিল জীবনের সবচেয়ে বড় ও কঠিন সিদ্ধান্ত। মুহাম্মাদকে এ কথা বলতেই সে বলল, 'দেখ! এ তোমার নিজের সিদ্ধান্ত। ভালোমতো ভেবে দেখ তুমি কী করবে। তুমি কী সিদ্ধান্ত নিবে, এ ব্যাপারে আমার কিছু বলারও নেই, করারও নেই।'

ফজরের সময় মুহাম্মাদকে দেখলাম, কিবলামুখি হয়ে নামায পড়তে। কী চমৎকার সে দৃশ্য! কী বিনয়ী, শান্ত সমুজ্জ্বল তার মুখ। মহান রাব্বুল আলামীনের সামনে মাথা নিঁচু করে নিজেকে সমর্পিত করার সে দৃশ্য আমাকে বিমোহিত করে দিল।

আমি সবার আড়ালে, যেন কেউ আমাকে দেখতে না পায়, এমন করে মহান প্রভুর উদ্দেশ্যে ঠিক তেমনি মাটিতে নিজের মাথা ছোঁয়ালাম। আমার মন আবেগে আপ্লুত হয়ে উঠেছিল। আমি কেবল একটি কথাই বলতে পেরেছিলাম, 'হে আল্লাহ! আমাকে পথ দেখাও। হে রব, আমাকে সঠিক পথ পেতে সাহায্য কর।'

খানিকক্ষণ পরে আমি মাথা তুললাম। না, রূপকথার গল্পের মতো কোনো অদ্ভুত কিছু ঘটেনি। এমন নয় যে, আকাশে হঠাৎ রংধনু উঠে হাসছে, কিংবা পরীরা গানের তালে তালে আমার চারিদিকে নাচছে। টেক্সাসের সেই দিনটাও ছিল, অন্য দশটা সাধারণ দিনের মতোই কোলাহল মুখর। কিন্তু আমার ভেতরে...

আমি বুঝতে পারছিলাম, আমার ভেতরটা আর আগের মতো নেই। কী যেন এক বিরাট পরিবর্তন ঘটে গেছে। আমি আমার স্ত্রীর সাথে কথা বললাম, কথা বললাম বাবার সাথে। তারপর গোসল করে ঠিক দশটার সময় আমি মুহাম্মাদ আর ইয়াহিয়ার (প্রাক্তন ক্যাথলিক ফাদার পিটার জ্যাকবস) সামনে দাঁড়িয়ে সাক্ষ্য দিলাম, 'আশহাদু আন-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ।

ঠিক তার কিছুক্ষণ পরে আমার স্ত্রীও তার শাহাদাহ উচ্চারণ করল। বাবাও মাসখানেক পরে মুসলিম হয়ে গেলেন।

www.pathagar.com

এভাবেই দিনে দিনে আরও অসংখ্য মুসলিম ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় নিচ্ছেন। আমার মনে হচ্ছিল, সারাবিশ্বের মানুষদেরকে আমাদের জানানো দরকার, কী চমৎকার এই ধর্ম, কী চমৎকার এর বিধি-বিধান।

তাই এটা আমাদের সবার দায়িত্ব, অন্যকে ইসলামের পথে আহবান করা। যার যার নিজের ভাষায়, নিজের মতো করে ইসলামের শিক্ষা আশেপাশের মানুষদের জানানো, মানতে উদ্বুদ্ধ করা ও বোঝানো। আল্লাহ আপনাদেরকে জিজ্ঞাসা করবেন না, তোমার ডাকে কারা শাহাদাহ উচ্চারণ করে মুসলিম হয়েছে, কারা হয়নি। আল্লাহ জিজ্ঞাসা করবেন, আপনাদের দায়িত্ব আপনারা ঠিকভাবে পালন করেছেন কিনা।

আল্লাহর রহমতে হাজার হাজার মানুষকে আমি ইসলামের দাওয়াত দিতে পেরেছি। শত শত মানুষ শাহাদাহ উচ্চারণ করেছেন। আমি কারও সাথে বিতর্কে জড়াইনি। অন্যকে বিতর্কে পরাভূত করে আপনি মানুষের মন জিততে পারবেন না। আমি একজন মুসলিম, সাবেক খ্রিষ্টান। আমি দুদিকের যুক্তি তর্কই খুব ভালো করে জানি।

১৯৯৯ সালে ভার্জিনিয়ার বাইরে মেরিল্যান্ডে এক চার্চে আমাকে লেকচার দেয়ার আমন্ত্রণ করা হয়েছিল। আমি খুব ভালো করেই জানি, রোববারে চার্চে কী ধরনের কথা বলা হয় আর মানুষ কী শুনতে আসে। আমি সেভাবেই শুরু করেছিলাম। আমার বক্তৃতা শেষ হয়েছিল এই কথার মাধ্যমে 'আল্লাহ এক, তার কোনো শরীক নেই'। কথাটা যুক্তিসঙ্গত ভেবে, উপস্থিত প্রায় সবাই আমার সাথে একমত হয়েছিলেন।

এমনকি দুজন মানুষও সেদিন ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। ভাবতে পারেন, চার্চের ভেতরে মানুষ ইসলাম কবুল করেছে, তাও আবার তাদের পাদ্রীর সামনে! তাদের একজন ছিলেন, ওই পাদ্রীরই মেয়ে। সেদিন বিকেলে নওমুসলিম দুজনকে আমি আমার সাথে করে মসজিদে নিয়ে গিয়েছিলাম। তারা সবার সামনে আবারও ইসলাম কবুলের সাক্ষ্য দেয়। পরে দুজন একে অন্যকে বিয়ে করে স্বামী-স্ত্রী হয়ে যায়।

আচ্ছা, আপনাদের কী মনে হয়? কোনো এক চার্চের মধ্যে ইসলামের দাওয়াত দেয়ায় দুজন ইসলাম গ্রহণ করেছে তাও আবার তাদের পাদ্রীর উপস্থিতিতে। এমন পরিস্থিতিতে তারা কী আবার আমাকে সে চার্চে আমন্ত্রণ জানাতে পারে? উত্তরটা হলো, মাস তিনেক পরে সে পাদ্রী আমাকে আবার সে চার্চে ডেকে নেয়।

আমি জানতে চাই, 'আপনার মেয়ের কী খবর?'

তিনি উত্তর দিলেন 'সে ভালোই আছে। এখন সে আগের চেয়ে আরও বেশি দায়িত্বশীল মানুষ। নিয়মিত আমাদের খোঁজ-খবর নেয়। আপনার সাথে কথা বলে ভালো লেগেছে। আশা করি আপনি আমাদের চার্চে এসে আগের মতোই লেকচার দিবেন।'

www.pathagar.com

ভেবে দেখুন, আমি যদি সেদিন চার্চে গিয়ে গির্জার ফাদারের সাথে বিতর্কে লিপ্ত হতাম, সবার সামনে তাকে যুক্তি-তর্ক দিয়ে নাস্তানাবুদ করে দিতাম, তবে কি তার সাথে আমার এই আন্তরিকতার সম্পর্ক হতো? পুনরায় তিনি কি আমাকে আমন্ত্রণ জানাতেন?

মূলত আমরা কাউকে হিদায়াত দিতে পারি না। হিদায়েতের মালিক আল্লাহ তায়ালা। আমাদের দায়িত্ব অন্যের কাছে ইসলামের দাওয়াত সুন্দরভাবে তুলে ধরা। গ্রহণ করা, না করা, সেটা তাদের বিষয়।

দোয়া করি, আল্লাহ যেন আপনাকে, আমাকে, আমাদের সকলকে হিদায়েতের পথে রাখেন।

জাযাকুমুল্লাহ খাইর। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

পরিচিতি

আমেরিকার টেক্সাসে জন্ম নেয়া ইউসুফ এস্টেস ছিলেন প্রাক্তন খ্রিষ্টান ধর্মযাজক। একজন মিসরীয় মুসলিমের সংস্পর্শে এসে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। ইসলাম গ্রহণের পর তিনি দেশ-বিদেশের বিভিন্ন সেমিনারে আলোচনায় ইসলামের উপর আলোচনা করে আসছেন। ধর্মীয় নেতাদের নিয়ে ২০০০ সালে জাতিসংঘের বিশ্ব শান্তি কনফারেন্সের তিনি ছিলেন একজন গর্বিত সদস্য।

ইউসুফ এস্টেস কথা বলেন খুব হাস্যোজ্জ্বল ও প্রাণবন্ত ভঙ্গিমায়। তিনি Guide US টিভি নামে একটি দাওয়াহ চ্যানেলের প্রতিষ্ঠাতা। ২০১২ সালে তার দাওয়াহ কার্যক্রমের জন্য দুবাই আন্তর্জাতিক পবিত্র কুরআন পুরস্কার অনুষ্ঠানে তাকে বছরের সেরা ইসলামিক ব্যক্তিত্ব হিসেবে সম্মানিত করা হয়।

এই কাহিনিটি ভারতে দেয়া তার এক লেকচারের রূপান্তর।

পাদটিকা

বাইবেলের ভার্সন : খ্রিষ্ট ধর্মালম্বীদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ বাইবেল। বাইবেল শব্দের মূল অর্থ বই। মূলত বাইবেল যিশুখ্রিষ্টের আগে পরের বিভিন্ন বই/অধ্যায়ের সংকলন। যিশুর আগমনের পূর্বের বই/অধ্যায়গুলোকে বলা হয় ওল্ড টেস্টামেন্ট আর পরের গুলোর নাম নিউ টেস্টামেন্ট।

যিশুর জন্ম হয়েছিল আজকের ফিলিস্তিনের বেথেলহেমে। মূলত তিনি প্রেরিত হয়েছিলেন ইহুদিদের কাছে। তার সময়ে মাতৃভাষা ছিল সুরিয়ানি (Arameich)। যেহেতু সে সময়ের বেথেলহেম ছিল গ্রিক শাসকদের অধীন, তাই রাষ্ট্র ভাষা ছিল গ্রিক।

www.pathagar.com

আজকের বাইবেল লেখা শুরু হয়, যিশুর তিরোধানের অন্তত একশত বছর পর থেকে। সময়ে সময়ে বিভিন্ন লেখক বাইবেলের অধ্যায়গুলো লিখেন। পরে খ্রিষ্টান ধর্মীয় পন্ডিতেরা আলোচনা করে ঠিক করেন, বাইবেলে কোন অধ্যায়গুলো রাখা হবে আর কোনটি বাদ দেয়া হবে।

গ্রিক বাইবেল থেকে পরবর্তী কালে বাইবেলের ইংরেজি অনুবাদ হয়। ইংল্যান্ডের চার্চগুলোতে দাপ্তরিক সংস্করণ হিসেবে রাজা কিং জেমসের সময়ে বাইবেলের একটা ইংরেজি অনুবাদ করা হয় ১৬১১ সালে। এই বাইবেল বিশ্বব্যাপী ইংরেজীভাষী লোকদের কাছে ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয় এবং গ্রহণযোগ্যতা পায়। বাইবেলের এই অনুবাদ King James Version কিংবা Authorised Version (AV) নামে পরিচিত।

পরবর্তী সময়ে যুগোপযোগী অনুবাদ ও বেশ কিছু ভুল-ভ্রান্তি দূর করার লক্ষ্যে আরও অনেকগুলো অনুবাদ হয় বাইবেলের। তন্মধ্যে Revised Standard Version (RSV) অন্যতম। এই সংস্করণটি করা হয় তৎকালীন সময়ের বেশ কিছু বিশ্ব বিখ্যাত ধর্মীয় পন্ডিতদের তত্ত্বাবধানে। তারা এই বাইবেলের ভূমিকায় বলেছিলেন, আগের King James Version (authorised version) এ বেশ কিছু মারাত্মক ধরনের ভুল-ভ্রান্তি আছে। এমন অনেক সংযোজন-বিয়োজন ঘটেছে, যা মূল গ্রিক বাইবেলে নেই।

আপাতত অনুবাদ মনে হলেও এগুলো শুধুই অনুবাদ ছিল না। ছিল সংস্করণ। এ জন্য দেখা যায় একটির সাথে অন্যটির অধ্যায়, লাইন ইত্যাদির বেশ কিছু অসঙ্গতি রয়েছে, রয়েছে অমিল। এ নিয়ে খ্রিষ্টীয় ধর্মবেত্তাদের মধ্যে আজও মতপার্থক্য রয়ে গেছে।

www.pathagar.com

আসুন, বলি 'আলহামদুলিল্লাহ'

লরেন বুথ

এক

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম।

আমার নাম লরেন বুথ। পেশায় ব্রিটিশ সাংবাদিক। আমি একজন ধর্মান্তরিত মুসলিম। আজ আমি শোনাব, কী করে হিজাব পরিহিত অবস্থায় একজন মুসলিম হিসেবে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি।

২০১০ সালে আমি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করি। তার আগে একটি পত্রিকায় সাংবাদিকতা করতাম। তখন মিডিয়া ছিল ইসলাম সম্পর্কে নানা নেতিবাচক খবরে ভরপুর। আমরা জানতাম, 'ইসলাম হলো সন্ত্রাসীদের ধর্ম' 'ইসলামে নারীরা চরমভাবে নির্যাতিত, অবেহেলিত' 'মুসলিম পুরুষরা প্রায়ই নারীদের নির্যাতন করে'- ইত্যাদি।

ছোটবেলায় ফিরে যাই। মনে আছে, সাত বছর বয়সে আমি নিয়মিত ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতাম। রাতে ঘুমানোর আগে দোয়া করতাম। আমার জন্ম একটি খ্রিষ্টান পরিবারে হলেও কখনোই ঈশ্বরকে বাদ দিয়ে যিশু কিংবা মাতা মেরীর কাছে কিছু চাইনি। 'ত্রিত্ববাদ' তথা তিন খোদার ধারণাটা আমার কিছুতেই বুঝে আসত না। আমি যা চাইতাম, সরাসরি সর্বশক্তিমান এক স্রষ্টার কাছেই চাইতাম।

কিন্তু বড় হতে হতে আমার সেই মনোভাব ধরে রাখতে পারিনি। আজকের এই আধুনিক যুগে স্রষ্টার উপর বিশ্বাস ও ধার্মিকতা ধরে রাখা আসলেই কঠিন। সব দেশের ক্ষেত্রেই কথাটা কমবেশি প্রযোজ্য।

হাল আমলের পরিবেশ ও সমাজ আমাদেরকে আল্লাহ থেকে অনেক দূরে সরিয়ে নেয়। মানুষকে ভুলিয়ে দেয়– একজন অদৃশ্য সৃষ্টিকর্তা আছেন, মৃত্যুর পরে তার কাছেই ফিরে যেতে হবে।

www.pathagar.com

আর ভুলে যাবেই না কেন? আজকের দিনে আমরা সবাই নিজের সাজসজ্জা, পোশাক-পরিচ্ছদ, কেনাকাটা ইত্যাদি নিয়ে ব্যস্ত। আমাদের যত চেষ্টা-সাধনা, জল্পনা-কল্পনা-আলোচনা; সব এসব ঘিরেই। এসবের মধ্যে ডুবে গিয়ে স্রষ্টার সান্নিধ্য কি আর পাওয়া সম্ভব? নাকি মন অত গভীরে গিয়ে ভাবে?

বয়স ১৬-১৭ হতে হতে আমি আল্লাহকে ডাকা প্রায় ছেড়ে দেই। সবাই আমার রূপ-গুণের খুব প্রশংসা করত। এই বয়সে রূপের সাথে মেধা থাকলে স্বাভাবিকভাবেই মনে অহংকারবোধ কাজ করে। নিজের সামনে গোটা পৃথিবীকে মনে হয় তুচ্ছ। বলতে লজ্জা লাগছে, আমার নিজের অনুভূতিও ছিল ঠিক তেমনই।

এক বিকেলে বসে বসে টিভি দেখছিলাম। ২০০০ সালের কোন একসময়ের ঘটনা হবে। খবরের একটি দৃশ্য আমাকে দারুণভাবে নাড়া দিল। একটি বছর চৌদ্দ-পনেরো বয়সের ছেলে এক টুকরো পাথর হাতে শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে। তার সামনে ইজরাইলি সৈন্যদের বিশাল এক ট্যাংক। ট্যাংকের নল ঠিক তার বুকের দিকে তাক করা। ছেলেটির চোখেমুখে ভয়ের কোনো চিহ্ন নেই। বরং প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাস, সাহস আর তীব্র ক্ষোভ তার সারা শরীর থেকে যেন ঠিকরে বেরুচ্ছিল।

তার নাম ছিল ফারেস উদে। খবরে বলছিল, ছেলেটি ফিলিস্তিনের গাজার এক স্কুল বালক। ফিলিস্তিন নামটা আগে শুনলেও গাজা শব্দটা ছিল আমার কাছে একেবারেই অপরিচিত।

দশ দিন পরে ছেলেটির ছবি আবার আমার টিভির পর্দায় ভেসে উঠল। জীবিত নয়, প্রাণহীন নিস্পন্দ। ইজরাইলি সৈন্যদের গুলিতে তার কচি শরীর এফোঁড়-ওফোঁড় হয়ে গেছে।

প্রথমবারের মতো মনে হলো, এই পৃথিবী, এই জীবনকে আমি যেভাবে দেখছি, আমি যেভাবে ভাবছি, আসলে ঠিক তেমন নয়। আমার মনে হচ্ছিল, ফিলিস্তিনিদের উপর অবিচার করা হচ্ছে। ভাবলাম, বিষয়টা আরেকটু গভীরভাবে তলিয়ে দেখা দরকার।

২০০৪ সালে আমি 'সানডে নিউজ' পত্রিকাতে কাজ করতাম। পত্রিকাটা কোনোদিক দিয়েই ইসলাম ও মুসলমানদের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিল না। হঠাৎ করে কী মনে করে জানি না, সে বছরের ডিসেম্বরে আমার সম্পাদকের রুমে গেলাম। বললাম, 'আমি ফিলিস্তিনের নির্বাচন সরেজমিনে কাভার করতে চাই'।

আমাকে অবাক করে দিয়ে সম্পাদক একটা চেক লিখে দিলেন, 'এই নাও তোমার খরচের টাকা। তুমি ফিলিস্তিন যাও। দুসপ্তাহ পর আমাদের জন্য চমৎকার কিছু নিউজ তৈরি করে আনবে।'

www.pathagar.com

পরের বছর জানুয়ারিতে ফিলিস্তিন এসে হাজির হলাম। আমি এখানকার কাউকেই চিনি না, রাস্তাঘাটও অপরিচিত। সম্বল বলতে তিনজন অপরিচিত লোকের ফোন নাম্বার।

সারা জীবন শুনে এসেছি মুসলমানরা সন্ত্রাসী। বিশেষ করে ফিলিস্তিনি মুসলমানদের কুখ্যাতি তো আরও বেশি। ফিলিস্তিনে এসে নিজের জীবন ও নিরাপত্তা নিয়ে তাই আমার মনে কিছুটা ভয় কাজ করছিল।

তেলআবিব এয়ারপোর্টে নেমে আমি একটা ট্যাক্সি ডাকলাম। ড্রাইভারের নাম জামাল। সে আমাকে বলল, 'আপনি আমাকে জিমি বলে ডাকতে পারেন।'

জিমি জামাল আমাকে তেলআবিব থেকে রামাল্লার দিকে নিয়ে চলল। যেতে যেতে শোনাল, ফিলিস্তিনিদের ওপর চলা ইজরাইলি বাহিনির ৬৩ বছরের অত্যাচার, নির্যাতন আর নিষ্ঠুরতার করুণ কাহিনি।

আমাদের রাস্তা ছিল পাথুরে পাহাড়ী উপত্যকা বেয়ে। জামালকে জিজ্ঞেস করলাম, 'অত সুন্দর সহজ সোজা রাস্তা ছেড়ে তুমি আমাকে এই পাথুরে রাস্তায় নিয়ে এলে কেন?'

জামাল বলল, 'ম্যাডাম! আমরা সাধারণ ফিলিস্তিনি। ওই রাস্তা ইহুদিদের। ওই রাস্তায় আমাদের ঢোকা নিষেধ। দেখা মাত্র কোনো প্রশ্ন ছাড়াই পাঁচ মিনিটের মধ্যে গুলি করে মেরে ফেলবে। তবে আপনি চাইলে যেতে পারি। কি বলেন, যাব?'

আমি মাথা নাড়লাম, 'না'।

এটা ছিল ফিলিস্তিনের রাস্তায় ফিলিস্তিনি মানুষের সংস্পর্শে আমার প্রথম দিন। জামালের কথা শুনতে শুনতে মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল। আমি স্তব্ধ হয়ে গাড়ির ভেতরে বসে রইলাম। ফিলিস্তিনে এসে অনুভব করতে পারছিলাম, তাদের প্রতি অন্যায় জুলুমের ভয়াবহতা কী, আর তার স্বরূপটাই বা কেমন।

মনে পড়ে, সে বারের ফিলিস্তিন যাত্রায় এক বয়স্ক মহিলার সাথে দেখা হয়েছিল। তিনি আমার হাত ধরে টেনে তার বাড়িতে আহবান করছিলেন, 'ইয়াল্লা! ইয়াল্লা!' অর্থাৎ 'আসো, আসো'।

ভেতরে গিয়ে তিনি আমার গায়ে একটা কোট পরিয়ে দিয়েছিলেন। ছোট একটা ব্যাগে কিছু জামা কাপড় দিয়ে তার ফোন নম্বর লিখে দিয়েছিলেন। দরজার কাছে এসে হাত নেড়ে আমাকে বিদায় জানিয়েছিলেন, 'আসসালামু আলাইকুম'।

অথচ তিনি আমাকে চিনতেন না, আমার সম্পর্কে তেমন কিছুই তার জানা ছিল না। জীবনে আর কখনো তার সাথে আমার দেখাও হয়নি।

www.pathagar.com

একজন অপরিচিত মানুষের প্রতি একজন মুসলিম নারীর এমন নিবিড় আন্তরিকতা আমার হৃদয়টাকে দারুণভাবে নাড়া দিয়েছিল। সেদিন মুসলিমদের সম্পর্কে আমার এত দিনকার চিন্তা-চেতনা বেশ ভালোই ধাক্কা খেয়েছিল।

চরম দুঃখ-কষ্ট-অবিচারের মুখোমুখি দাঁড়িয়েও মুসলিমদের মুখের হাসি আর তৃপ্তিবোধ আমাকে দারুণ অবাক করেছিল। আমার মনে আছে, সেখানকার মুসলিমদের মুখে কথায় কথায় একটা শব্দ শুনতাম, 'আলহামদুলিল্লাহ'। আমি জানতাম না এই শব্দের অর্থ কী।

ভাবতাম, তারা হয়তো স্রষ্টাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছেন। কিন্তু আমি এর অন্তর্নিহিত শক্তিকে উপলব্ধি করতে পারিনি। বুঝতে পারিনি, এই একটি শব্দ কী করে আল্লাহর সাথে তার বান্দার সুদৃঢ় সম্পর্ক তৈরি করে।

দুই

একজন অমুসলিমের ইসলামকে বুঝার জন্য প্রয়োজন 'দাওয়াহ'। দাওয়াহ মানে অনেক তথ্যের সরবরাহ। সে সময় কয়েক বছর আমি সুচিন্তিতভাবে ইসলাম কিংবা সঠিক ধর্মমত খুঁজতে যাইনি। কিন্তু কোনো না কোনো ভাবে আমার কাছে ইসলামের দাওয়াহ আসতে লাগল।

এ ক্ষেত্রে বেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলেন সোমালিয়ান ট্যাক্সি ড্রাইভারেরা। উত্তর লন্ডনের পথে পথে অধিকাংশ ট্যাক্সি ড্রাইভার ছিলেন সোমালিয়ান। আল্লাহ তাদের উপর রহম করুন। তারা ছিলেন ইসলামের নীরব যোদ্ধা।

যখনই কোনো মানুষ তাদের ট্যাক্সিতে চড়েন, তারা সুযোগ বুঝে কুরআন কিংবা হাদীসের বাণী শেয়ার করেন। এতে অনেক যাত্রীই ইসলাম সম্পর্কে আগ্রহী হয়ে উঠেন।

যখনই সোমালী ভাইদের ট্যাক্সিতে উঠতাম, আমি সালাম দিতাম 'আসসালামু আলাইকুম'। ফিলিস্তিনে গিয়ে আমি এই সম্ভাষণ শিখেছিলাম।

আন্তরিক হাসিতে তাদের চেহারা উজ্জ্বল হয়ে উঠত। 'বাহ! আপনি তো ভালোই আরবি জানেন। হুম, তাহলে তো ইসলাম সম্পর্কেও অনেক কিছু জানেন। আচ্ছা ঐ ঘটনাটি কী জানেন? ওই যে আমাদের নবি ﷺ উনার স্ত্রী আয়েশা (রা.)-কে বলেছিলেন...'

এভাবে তারা কুরআন হাদীসের নানা বাণী আমার সাথে শেয়ার করতেন। তত দিনে আলাপচারিতার ফাঁকে ফাঁকে আমার মনটা ইসলামের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে উঠেছিল।

www.pathagar.com

আমি জানি আমাদের কুরআনের সাথে সম্পর্ক রাখা উচিত, কুরআন পড়া উচিত। কিন্তু কেন জানি ইসলাম কবুলের আগে কুরআন নিয়ে আমি খুব একটা আগ্রহী ছিলাম না।

জেরুজালেমের একজন তরুণ আমাকে একটা কুরআন উপহার দিয়ে বলেছিল, 'ম্যাডাম, এটা ফিলিস্তিনিদের পক্ষ থেকে আপনার জন্য উপহার। আমাদের কখনো ভুলে যাবেন না।'

তার সাথে এর আগে পরে আমার আর কখনো দেখা হয়নি।

আমি বাসায় ফিরে কুরআন পড়ার চেষ্টা করেছিলাম। প্রথম সূরা, সূরা ফাতিহার তেমন কিছুই বুঝিনি। এরপরে আরও কয়েক পৃষ্ঠা পড়ার চেষ্টা করেছিলাম। আমার মনে হচ্ছিল অতি কর্তৃত্বশালী কেউ একজন গম্ভীর কণ্ঠে আদেশ করছেন, পরকালের কঠোর ভয় দেখাচ্ছেন। মনে মনে আমি কিছুটা নার্ভাস হয়ে পড়েছিলাম। কুরআনের সে কপি যত্ন সহকারে বুকসেলফে তুলে রেখেছিলাম। ইসলাম কবুলের আগে তা আর কখনো খুলে দেখিনি।

আল্লাহ সর্বজ্ঞানী, তিনি মানুষের সম্পর্কে সবই জানেন। যদি কারও মন চরম অবিশ্বাসে ভরা থাকে কিংবা কারও মন যদি কুরআনের জন্য প্রস্তুত না হয়, তাহলে হয়তো কুরআনের আবেদন সে সত্যিকারে অনুভব করতে পারে না।

২০০৮ সালে আমি একটা ইমেইল পাই। এই ইমেইল আমার জীবনের গতিপথ পাল্টে দিয়েছিল। ইমেইলে দুটো কথা ছিল, 'আপনি কি সাগর পথে গাজায় যেতে চান? আপনি কি গাজার পথে সাগর পাড়ি দিতে এই নম্বরে ফোন করবেন?' ইমেইলে একাধিক ফোন নম্বর দেয়া ছিল।

ইমেইলটা ছিল অদ্ভুত। গত ৪৪ বছরে সাগর পথে কেউ গাজায় ভিড়তে পারেনি। কারণ, ৭০-এর দশকে এমনই একটি জাহাজ গাজায় ভেড়ার চেষ্টা করলে ইজরাঈল বোমা মেরে তা উড়িয়ে দেয়। এতে অনেক মানুষ হতাহত হয়।

কিন্তু সে বছর আমেরিকার কিছু মানবতাবাদী সংগঠন এমনই এক সফরের আয়োজন করে। সাগরে জাহাজ ছিল দুটো। কথা ছিল, আমেরিকার সাইপ্রাস থেকে যাত্রা করে গাজায় নোঙ্গর করবে। তখন গাজায়[১] নিষ্ঠুরতম অবরোধ চলছিল। নারী-শিশু-বৃদ্ধ সবাই খাদ্য পানীয়, নিত্য প্রয়োজনীয় ঔষধের তীব্র সংকটে ভুগছিলেন। এই সফরের উদ্দেশ্য ছিল, গাজার মানুষের পাশে দাঁড়ানো। সমসাময়িক কালের নিষ্ঠুর এই অবরোধের প্রতিবাদ জানানো।

www.pathagar.com

আমি আমার বাচ্চাদের কাছ থেকে বিদায় নিলাম। তারপর চড়ে বসলাম গাজাগামি জাহাজে। টানা ৩৬ ঘণ্টা এক নাগাড়ে পথ চলেছি আমরা। চারদিকে ঘন কুয়াশা, আশেপাশে কিছুই দেখা যায় না। হঠাৎই কুয়াশার চাদর ফুঁড়ে ভেসে উঠল গাজার ভূখণ্ড। সে এক রোমাঞ্চকর দৃশ্য! আমরা যতই কাছে আসছিলাম, ততই হাজার হাজার মানুষের উপস্থিতি টের পাচ্ছিলাম। তারা আমাদের দেখে চিৎকার দিয়ে উঠেছিল 'আল্লাহু আকবার! আল্লাহু আকবার!'

আমাদের কথা ছিল, আমরা মোট তিনদিন থাকব। আমার কী হয়েছিল জানি না, তৃতীয় দিন বিকেলে গাজার তীরে দাঁড়িয়ে আমি সে ত্রাণবাহী জাহাজকে বিদায় জানালাম। আমি রয়ে গেলাম গাজার ভূখণ্ডে। সে সময় গাজা থেকে নৌপথ ছাড়া আর অন্য কোনো পথ দিয়ে ফিলিস্তিন থেকে বের হবার উপায় ছিল না।

আমার কাছে আজও এর কোনো ব্যাখ্যা নেই, কেন আমি কী বুঝে সেদিন জীবনের ঝুঁকি নিয়ে গাজায় রয়ে গিয়েছিলাম। সম্ভবত আমাকে হিদায়াতের পথে নিয়ে আসার জন্য এটা ছিল আল্লাহ তায়ালারই সুমহান পরিকল্পনার অংশ।

সে বার আমাকে প্রায় ত্রিশদিন ফিলিস্তিনে থাকতে হয়েছিল। তিনদিনের জন্য এসে ত্রিশ দিন, ভাবা যায়! একদিকে ইসরাইলী সীমান্ত, অন্যদিকে মিসর সীমান্তে তাদের সৈন্যদল। কোনোদিক দিয়েই আমার বের হবার কোনো পথ ছিল না। বলতে গেলে আমি ফাঁদেই আটকা পড়েছিলাম।

সে সময়টা ছিল রমজান মাস। গাজার মুসলমানদের তখন দারুণ দুঃসময়। সুবহানাল্লাহ! ঠিক এমন একটা সময়ে তাদের মাঝে থেকে আমি যা শিখেছিলাম, যা অনুভব করেছিলাম, তা কখনোই ভোলার নয়। আমি অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করেছিলাম, তাদের বলা 'আলহামদুলিল্লাহ'-এর শক্তি কতখানি।

এক সন্ধ্যায় 'রাফার' এক আশ্রয় শিবিরে যাই। পনেরো বছরের সেই ফিলিস্তিনি বালক, ফারেস উদে ছিল এমনই এক আশ্রয় শিবিরের সন্তান। আমি এক পরিবারের সাথে দেখা করি। তখন ইফতারের সময় হয়ে এসেছিল।

পরিবারের মুসলিম নারীটি আমাকে দরজা খুলে 'আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু' বলে অভিবাদন জানালেন। তার শান্ত চেহারায় পরম প্রশান্তি খেলা করছিল।

চারদিকে দারিদ্রতার ছাপ স্পষ্ট। আশ্রয় শিবিরে দারুণ দারিদ্রতার মধ্যে থেকে একজন মুসলিম মহিলার মুখ এতখানি প্রশান্তি মাখা হয় কী করে, আমার জন্য তা ছিল বিরাট রহস্য।

www.pathagar.com

আমি কিছুটা ক্ষোভের সাথেই বললাম, 'রমজানে কী বুঝে আপনারা রোজা রাখছেন আমি বুঝতে পারছি না। আপনাদের রব আপনাদের এমন অবস্থায় ফেলেছেন, আজ আপনাদের পর্যাপ্ত খাবার নেই, পানি নেই। বলতে গেলে প্রায় অভুক্ত থাকতে হচ্ছে। এ অবস্থায় আলাদা করে রোজা রাখার মানে কী?'

তিনি আমার দিকে ফিরলেন। তার সমস্ত চেহারা নূরের আভায় ঝকমক করছিল। 'আমি রমজানে এই কারণে রোজা রাখি, যাতে দরিদ্র মানুষের কষ্ট বুঝতে পারি।'

আমার বুকের ভেতরটা হু হু করে উঠল। তিনি নিজে এত দরিদ্র, এত অভাবী, অথচ তিনি কিনা অন্যের কষ্ট বোঝার চেষ্টা করছেন! তার নিজের দুঃখ-কষ্ট নিয়ে তার কোনো আক্ষেপ নেই। নেই কোনো অনুভূতি। বরং তিনি সার্বিক অবস্থার জন্য আল্লাহর কাছে কৃতজ্ঞ। তিনি প্রতিনিয়ত আল্লাহর কাছে শুকরিয়া আদায় করে চলেছেন।

কী এক আবেগে আমার হৃদয়টা দুমড়ে মুচড়ে যাচ্ছিল। আমি মনে মনে ভাবছিলাম, 'এই যদি হয় ইসলামের শিক্ষা, এই যদি হয় ইসলামের সৌন্দর্য, তবে কারও জীবনে এর চেয়ে উত্তম কিছু আর কী হতে পারে!'

যদিও ওই আশ্রয় শিবির থেকে বেরিয়ে আসার পর আমার এ অনুভূতি বেশিক্ষণ থাকেনি। কিন্তু আমার আল্লাহ ঠিকই আমাকে মনে রেখেছেন।

দুবছর পর এমনই এক রমজানে আমি মসজিদে গেলাম। আমার মন এক সুখময় অনুভূতিতে ভরে উঠল। আমি অনুভব করলাম, ইসলামই আমার জন্য সঠিক পথ। সাতদিন পরে আমি আরেকটি মসজিদে গেলাম। উপস্থিত স্বাক্ষীদের সামনে উচ্চারণ করলাম, 'আশহাদু আন লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ, ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ।' আমি হয়ে গেলাম মুসলিম।

আমি আর আমার মেয়ে এখন একসাথে সিয়াম পালন করি। আলহামদুলিল্লাহ! আমাদের জীবন আজ পরিপূর্ণ। আমাদের জীবন আজ কৃতজ্ঞতায় ভরপুর। কৃতজ্ঞতা মহান আল্লাহর প্রতি, যিনি আমাদের এত চমৎকার একটি ধর্মে, এত চমৎকার পথে পরিচালিত করছেন। কৃতজ্ঞতা আপনাদের প্রতি, যারা আমাদের আপন ভাই হিসেবে, বোন হিসেবে আপন করে নিয়েছেন।

দোয়া করি, আপনারাও যাতে আমার মতো 'আলহামদুলিল্লাহ'-এর শক্তি উপলব্ধি করতে পারেন। এটি এমন একটি শব্দ, যেটি আমাদেরকে সকল সমস্যা, চিন্তা ও ভয় থেকে মুক্তি দেয়।

www.pathagar.com

আসুন আমরা বেশি বেশি করে পড়ি 'আলহামদুলিল্লাহ'। কারণ, আপনি আমি সৌভাগ্যবান, এত চমৎকার একটি দ্বীন পেয়েছি। আসুন প্রতিটি মুহূর্ত, প্রতিটি সময় আল্লাহর দেয়া নিয়ামতের কথা স্মরণ করে বার বার বলি– 'আলহামদুলিল্লাহ'।

পরিচিতি

লরেন বুথের জন্ম উত্তর লন্ডনে, ১৯৬৭ সালে। তিনি ছিলেন সাবেক ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী টনি ব্রেয়ারের স্ত্রী শেরি ব্রেয়ারের সৎবোন। পেশায় সাংবাদিক লরেন বুথ বেশ কয়েকবার ফিলিস্তিনে যান পেশাগত কারণে। সেখানকার মুসলিমদের আচরণ ও মানসিকতায় তিনি মুগ্ধ হন। ইসলাম নিয়ে পড়াশুনা করার এক পর্যায়ে ২০১০ সালে এসে তিনি ইসলাম কবুল করেন।

পেশাগত জীবনে লরেন বুথ New Statesman, The Mail on Sunday সহ বেশ কিছু পত্রিকায় সাংবাদিকতা ও লেখালেখি করেছেন। British Muslim TV ও Al Jajeera সহ বেশ কিছু টিভি চ্যানেলেও তিনি সুনামের সাথে কাজ করেছেন। এছাড়াও তিনি যুদ্ধবিরোধী নানা আন্দোলন, প্রচারণার সাথে সক্রিয়ভাবে যুক্ত আছেন।

এই কাহিনিটি মালয়েশিয়ান এক টিভিতে দেয়া তার এক স্বাক্ষাৎকারের রূপান্তর।

পাদটিকা

গাজা অবরোধ : গাজা ভূমধ্যসাগরের তীরে ফিলিস্তিনের একটি শহর। এর এক পাশে মিসর সীমান্ত। ২০০৬ সালে এক নির্বাচনে হামাস বিজয়ী হয়। পরবর্তী সময়ে হামাস নেতা ইসমাইল হানিয়ার নেতৃত্বে হামাস ও ফাতাহ দল মিলে একটা কোয়ালিশন সরকার গঠন করে। হামাস পুরো ফিলিস্তিন ও গাজার নেতৃত্বভার নিজেদের নিয়ন্ত্রণে আনার পর ইজরাঈল ও মিসর একযোগে গাজা অবরোধ করে রাখে। গাজা দিয়ে কারও ফিলিস্তিনে আসা যাওয়া ছিল বন্ধ। এমনকি জরুরি খাদ্য, ওষুধ সামগ্রীও ভেতরে আসতে পারেনি। মিসর আর ইসরাঈলের অভিযোগ ছিল, গাজার সীমান্ত বন্ধ না রাখলে সন্ত্রাসীরা তাদের দেশে ঢুকে হামলা চালাবে।

সে সময় গোটা ফিলিস্তিনের মানুষদের দুঃসহ জীবন কাটাতে হয়। জাতিসংঘসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থাগুলো এর তীব্র নিন্দা জানায়। আন্তর্জাতিক রেডক্রস কমিটি একে বর্ণনা করে 'সমন্বিত সর্বাত্মক শাস্তি' হিসেবে।

www.pathagar.com

জীবনের মানে খুঁজতে গিয়ে

আব্দুর রাহিম গ্রিন

এক

আলহামদুলিল্লাহ, ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আ'লা রাসূলিল্লাহ।
প্রিয় ভাই ও বোনেরা, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।

আমি আব্দুর রহিম গ্রিন। আমার ইসলাম গ্রহণের গল্পটা আপনাদের সামনে আজ তুলে ধরব।

আমার জন্ম তানজানিয়ার রাজধানি দারুস সালামে। আমার বাবা ছিলেন জাতিতে ইংরেজ, মা পোলিশ। বাবা তখন তানজানিয়াতে ব্রিটিশ সম্রাজ্যের একজন কর্মকর্তা হিসেবে কাজ করতেন। সেই ব্রিটিশ সাম্রাজ্য! একসময় এই সাম্রাজ্য গোটা বিশ্বের প্রায় এক তৃতীয়াংশ জুড়ে ছিল। আর আজ? ফকল্যান্ডের সামান্য কিছু দ্বীপই কেবল ব্রিটেনের অধিকারে আছে।

সবকিছু কী দারুণ ভাবেই না বদলে যায়! একসময়ের বিশাল শক্তিধর রাষ্ট্রের সে শক্তিমত্তার তেমন কিছুই আর নেই। এর মাঝেই আল্লাহ আমাদের জন্য বিরাট শিক্ষা রেখেছেন। আল্লাহ কুরআনে বলেছেন–

> 'তোমরা পৃথিবীতে ঘুরে দেখ। দেখ, অতীতের জাতিদের পরিণতি কী হয়েছিল যারা শক্তি সামর্থ্য সবদিক দিয়ে তোমাদের চেয়ে আরও অনেক বেশি উন্নত ছিল।' সূরা আর রূম : ৯

যাহোক, জন্মের পর আমার নাম রাখা হয় এন্থনি গ্রিন। আমার বয়স যখন দুবছর, তখন আমরা তানজানিয়া ছেড়ে যাই।

বাবার ধর্ম-কর্মে খুব একটা বিশ্বাস ছিল না। মা ছিলেন রোমান ক্যাথলিক। নিয়ম অনুযায়ী মায়ের ক্যাথলিক ধর্মে বিশ্বাসী একজনকেই বিয়ে করার কথা ছিল।

www.pathagar.com

যদিও মা তা করেননি। মা নিজেও খুব বেশি ধার্মিক ছিলেন না। তার প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপই কিনা, মা ঠিক করলেন আমাদের দুই ভাই, আমি আর ডানকান কে ধার্মিক ক্যাথলিক বানাবেন। দশ বছর বয়সে ইংল্যান্ডের ইয়র্কশায়ারের একটা বোর্ডিং স্কুলে আমাকে পাঠানো হয়। স্কুলটি ক্যাথলিক ধর্মগুরুদের দ্বারা পরিচালিত ছিল।

সে স্কুলে পাঠানোর আগে মা আমাকে স্কুলের কিছু নিয়ম কানুন, কিছু প্রার্থনা শিখিয়ে দিলেন। এক রাতে মা আমাদের দুজনকে নিয়ে প্রার্থনা করলেন, 'হে মেরি! ঈশ্বর মাতা! তুমি আমাদের উপর তোমার পুত্র যিশুর মাধ্যমে দয়া কর।' এটা ছিল ক্যাথলিকদের মধ্যে প্রচলিত বহুল ব্যবহৃত একটি প্রার্থনা।

ওই বয়সেই আমার মনে খটকা লাগল, 'ঈশ্বরের আবার মা থাকে কী করে! ঈশ্বর তো হওয়া উচিত এমন একজন, যার কোনো শুরু নেই, শেষ নেই। তাহলে তার জন্মদাত্রী মা আসে কোথা থেকে? আমার মনে হলো, যে মা ঈশ্বরকে জন্ম দিয়েছেন, তিনি নিশ্চয় ঈশ্বরের চেয়েও আরও অনেক অনেক বড়। সে হিসেবে মাতা মেরী তো আরও বড় খোদা।

এটা ছিল আমার মনে উদয় হওয়া প্রথম বড় জিজ্ঞাসা।

স্কুলে পড়াশোনা করতে গিয়ে আমার মনে আরও অনেক প্রশ্নের উদয় হলো। স্কুলে একটা নিয়ম ছিল, সেখানকার ধর্মগুরুর সামনে নিজের সকল পাপ স্বীকার করতে হবে। বছরে কমপক্ষে একবার এই নিয়ম মানতেই হতো। বলা হতো, সব পাপ স্বীকার না করলে ঈশ্বর নাকি ক্ষমা করবেন না। আমার মাথায় ঢুকতো না, নিজের সব পাপ এই লোকের কাছে স্বীকার করতে হবে কেন? ১২-১৩ বছরের বাচ্চাদের ওই বয়সে যদি সব পাপ স্বীকার করতে বলা হয়, তাও আবার তাদেরই আবাসিক শিক্ষকের সামনে, তারা কী আসলেই তা মানবে? আপনাদের কী মনে হয়?

আমার মনে হতো, ঈশ্বরের নাম করে পাপ স্বীকারের বিষয়টা এক ধরনের চালাকি। যাতে কোনো ছাত্রের মনে কী আছে, কে কী করে তা জেনে নিয়ে সে অনুযায়ী সবাইকে টাইট দেয়া যায়। আমরাও কম যাই না। নিজের মতো করে অনেক কিছু বানিয়ে বলতাম। এই যেমন বলতাম, 'গত সপ্তাহে ওই ছেলেটার দামি জামা কাপড় দেখে আমার মনে একটু হিংসা হয়েছিল', 'এই সপ্তাহে আমি তিনবার মিথ্যে বলেছিলাম' ইত্যাদি। এই বয়সের ছেলেরা অনেক ধরনের কাজকর্মই করে। সব কী আর অন্যের সামনে বলা যায়!

আমি একবার জিজ্ঞাসাও করেছিলাম, 'আমাকে আপনাদের সামনেই দোষ স্বীকার করতে হবে কেন? কেন সরাসরি ঈশ্বরের কাছেই নয়? অথচ আমাদের পবিত্র বাইবেলে আছে, যিশু বলেছেন স্বর্গীয় পিতার কাছেই নিজের অপরাধ মার্জনা চেয়ে।'

www.pathagar.com

তারা আমাকে বললেন, 'তুমি ইচ্ছে করলে সরাসরি ঈশ্বরের কাছে বলতে পার। কিন্তু তোমার নিশ্চিত হবার সুযোগ নেই, আসলেই ঈশ্বর তোমাকে ক্ষমা করেছেন কিনা। কিন্তু আমরা ঈশ্বরের কাছে তোমাদের পাপের জন্য ক্ষমা চাইলে, ঈশ্বর অবশ্যই তোমাদের ক্ষমা করবেন।'

'বাহ! চমৎকার! আমি বললে ঈশ্বর আমার কথা শুনবেন না, কিন্তু আপনাদের কথা ঠিকই শুনবেন। অথচ আপনারা গুণে মানে কোনো দিক দিয়ে আমাদের চেয়ে আহামরি ভালো কিছু নন।' আমি মনে মনে ভাবছিলাম। বলা বাহুল্য, তাদের এই জবাব আমাকে মোটেও সন্তুষ্ট করতে পারেনি।

খ্রিষ্ট ধর্মের বিশ্বাস অনুযায়ী সর্বশক্তিমান ঈশ্বর মানুষের রূপ ধরে পৃথিবীতে এসেছেন। যা অবতারবাদ নামে পরিচিত। এটাও আমার ঠিক বুঝে আসত না। আমি বুঝতাম না, ঈশ্বরের মানুষ হয়ে পৃথিবীতে আসারই বা কী দরকার!

আমার এগার বছর বয়সে বাবা চাকরি সূত্রে মিসর চলে আসেন। ছুটির দিনগুলোতে আমরা লন্ডন থেকে মিসরে চলে যেতাম। আমি ক্লাস করতাম লন্ডনে, আর ছুটি কাটাতাম মিসরে। এভাবেই কেটেছিল প্রায় দশ বছর।

আমার মনের একটা অনুভূতি আপনাদের সাথে শেয়ার করি। পাশ্চাত্য সংস্কৃতি আমাদের শেখায় সুখী হওয়া মানে অনেক টাকার মালিক হওয়া। কারণ, আপনার অনেক টাকা থাকলে আপনি দামি গাড়িতে চড়তে পারবেন, ড্রইং রুমে সোফায় বসে বিশাল বড় টিভি দেখতে পারবেন, ছুটির দিনগুলোতে মন ভরে দূরে কোথাও ঘুরতে যেতে পারবেন। পারবেন নিজের ইচ্ছেমতো নানা ধরনের দামি জিনিস কিনতে। তাই জীবনে সুখী হতে অনেক অনেক টাকার প্রয়োজন।

কিন্তু আসলে কি টাকা সুখ এনে দিতে পারে? সত্যি কথা হলো, অঢেল সম্পদ আপনাকে কখনোই মনের দিক দিয়ে পরিপূর্ণ সুখী করতে পারবে না।

এই কথাগুলো কেন বলছি? কারণ, এই বিষয়গুলো আমাকে খুবই ভাবাত। মিসরে ফুরফুরে দিনগুলো কাটিয়ে আমি যখন বোর্ডিং স্কুলের কঠোর নিয়ম-কানুনের মধ্যে ফিরে যেতাম; মনে হতো, কেন আমি এত কষ্ট করছি? এত কড়াকড়ির মধ্যে পড়াশোনা করে কী লাভ? কী লাভ এত কষ্ট করে, এত কিছু শিখে?

আমি ভাবতাম, আসলে এই জীবনের মানে কী? কেনইবা পৃথিবীতে আমাদের এই বেঁচে থাকা? কী আমাদের জীবনের আসল উদ্দেশ্য?

আমি নিজে নিজেই জবাব খুঁজে নিতাম, 'আমি এই স্কুলে এত কষ্ট করছি, যাতে আমার রেজাল্ট ভালো হয়। রেজাল্ট ভালো হলে আমি একটা ভালো

www.pathagar.com

ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হতে পারব। ইউনিভার্সিটিতে ভালো রেজাল্ট করতে পারলে, আমার খুব ভালো বেতনের একটা চাকুরি হবে। তখন আমার দারুণ একটা বউ হবে, হবে সন্তানসন্ততি। নিজের অনেক টাকা থাকলে আমার সন্তানদেরকেও ভালো ভালো স্কুলে পড়াতে পারব। যাতে তারা ভালো রেজাল্ট করে ভবিষ্যতে আমার মতোই একটা ভালো বেতনের চাকুরি পায়। তখন তারাও তাদের ছেলে মেয়েদের ভালো স্কুলে পড়াতে পারবে, যাতে তারাও বড় হয়ে মোটা বেতনের চাকুরি করে তাদের ছেলে মেয়েদের দামি স্কুলগুলোতে পড়াতে পারে।'

আপন মনেই নিজের কাছে সব কেমন যেন লাগল। ভালো করে ভেবে দেখলে, এইতো আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য। এর জন্যই তো আমরা রাতদিন খাটা খাটুনি করছি, এত এত কষ্ট করে মরছি...

দুই

মনে জমে থাকা হাজারও প্রশ্ন আমাকে গভীরভাবে ভাবতে শেখাল। একসময় নিজের আগ্রহে বুঝতে চাইলাম, অন্যান্য ধর্ম, অন্যান্য ধ্যান-ধারণায় জীবনের সত্যিকারে মানে কী।

আমার বয়স তখন উনিশ। এই সময়ে বেশ ইন্টারেস্টিং একটা ঘটনা ঘটল। দশ বছরের মিসরীয় জীবনে বলতে গেলে একজন মানুষের সাথেই ধর্ম নিয়ে পরিচ্ছন্ন আলোচনা জমে উঠেছিল। যদিও ক্যাথলিক ধর্মমত নিয়ে আমার মনের ভেতর অনেক দ্বন্দ্ব ছিল; কিন্তু বাহ্যিক দিক দিয়ে কেউ আমার ধর্ম নিয়ে প্রশ্ন করলে, তাকে হেয় করলে, আমি মনে মনে তেতে উঠতাম। যে করেই হোক আমি তার প্রতিবাদ করতাম।

সেই মিসরীয় মানুষটির সাথে ধর্ম নিয়ে একদিন প্রায় চল্লিশ মিনিট আলোচনা হলো। তিনি আমাকে খুব সাধারণ কিছু প্রশ্ন করেছিলেন।

তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'তাহলে তুমি বিশ্বাস কর, যিশুখ্রিষ্ট ছিলেন ঈশ্বর?'

আমি মাথা নাড়লাম, 'অবশ্যই'।

তিনি আবারও প্রশ্ন করলেন, 'তুমি বিশ্বাস কর, যিশুখ্রিষ্ট ক্রুসে জীবন দিয়েছেন?'

আমি দৃঢ় গলায় বললাম, 'নিঃসন্দেহে'।

তিনি আমার চোখে চোখ রাখলেন। তারপর বললেন, 'তাহলে তুমি বিশ্বাস কর ঈশ্বর মারা গিয়েছেন?'

www.pathagar.com

বক্সিং খেলার নিয়ম জানেন তো? ইয়া বড় এক ঘুষি খেয়ে কোনো খেলোয়াড় যদি পড়ে যায়, আর রেফারি ১-১০ গোনার ফাঁকে উঠতে না পারে, তবে সে খেলোয়াড় সাথেই সাথেই হেরে যায়। যাকে বলে 'নকআউট'।

তার প্রশ্ন শুনে আমার মনে হলো, বিখ্যাত বক্সার মাইক টাইসনের এক ওজনদার ঘুষি খেয়ে আমি একেবারে চিৎপটাং হয়ে গেছি। আমার কাছে তার এই প্রশ্নের কোনো উত্তর ছিল না। কারণ, মনে মনে আমি ঠিকই বুঝতে পারছিলাম, আমাদের এই ধারণাগুলো কতটা অযৌক্তিক। ঈশ্বর আবার মারা যায় কী করে! অথচ এত দিন ধরে আমাকে যা শেখানো হয়েছিল, তাতে তো সারমর্ম এটাই দাঁড়ায়। মনে মনে আমার ভেতর দ্বিধা ছিল, দ্বন্দ্ব ছিল। কিন্তু আজ একজন একেবারে চোখে আঙুল দিয়ে আমাকে সেটি দেখিয়ে গেলেন।

অবশ্য, আমি তখন তা মুখে স্বীকার করিনি।

'আমার খুব জরুরি একটা কাজ আছে। আমি বাসায় যাচ্ছি। আপনার সাথে পরে কথা হবে'। আমি কোনো রকমে কিছু একটা বলে, তার কাছ থেকে সরে এসেছিলাম। তবে তার সে যুক্তি আমার মাথার মধ্যে গেঁথে গিয়েছিল।

বিশ বছর বয়স হতে হতে ক্যাথলিক ধর্ম থেকে আমার মন প্রায় উঠেই গিয়েছিল। আমি তখন হিপি হয়ে গিয়েছিলাম। আমি নিজেই নিজের একটা ধর্ম বানিয়ে নিয়েছিলাম। সেটা কেমন? এযাবৎকাল যতগুলো ধর্ম নিয়ে যাই কিছু পড়েছি, সেগুলো থেকে বেছে বেছে আমার মনের মতো করে একটা পদ্ধতি দাঁড় করিয়েছিলাম। সেটাকেই মানার চেষ্টা করতাম। তবে কিছুদিন যেতে না যেতেই বুঝতে পারলাম, এটার চেয়ে ফালতু এবং নিকৃষ্ট আর কিছুই হতে পারে না।

'ধুর ছাই! এত ধর্ম-কর্ম, আধ্যাত্মিক চিন্তা আর জীবনের মানে খোঁজার কী দরকার?' আমি নিজেকে প্রবোধ দিলাম, 'তার চেয়ে নিজেকে সুখী রাখতে টাকা কামানোর দিকে মনোযোগ দেয়াই বুদ্ধিমানের কাজ।'

আমার টাকা পয়সার অভাব ছিল না। বলা চলে আমার মা-বাবা স্বচ্ছলই ছিলেন। গাড়ি, বাড়ি, ঘর ভর্তি কাজের লোক...আমাদের সবই ছিল। পকেট খরচ হিসেবে আমি বাবার কাছ থেকে যা পেতাম, তা দিয়ে অনেক মানুষ তাদের গোটা সংসার চালায়। তাহলে আমার আসলে কী পরিমান টাকা দরকার?

'আমার কমপক্ষে এত টাকার দরকার যাতে নিজের একটা প্রাইভেট জেট প্লেন থাকে।' আমি মনে মনে ভাবছিলাম, 'আচ্ছা, টাকা না হয় রোজগার করব বুঝলাম, কিন্তু তা কীভাবে? কঠোর পরিশ্রম করে? উহু, এর কোনো মানেই হয় না। ছোট একটা জীবন এত কষ্ট করে কী লাভ? তার চেয়ে দেখা যাক, কম পরিশ্রমে কী করে অঢেল সম্পদের মালিক হওয়া যায়?'

www.pathagar.com

আমি এবার বিভিন্ন জাতি আর মানুষদের নিয়ে গবেষণা করা শুরু করলাম। দেখি, পৃথিবীতে কারা কারা ধনী? প্রথমে আমি ইংল্যান্ড নিয়েই ভাবা শুরু করলাম। হ্যাঁ, ইংল্যান্ডের মানুষদের টাকা-পয়সা ভালোই আছে। কিন্তু তার পেছনে পরিশ্রমও তো কম নয়। শিল্প বিপ্লব ঘটেছে, অনেক অনেক মিল কারখানায় মানুষ রাত-দিন পরিশ্রম করেছে। এত কিছুর পরেই না তারা ধনী হতে পেরেছে। আমেরিকা? তাদের ইতিহাসও ঘুরে ফিরে সেই পরিশ্রমের। জাপান? ও বাবা! তারা তো মহা কাজ পাগল। কাজ ছাড়া কিছুই বোঝে না।

'ইউরেকা!' আমি মনে মনে উৎফুল্ল হয়ে উঠলাম 'পেয়েছি! সৌদি আরব। সেই দেশের মানুষদের বিশেষ কোনো কাজ নেই। উটে করে ঘুরে বেড়ায় আর আল্লাহু আকবার বলে বারবার মাটিতে চুমু খায়। অথচ, তাদের দেশে টাকা পয়সা, তেল সম্পদের অভাব নেই। সবচেয়ে কম পরিশ্রমে সবচেয়ে বেশি রোজগার।'

আচ্ছা তাদের জীবনযাপন কেমন? তাদের ধর্মই বা কী?

খুঁজতে খুঁজতে জানতে পারলাম তাদের পবিত্র গ্রন্থের নাম কুরআন। আমার মনে হলো, পড়ে দেখা দরকার কী আছে এতে। একদিন একটা বইয়ের দোকানে গিয়ে এক খণ্ড কুরআন কিনে নিয়ে এলাম।

কুরআন সম্পর্কে আমার কোনো ধারণাই ছিল না। কুরআনের মাঝে বিশেষ কিছু খুঁজতেও যাইনি কখনো। আমি খোলা মন নিয়ে বুঝতে চেয়েছিলাম, কী আছে এতে। ব্যাস! এতটুকুই। আমি কুরআন পড়া শুরু করলাম।

আমি ছিলাম খুব ভালো পড়ুয়া। মিসরে থাকতে আমাদের ড্রয়িং রুমের টিভিটা দেখাই হতো না। যেসব অনুষ্ঠান দেখাত, কোনোটাই খুব একটা ভালো ছিল না। না দেখতে দেখতে টিভির উপর কয়েক ইঞ্চি পুরু ধুলো জমে গিয়েছিল। তেমন কিছু করার নেই, তাই বই পড়ে সময় কাটাতাম। আর আমি খুব দ্রুত পড়তেও পারতাম।

আপনাদের একটা ধারণা দেই। দাস প্রথা নিয়ে আলেক্স হ্যালির বিশ্ব বিখ্যাত উপন্যাস 'Roots'-এর নাম শুনেছেন? ইয়া মোটা। আমার মনে আছে, এক রাতেই সে বইয়ের চার ভাগের তিন ভাগ পড়ে শেষ করেছিলাম।

কুরআন হাতে নিয়ে ভাবলাম, সে তুলনায় এই বইয়ের সাইজ খুব বড় নয়। একটা মাঝারি উপন্যাসের মতোই তো। পুরোটা শেষ করতে কতক্ষণই বা লাগবে! কিন্তু, টানা দুসপ্তাহ ধরে পড়েও আমি তার ইংরেজি অনুবাদ শেষ করতে পারিনি। এ এমনই এক বই, যে স্টাইলের বই, এর আগে কখনোই পড়িনি।

www.pathagar.com

আমরা সাধারণত যে বইগুলো পড়ি; গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, ইতিহাস, ভূগোল-সেগুলো সাধারণত কেমন হয়? এই বইগুলোর একটা শুরু থাকে, একটা শেষ থাকে এবং মাঝে কিছু কথা থাকে। কিন্তু কুরআন পুরোপুরি ব্যতিক্রম। এর বর্ণনা ভঙ্গির মধ্যে বিষয়বস্তুর কোনো ধারাবাহিকতাই নেই।

প্রথমে সূরা ফাতিহা দিয়ে শুরু। এরপরে সূরা বাকারা। সে সূরায় একবার মুনাফিকদের সম্পর্কে বলছে, আবার মুসা ﷺ এর ঘটনা, গরুর ঘটনা নিয়ে আলাপ করছে। পরের সূরা আবার অন্যরকম। ঘন ঘন বিষয় পরিবর্তন, একেকবার একেক বিষয়ের আলোচনা-আমাদের গতানুগতিক বইগুলোর সাথে কোনোই মিল নেই।

শুধু পড়ার উদ্দেশ্য নিয়ে শুরু করলেও এবারে ভালো করে বুঝতে চাইলাম, আসলে কুরআন কী বলছে। আমি একেকটা আয়াত পড়ি আর বিভিন্ন ব্যাখ্যা জেনে বোঝার চেষ্টা করি। এভাবে কুরআন পড়তে গিয়ে আমার অনেক সময় লেগে গিয়েছিল। দিনে দিনে আমার এত দিনকার অনেক প্রশ্ন, অনেক জিজ্ঞাসা আস্তে আস্তে পরিষ্কার হয়ে গেল।

আমার আজও পরিষ্কার মনে আছে সে দিনটার কথা। ট্রেনে করে টেমস নদীর উপর দিয়ে কর্মস্থলে যাচ্ছিলাম। আমার কোলে কুরআন মেলে ধরা। একবার কুরআনের দিকে চাইলাম, আরেকবার জানালা দিয়ে বাইরে তাকালাম। টেমসের উপরের বিশাল আকাশের দিকে তাকিয়ে আমার মনে হলো, যদি কোনো বই ঈশ্বরের কাছ থেকে এসে থাকে, তবে নিঃসন্দেহে এটাই সেই বই।

সে রাতে বাড়ি ফিরে মনে হলো, আমার নামায পড়া দরকার। কুরআন নামায পড়ার কথা বলেছে। যদিও কুরআনে নামায কীভাবে পড়ে তার নিয়ম-কানুন, খুঁটিনাটি বিস্তারিত বলা হয়নি। আমি সকাল-বিকাল সময় সুযোগমতো নামায পড়তাম। প্রতিদিন পাঁচবার পড়তে হয়, এটা আমার জানা ছিল না। নামাযের আগে অযু করে নিতাম। অযুর নিয়মটাও ভালো করে জানতাম না। আমি কুরআনে পড়েছি, হাত-পা-মুখ ভালো করে ধোয়া, মাথা মাসেহ করার কথা। পরিচিত এক মুসলিমকে নামায পড়তে দেখেছিলাম। আমি তার মতো করে নামায পড়ার চেষ্টা করতাম। সেভাবেই রুকু-সিজদা দিতাম। এভাবেই কেটেছিল দুসপ্তাহ।

একবার আমি কী একটা কাজে লন্ডন থেকে একটু বাইরে গেলাম। কী মনে করে জানি না, টিউব ট্রেন থেকে নেমে বামে না গিয়ে ডানে চলে গিয়েছিলাম। একটু হাঁটতেই একটা বইয়ের দোকান চোখে পড়ল। সে দোকানে আরবি ইংরেজিতে ইসলাম, মুহাম্মাদ ﷺ-এর জীবনীসহ আরও অনেক বই ছিল।

www.pathagar.com

আমি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বই দেখছিলাম। এখনকার মতোই তখনো আমার মাথার চুল, দাড়ি ছিল বড় বড়। পরনে ছিল কোট টাই।

এক লোক আমার দিকে এগিয়ে এলো 'মাফ করবেন ভাই, আপনি কি মুসলিম?'

'মুসলিম বলতে আপনি কী বুঝাচ্ছেন আমি জানি না। তবে আপনাকে একটা কথা বলি। আমি বিশ্বাস করি, আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয় এবং মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর রাসূল।' আমি উত্তর দিলাম।

তিনি বলতে গেলে চেঁচিয়ে উঠলেন, 'আরে ভাই, আপনি তো মুসলিম!'

আমি বললাম, 'ও, তাই নাকি? আচ্ছা বেশ।'

তিনি বললেন, 'আসেন ভাই, নামাযের সময় হয়েছে। নামায পড়তে যাই।'

তিনি আমাকে ভালো করে দেখিয়ে দিলেন, কী করে অযু করতে হয়। আমি সবার সাথে মসজিদে জামায়াতে নামায পড়লাম। মসজিদে ছিল উপচে পড়া ভিড়। আমার ধারণা সে দিনটা ছিল শুক্রবার। জানেনই তো, কেবল শুক্রবারেই মসজিদ মুসল্লিতে ভর্তি থাকে।

নামায শেষে আমি ইমামের সাথে সবার সামনে শাহাদাহ উচ্চারণ করলাম। আমি নিচে নেমে আসতেই মুসল্লিরা সবাই আমাকে ঘিরে ধরলেন। বলতে গেলে সবাই চাইছিলেন ইসলামের খুঁটিনাটি সবকিছু পাঁচ মিনিটের মধ্যে আমাকে পুরোপুরি বুঝিয়ে দিতে। অনেকে নামাযের নিয়ম-কানুন কাগজে লিখে তাদের নাম ঠিকানাসহ আমার হাতে দিয়েছিলেন। আলহামদুলিল্লাহ! মানুষগুলোর আন্তরিকতা আমাকে মুগ্ধ করেছিল।

মসজিদ থেকে বের হয়ে আসার পর আমার মনে হচ্ছিল, আমি যেন গোসল করে উঠে এসেছি। আমার ভেতরটা এক স্নিগ্ধ, পবিত্র, প্রশান্ত অনুভূতিতে ভরে উঠেছিল। এই অনুভূতি এতই চমৎকার, তার সামনে মারিজুয়ানা (হেরোইনের মতোই এক ধরনের মাদক) তুচ্ছ!

মাঝে-মাঝেই আমি সেই মসজিদে আসা-যাওয়া করতাম। কারণ, ওই মসজিদের সাথেই আমার পরিচয় ছিল। তাছাড়া সেখানকার অনেক মুসল্লিই ততদিনে আমার সাথে ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলেন।

এবার সময় হয়ে এল আমার গার্লফ্রেন্ডের মুখোমুখি হবার...

www.pathagar.com

তিন

আমার বান্ধবী লন্ডনের বাইরে একটা ইউনিভার্সিটিতে পড়ত। আমি প্রায়ই তার সাথে দেখা করতে যেতাম। তার রুমে গেলে বাথরুমে ঢুকে অযু করে নিতাম। সে অবশ্য কখনো দেখেনি।

একবার আমি কিবলামুখী হয়ে নামাযে দাঁড়িয়ে গেলাম। আমার গার্লফ্রেন্ড বিছানায় বসে বসে আমাকে দেখছিল। আমি নামায শেষে তার দিকে ফিরতেই, সে তীক্ষ্ণ গলায় জানতে চাইল, 'এটা তুমি কী করলে?'

'আমি মুসলমান হয়েছি তো, তাই নামায পড়ছিলাম।'

'কী...কী...' সে চিৎকার দিয়ে উঠল 'তুমি...তুমি কী হয়েছ? তুমি মুসলমান হয়েছ?' সে বিরামহীন চিৎকার করে গেল। সত্যি কথা বলতে; আমার এই কথা শুনে সে খুব বেশি হতাশ এবং আহত হয়েছিল।

সেটা ছিল, আমার জীবনের এক কঠিন সময়।

আমি মুসলিম ভাইবোনদের, এমনকি আমার ছেলে মেয়েদের জন্যও প্রার্থনা করি, যাতে কেউ গার্লফ্রেন্ড, বয়ফ্রেন্ড সম্পর্কে না জড়ায়। কারণ, সত্যিকারার্থে এতে জড়িয়ে খুব একটা উপকার নেই। বরং ক্ষতির দিকই বেশি। এর মাঝে উপকারিতা বলতে, পারস্পরিক সান্নিধ্য উপভোগ করা...এতটুকুই। অন্যদিকে এই সম্পর্কে জড়িয়ে আপনার হৃদয়ে রক্তক্ষরণ হবে, আপনার স্বাভাবিক শান্তি বিনষ্ট হবে, আপনার স্বাভাবিক কাজকর্মে নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে। ঈর্ষা, সন্দেহ, দ্বন্দ্ব ইত্যাদি এই সম্পর্কের সবকিছুই জীবনের জন্য, মনের জন্য যন্ত্রণাদায়ক।

আমি মনে করি, কারও যদি কাউকে ভালো লাগে, তবে নিজেদের মধ্যে বিয়ে করে নেয়া উচিত। বিয়ের মাধ্যমে আপনারা একে অন্যের সাথে সহাবস্থান করতে পারবেন, একে অন্যের সাথে সুখ-দুঃখ পরস্পর ভাগাভাগি করে নিতে পারবেন। আর এর মাঝেই আছে আল্লাহ পাকের রহমত ও অনুগ্রহ। যা বিয়ে বহির্ভূত সম্পর্কে আপনি পাবেন না।

এই কথাগুলো বলছি; কারণ, আমি সে সময় ইসলামের অনুশাসন মানা বন্ধ করে দিয়েছিলাম। আমার মনে হয়েছিল, ইসলামের পরিপূর্ণ অনুসরণ করলে, জীবনে অনেক কিছুই হারাব। বিশেষ করে আমার গার্লফ্রেন্ড আমাকে ছেড়ে চলে যাবে। আমার কাছে সে ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। আমি তাকে অনেক ভালোবাসতাম। আমার সাথে তার সম্পর্ক আর বোঝাপড়াটাও ছিল চমৎকার। অন্তত আমি তাই মনে করতাম।

www.pathagar.com

এসব বিষয় ভেবে ভেবে ইসলাম থেকে এতটাই দূরে সরে গিয়েছিলাম, আমি আর নিজেকে মুসলিম বলেও পরিচয় দিতাম না। একবার এক পার্টিতে গিয়েছিলাম। মদের আসরে কয়েক পেগ খেয়ে আমার নেশা চড়ে গিয়েছিল। বলতে গেলে আমি ছিলাম পুরোই মাতাল। এ অবস্থায়ও আমি আমার টেবিলে থাকা ৫-৬ জনকে ইসলামের কথা বলছিলাম।

জড়ানো গলায় বলছিলাম 'জানো, ইসলাম না অনেক সুন্দর একটা ধর্ম। তোমাদের সবারই কুরআন পড়া উচিত।'

'তারা বেশ আগ্রহের সাথে আমাকে বলল, 'তাই নাকি? তবে আমাদেরকে ইসলাম সম্পর্কে আরও কিছু বল দেখি।'

আমার তখন রীতিমতো পা টলছে, ঘুরছে পুরো দুনিয়া। 'দেখছো না, আমি এখন পুরো মাতাল! তোমরা নিজেরাই দেখে নিও', বলতে বলতে টেবিলে মাথা গুঁজে আমি পড়ে গেলাম।

তখন আমার জীবন ছিল এমনই। আমি মনে মনে ইসলাম খুব ভালোভাবে বিশ্বাস করতাম, কিন্তু বাস্তবে মানতে পারছিলাম না। এই যে দ্বন্দ্ব, এই যে অশান্তি, অতৃপ্তি, এর চেয়ে পীড়াদায়ক আর কিছুই হতে পারে না। আমি প্রতিদিন ঘুম থেকে উঠেই ভাবতাম, আজ থেকে আমি নিয়মিত নামায পড়ব। কিন্তু বিভিন্ন কাজে কাজে আর পড়া হতো না। গভীর এক অবসাদ আর বিষণ্নতা আমাকে পেয়ে বসেছিল। ততদিনে আমার গার্লফ্রেন্ডের সাথেও আমার সম্পর্কের অবনতি হয়েছিল। আমি দিনদিন মাদকে ডুবে গিয়ে নিজেকে কৃত্রিম স্বস্তিতে রাখার চেষ্টা করছিলাম।

এভাবেই চলল দুবছর। আমার বন্ধবী তখন ছিল স্পেনে। স্প্যানিশ ভাষার উপর সে পড়াশোনা করছিল। আমি বুঝতে পারছিলাম, ততদিনে তার সাথে অন্য এক ছেলের কিছু একটা চলছে। বুঝতে পারলেও নিজের কাছে স্বীকার করার সাহস হচ্ছিল না। তার প্রতি আমি তখনো টান অনুভব করতাম।

আমার মা-বাবা মিসর ছেড়ে পর্তুগালে চলে গেলেন। বাবা ততদিনে চাকুরি থেকে রিটায়ার্ড করেছেন। আমি আর এই দুর্বিসহ জীবন সইতে পারছিলাম না। তাই লন্ডন ছেড়ে মা-বাবার সাথে থাকা শুরু করলাম। কথা ছিল, আমার বান্ধবী আমার সাথে পর্তুগালে এসে দেখা করবে। কিন্তু দুসপ্তাহ ধরে তার সাথে কোনো যোগাযোগ নেই। না কোনো ফোন, না কোনো মেসেজ।

আমার সময়টা রীতিমতো দুর্বিষহ কাটছিল।

www.pathagar.com

একদিন বাগানে আমি হাঁটছিলাম। মনে মনে নিজেকে ধিক্কার দিচ্ছিলাম, 'এন্থনী! তুমি জানো, ইসলামই সঠিক ধর্ম। তুমি জানো, একজন মুসলিম হিসেবে তোমার পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়া দরকার, অথচ তুমি পড়ছো না। সঠিক জেনেও তুমি ইসলামের অনুসরণ করছ না। তাইতো, তোমার জীবনটা আজ এতটা বিশৃংখল ও এলোমেলো।'

আপন মনে ভাবতে ভাবতে আমি আল্লাহর কাছে বললাম, 'ইয়া আল্লাহ! আমি আর সইতে পারছি না। এমন কোনো ব্যবস্থা কর, যাতে তার ফোন পাই। কথা দিচ্ছি, আজ যদি সে আমাকে ফোন করে, তবে আজ থেকেই আমি নিয়মিত পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়ব, জীবনেও ছাড়ব না।

দুপুরে খাবারের পর আমি আবার বাগানে ফিরে গেলাম। এমন সময় আমার বাবা ডাক দিলেন, 'এই এন্থ! তোমার ফোন। সে ফোন করেছে।'

নিজের কানকেও আমি বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। বাগান থেকে, বলতে গেলে উড়ে উড়ে আমি ছুটে গেলাম ল্যান্ড ফোনের কাছে। রিসিভার কানে দিয়ে আমি হাঁপাচ্ছিলাম। মজার বিষয় হলো, সে কী বলছিল কিছুই আমার কান দিয়ে ঢুকছিল না। আমি শুধু হু হ্যাঁ করে যাচ্ছিলাম। আমার মাথায় কাজ করছিল, শপথ রক্ষা করে আমাকে এখন থেকে নিয়মিত নামায পড়তে হবে।

কথা শেষে ফোন রেখে আমি ছুটলাম বাথরুমের দিকে। গোসল সেরে দাঁড়িয়ে গেলাম নামাযে। আলহামদুলিল্লাহ, সেদিন থেকে বিনা কারণে এক ওয়াক্ত নামায আজ পর্যন্ত ছেড়ে দেইনি।

পরিশেষে আপনাদেরকে আমি কিছু কথা বলতে চাই। একজন মুসলিম ও অমুসলিমের মধ্যে বড় পার্থক্য হলো নামায। নিয়মিত পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়ার মাধ্যমেই কেবল একজন মানুষ সত্যিকারে মুসলিম হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। এ কারণেই, আমি নিজেকে সেদিন থেকে মুসলিম ভাবি, যেদিন থেকে আমি নিয়মিত নামায আদায় করছি। সেদিন থেকে নয়, যেদিন আমি শাহাদাহ উচ্চারণ করে মুসলিম হবার ঘোষণা দিয়েছিলাম।

আরেকটা বিষয় খেয়াল করলে দেখবেন, আল্লাহ আমাদের জন্য সুচিন্তিতভাবে কিছু কর্মপরিকল্পনা দিয়ে দিয়েছেন। আমরা যদি সঠিকভাবে সেগুলো অনুসরন করি, তাহলে আমাদের জীবনে সমস্যা অনেক কমে যাবে। যেদিন থেকে আমি নামায আদায় করা শুরু করলাম, সেদিন থেকে আমার জীবন বদলে গিয়েছিল। আপনি যদি বুঝে শুনে, আন্তরিকতা ও মনোযোগ নিয়ে নামায পড়েন, দেখবেন নামায আপনার জীবনকে বদলে দিয়েছে।

www.pathagar.com

আমার নিজের কথাই বলি। নামায শুরু করার পর থেকে মাদক নেয়া ছেড়ে দিয়েছিলাম। আমি জানতাম না, এটা হারাম। আমি কুরআনে পড়েছিলাম, তোমরা নেশাগ্রস্থ অবস্থায় নামাযে দাঁড়াবে না। প্রথম প্রথম ইশার নামায খুব দ্রুত পড়ে নিতাম। তারপর রাতের দিকে সিগারেটের সাথে মাদক নিতাম। আমাকে পরের দিন ফজরের জন্য খুব ভোরে উঠতে হতো। সেজন্য রাতে ঘুমাতাম তাড়াতাড়ি।

এভাবে নামাযের সময়ের দিকে খেয়াল রাখতে গিয়ে আমার মাদক নেয়া অনেক কমে গিয়েছিল। একসময় আমি ভাবলাম, নামায আর মাদক দুটো একসাথে চলতে পারে না। সিদ্ধান্ত নিয়ে একদিন আমি মাদক পুরোপুরি ছেড়ে দিলাম। আলহামদুলিল্লাহ।

পরিপূর্ণ নামায আদায় আমাকে আরও অনেক হারাম থেকে বাঁচিয়েছে। আমার বান্ধবী আমার সাথে দেখা করতে এসেছিল। আমি তাকে বললাম, 'দেখ, আমি খুব সিরিয়াসলি ইসলাম ধর্ম অনুসরণ করার চেষ্টা করছি। আমি তোমার সাথে এক কক্ষে থাকতে পারি না। তুমি, এখানে থাক। আমি অন্য বিছানায় ঘুমুতে গেলাম। বিয়ে ছাড়া আমাদের আর একসাথে থাকা সম্ভব নয়। আর আমি তোমাকে বিয়ে করতে পারি না, যদি না তুমি জেনে বুঝে ইসলাম কবুল কর।'

আমার মা একজন ক্যাথলিক খ্রিষ্টান হওয়া সত্ত্বেও, আমার এই আলাদা থাকার সিদ্ধান্তে বড় অবাক হয়েছিলেন।

প্রিয় ভাই ও বোনেরা, এই ছিল আমার ইসলামে আসার ঘটনা। আপনারা হয়তো প্রশ্ন করতে পারেন, ইসলামে এসে আমার অনুভূতি কী? আমার বিশেষ কোনো যোগ্যতা নেই। আমি অনুভব করি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা তার বিশেষ অনুগ্রহে আমাকে মুসলিম হিসেবে কবুল করেছেন। ইসলাম আমার জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে দেয়া বিরাট রহমত।

একটা উদাহরণ দিয়ে বুঝাই।

ধরুন আপনি একটা রুমে এলেন। রুম ভর্তি দামি দামি আসবাবপত্র। চারদিক খুব কারুকার্যময়। কিন্তু রুমটা অন্ধকার। আপনি এলোমেলো হাঁটছেন, অথচ পথ খুঁজে পাচ্ছেন না। হাতড়ে হাতড়ে পথ চলতে গিয়ে আপনি টেবিল চেয়ারের সাথে ধাক্কা খাচ্ছেন, ব্যাথা পাচ্ছেন। হঠাৎ করে আপনার সামনে আলো জ্বলে উঠল। সেই রুমের সুন্দর দৃশ্য, আলোকিত পথ আপনার সামনে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল।

ইসলাম গ্রহণের পর মনে হলো, আমি যেন অন্ধকারে এলোমেলো হাঁটছিলাম, দিশা পাচ্ছিলাম না। ইসলাম আলোর মশাল হয়ে আমার আশেপাশের সব আলোকিত করে দিল। আমার সামনে এখন সব পরিষ্কার, আলোয় আলোকিত।

www.pathagar.com

এটা যেন ঠিক জীবিত আর মৃতের মধ্যকার পার্থক্যের মতো। ইসলাম আপনার মনের অভ্যন্তরে প্রশান্তি এনে দেয়, যা আর অন্য কিছুতেই সম্ভব নয়।

প্রিয় ভাই ও বোনেরা আজ এই পর্যন্তই। একটু পরেই প্রশ্ন উত্তর সেশন শুরু হবে। চেষ্টা করব, আপনাদের মনের কিছু জিজ্ঞাসার উত্তর দিতে।

চার

প্রশ্ন : মুসলিম হবার জন্য কী প্রয়োজন?

আব্দুর রহিম গ্রিন : চমৎকার প্রশ্ন। অনেকেই আছেন যারা মুসলিম হতে চান, কিন্তু সাহস পান না। জানি না তারা কী ভাবেন? হয়তো ভাবেন, মুসলিম হয়ে গেলে কঠিন কঠিন সব নিয়ম মানতে হবে।

আসলে বিষয়টা খুবই সহজ। মূলত ইসলাম গ্রহণ করা মানে কিছু মৌলিক বিষয় মনে-প্রাণে মেনে নেয়া। মেনে নেয়া, আল্লাহ এক, তাঁর কোনো অংশীদার নেই এবং মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর রাসূল। প্রথমতঃ আপনি মনে-প্রাণে এই কথাগুলো মেনে নিবেন। এরপর আপনি কিছু মুসলিম ব্যক্তির সামনে শাহাদাহ উচ্চারণ করে, তাদেরকে সাক্ষী রেখে এই কথাগুলো মেনে নেয়ার স্বীকৃতি দিবেন।

উপস্থিত লোকদের সামনে শাহাদাহ উচ্চারণের সাথে সাথে আপনি মুসলিম হয়ে গেলেন। এরপরে আপনার করণীয় হলো, গোসল করে পরিষ্কার কাপড় পরা। ধীরে ধীরে আপনি পাঁচ ওয়াক্ত সালাত পড়ার নিয়ম শিখে নিবেন, যাতে তা নিয়মিত পড়তে পারেন।

এমন নয় যে, আপনি একদিনেই সব শিখে ফেলবেন। তার জন্য সময়ের প্রয়োজন। ধীরে ধীরে আপনি চেষ্টা করবেন ইসলামের বিভিন্ন নিয়ম-কানুন জানার ও মানার। ব্যস! মুসলিম হবার জন্য এটাই যথেষ্ট।

প্রশ্ন : আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার উপর বিশ্বাস রাখাই যথেষ্ট, নাকি আমল করাও জরুরি?

আব্দুর রহিম গ্রিন : খুব সুন্দর প্রশ্ন করেছেন। আমরা বলি আমাদের ঈমান থাকা জরুরি। আমরা ঈমানের অনুবাদ করি 'বিশ্বাস'। এক ভাষা থেকে আরেক ভাষায় অনুবাদের কিছু অসুবিধা আছে। অনুবাদ করে কখনোই মূল বাক্যের পুরো ভাব ও অর্থ বুঝানো যায় না। ইসলামে মূলত ঈমান বলতে বোঝায় অন্তরে বিশ্বাস স্থাপন,

www.pathagar.com

মুখে স্বীকৃতি ও কাজে বাস্তবায়ন। আল্লাহর আনুগত্য করার মধ্য দিয়ে ঈমান বাড়ে। আল্লাহর দেয়া বিধি-নিষেধ অমান্য করলে ঈমান দিনে দিনে কমে।

সুতরাং বিশ্বাস এমনই একটা জিনিস, আপনি যদি মনে-প্রাণে তা মেনে নেন, আপনার কাজে-কর্মে তার প্রতিফলন ঘটবেই। আমাদের নবি ﷺ এক হাদিসে বলেছেন, 'আল্লাহর কসম সে লোক মুমিন নয়, যার হাত ও মুখের অনিষ্ট থেকে তার প্রতিবেশীরা নিরাপদ নয়।' তার মানে কী? তার মানে নবি ﷺ বলছেন, যে ব্যক্তি মুমিন, তার চরিত্র এরকম হতে পারে না। অন্য এক হাদিসে তিনি বলেছেন, 'মুমিনের মাঝে আর যাই দোষ থাকুক না কেন, মুমিন কখনো মিথ্যেবাদী হতে পারে না।'

তার মানে বোঝা গেল– যিনি বিশ্বাসী, যিনি মুমিন, তার চরিত্রে এই ধরনের ক্রুটি থাকতে পারে না।

আরেক হাদিসে তিনি বলেছেন, মুনাফিকের লক্ষণ চারটি। যখন কথা বলে তখন মিথ্যা বলে, যখন কোনো ওয়াদা করে, তখন তা ভঙ্গ করে, তার কাছে কোনো আমানত রাখা হলে তা খেয়ানত করে এবং যখন তর্ক করে তখন খুবই উগ্র আচরণ করে।

সুতরাং যার মধ্যে এই চারটি ক্রুটির কোনো একটি থাকে, তার মধ্যে মুনাফিকের লক্ষণ আছে। আর যার মধ্যে এই চারটি গুণের সবগুলোই আছে, সে পরিপূর্ণ মুনাফিক। মুনাফিক হলো সেই ব্যক্তি, যার অন্তরে এক, বাইরে আরেক। কেউ যদি বলে থাকেন তিনি আল্লাহকে বিশ্বাস করেন, তবে অবশ্যই কাজে তার প্রতিফলন থাকবে। মুখে বলছেন বিশ্বাস করি, কাজে কর্মে বোঝার উপায় নেই; এমন হলে তিনি খাঁটি মুমিন নন। তার বিশ্বাস করার দাবি এক ধরনের মুনাফিকি।

আপনাদের একটা উদাহরণ দেই। ধরুন, আমরা যেখানে বসে আছি, সেখানে এক ভাই চিৎকার শুরু করল 'আগুন, আগুন'। আপনারা কী করলেন? আপনারা যার যার আসনে বসে রইলেন আর বললেন, 'ও আচ্ছা'। তার মানে কী বোঝা গেল? নিশ্চয় আপনারা সেই ভাইয়ের কথা বিশ্বাস করেননি। ভাবছেন তিনি একটু মজা করেছেন। যদি সত্যি সত্যি আপনারা তার কথা বিশ্বাস করতেন, তবে কী করতেন? আপনারা কি দ্রুত দৌড় দিয়ে এখান থেকে বেরিয়ে যেতেন না?

এটাই বাস্তবতা! বিশ্বাস এমনই এক জিনিস, যা আপনার কাজে-কর্মে প্রকাশ পাবে। এজন্যই অনেক বিজ্ঞ আলেম বলে থাকেন, দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত সালাত না পড়া কুফরি। এটা অনেকটা ইসলাম ত্যাগ করার স্বীকৃতি দেয়ার মতো।

www.pathagar.com

কারণ, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'ঈমান আর কুফরের মাঝে পার্থক্য হলো নামায। যে লোক নামায ছেড়ে দিল, সে কুফরি করল।'

আপনি দেখবেন, অনেকেই আছেন, যারা কথায় কথায় বলে আমি মুসলিম। মুসলিম বলতে আসলে তিনি কী বুঝাচ্ছেন? মূলত মুসলিম বলতে তিনি বুঝাচ্ছেন, তিনি কোনো দেশের, কোনো সংস্কৃতির মানুষ। তারা মুসলিম বলতে বোঝান, তারা পাকিস্তানি কিংবা সোমালি কিংবা বাংলাদেশি ইত্যাদি।

একটা মজার কথা বলি। বসনিয়ার মুসলিমদের কথা মনে আছে তো? সেই যে সার্বরা তাদের উপর অমানুষিক নির্যাতন, নিপীড়ন আর গণহত্যা চালিয়েছিল। বসনিয়ার মুসলিমদের মধ্যে বেশিরভাগই আমলের দিক দিয়ে খুবই দুর্বল ছিল।

একবার এক সাক্ষাৎকারে বসনিয়ার সেনাবাহিনীর এক মুসলিম সদস্য বলেছিলেন, 'দেখুন, আমি মুসলিম ঠিকই, তবে আমি আল্লাহ খোদায় বিশ্বাস করি না। আমি মূলত নাস্তিক'।

এ কথা শুনে আপনাদের হয়তো হাসি পাচ্ছে। ভাবছেন একদিকে মুসলিম আবার অন্যদিকে নাস্তিক; দুটো এক হয় কী করে? মূলত তিনি মুসলিম বলতে তার জাতিসত্ত্বাকে বুঝিয়েছেন।

অনেক মুসলিমকে পাবেন যারা মাদক ব্যবসাসহ আরও নানা অপরাধমূলক কর্মকান্ডের সাথে জড়িয়ে পড়েছেন। অথচ তাদের কারও কারও মুখে দাড়ি আছে, আবার কেউবা হিজাবও পালন করেন। অনেকেই দাড়ি রাখেন, হিজাব পালন করেন; কারণ, এটা তদের সংস্কৃতির একটা অংশ।

অনেক সৌদি নারীদের কথা শোনা যায়, যারা বিদেশগামী প্লেনে উঠে তাদের হিজাব খুলে ফেলেন। আপনি তাদের জিজ্ঞাসা করলে তারা বলেন, 'এটা আমাদের সৌদি পোশাক।' হয়তো তাদের জানাও নেই, ইসলাম হিজাব সম্পর্কে কী বলে। তারা এতটুকুই জানেন, এটা তাদের সংস্কৃতির অংশ।

এরকম অনেক অনেক মুসলিমদের পাবেন যারা বলে, 'আমি মুসলিম'। মূলত এটা দ্বারা নিজেরা কোনো দেশের কিংবা কোনো সংস্কৃতির মানুষ, সেটাকেই তারা বুঝায়। সুতরাং বোঝা গেল কেউ যদি মনে-প্রাণে বিশ্বাস করে থাকেন, তবে তার আমলও সে অনুযায়ী ভালো হবে।

প্রশ্ন : ইসলাম গ্রহণের পর থেকে প্রায় এক বছর হতে চলল, আমার মা-বাবা আমার সাথে কথা বলছেন না। আমি তাদের সাথে একত্রেও থাকতে পারছি না।

www.pathagar.com

আমি জানি, একজন মেয়ে হিসেবে ইসলামি বিধান অনুযায়ী একা একা থাকা উচিত নয়। অন্যদিকে, ইসলামে আত্মীয়তার সম্পর্ক ত্যাগ করা নিষেধ। এ অবস্থায় আমার কী করণীয়?

আব্দুর রহিম গ্রিন : বোন একা থাকার বিষয়ে বলি। আপনার সমস্যা থাকলে আপনি একা একাও থাকতে পারেন। কোনো মেয়ের জন্য একাকী বসবাস করা ইসলামে নিষিদ্ধ নয়।

মা-বাবার সাথে সমস্যা কেন্দ্রিক আমার অভিজ্ঞতার কথা আপনাদের বলি।

ইসলাম গ্রহণের পর আমি আমার মা-বাবাকে ইসলামের কথা বলতে থাকি। আমার নিজের কাছে মনে হয়েছিল, ইসলাম এত চমৎকার একটি ধর্ম, এত সুন্দর তার বিধিবিধান, সঠিকভাবে উপস্থাপন করলে যেকোনো মানুষেরই সেটি ভালো লাগার কথা, গ্রহণ করার কথা।

কিন্তু বাস্তবতা হলো, মা-বাবা আমার ইসলাম গ্রহণের বিষয়টিকে ভালোভাবে নেননি। আমি ছিলাম পার্টি পাগল মানুষ। আমি খুব ভালো নাচতেও পারতাম। ভালোভাবে ইসলাম অনুসরণ করার পর থেকে আমি মদ খাওয়া, পার্টিতে যাওয়া ছেড়ে দেই। খাবার দাবারের ক্ষেত্রেও আমি হালাল খাবার বেছে নেই।

ধর্মকে এতটা কড়াকড়িভাবে অনুসরণ করতে দেখে আমার মা একদিন আমাকে বললেন, 'এন্থু! তুমি যখন এতই ধার্মিক হতে চাইছ, তবে ঘর বাড়ি ছেড়ে সন্ন্যাস জীবন বেছে নিলেই পার।'

আমি উত্তর দিলাম, 'এটা ইসলামের শিক্ষা নয়, মা। ইসলাম বলে, তুমি দুনিয়ায় থেকে স্বাভাবিক জীবনযাপন কর। এর মধ্যেই স্রষ্টার বিধি নিষেধ মেনে চল এবং তার অনুসরণ কর। আমার ধর্ম বলে না, তুমি ঘর বাড়ি ছেড়ে পাহাড়ে কিংবা জংগলে চলে যাও। এটা ইসলামি শিক্ষার বিপরীত।'

মা বললেন, 'ঠিক আছে, তুমি যেহেতু আমাদের সঙ্গ পছন্দ করছ না, আমাদের খাবার-দাবার, উৎসব-অনুষ্ঠান সবকিছুকেই যেহেতু তোমার অপছন্দ, আমরা ঠিক করেছি তোমাকে আমাদের সম্পত্তির উইল থেকে বাদ দিব। তুমি এর এক কানাকড়িও পাবে না।'

'ঠিক আছে, তবে তাই হোক' আমি উত্তর দিয়েছিলাম। আমি মায়ের কথায় বিন্দুমাত্র ঘাবড়ে যাইনি। আমার বিশ্বাস ছিল, আল্লাহর উপর ভরসা রাখলে আমার রিযিকের অভাব হবে না।

www.pathagar.com

বাবার অনুভূতিও ছিল মায়ের মতো। বাবা আমাকে এ কথাও বলেছিলেন, 'তোমার লন্ডনে ফিরে যাওয়াই ভালো। সেখানে তুমি তোমার নিজের মতো করে চলতে পারবে। আমাদের সাথে তোমার ঠিক মিলবে না।'

বুঝতেই পারছেন, মা-বাবা আমার উপর মোটেও সন্তুষ্ট ছিলেন না।

আমি বিয়ে করেছিলাম। বিয়ের পরে মায়ের সাথে সম্পর্ক আরও খারাপ হয়ে গিয়েছিল। একদিন মা কথায় কথায় নবি মুহাম্মাদ ﷺ সম্পর্কে আপত্তিকর কথা বলেছিলেন। আমি আর নিজেকে সামলাতে পারিনি। প্রচণ্ড রাগে ক্ষোভে ফেটে পড়েছিলাম। এমনকি হাতের কাছে থাকা দুয়েকটা জিনিসও আছাড় দিয়ে ভেঙে ফেলেছিলাম।

পরের দিনই আমি বাসা ছেড়ে চলে যাই। এক বছর পর্যন্ত আমাদের কথা বলা বন্ধ ছিল।

ভাবতে পারেন, কখন এ অবস্থার পরিবর্তন হলো?

যখন আমার ছেলে আব্দুল্লাহর জন্ম হলো, তখনই পরিবেশটা অনেক সহজ হয়ে এল। হাজার হোক, আব্দুল্লাহ তার নাতি। নাতি-নাতনীর প্রতি দাদা-দাদীর ভালোবাসা অন্যরকম। চাইলেও দূরে সরিয়ে রাখা যায় না। প্রিয় বোন, আমার মনে হয় আপনার যদি বিয়ে হয় এবং সন্তান হয়, তখন আপনার মা-বাবা আর দূরত্ব রাখতে পারবেন না। আর এরপরেও যদি তারা আপনার কাছে না আসেন, তবে বুঝতে হবে তাদের হৃদয়টা পাথর দিয়ে গড়া।

আমি ইসলাম গ্রহণকারী অনেক ভাইবোনদের ক্ষেত্রেই এমনটা হতে দেখেছি। আমার খুব ঘনিষ্ঠ এক বন্ধুর স্ত্রী, যিনি অন্য ধর্ম থকে মুসলিম হয়েছিলেন, তাকেও একই ধরনের পরিস্থিতির মুখোমুখী হতে হয়েছিল। তার মা তার সাথে কথা বলা বন্ধ করে দিয়েছিলেন। কোনোভাবেই সম্পর্কটা জোড়া লাগছিলো না। তারপর যখন তাদের প্রথম বাচ্চাটা হলো, আস্তে আস্তে সব সহজ হয়ে এল।

আমার মা-বাবার সাথে আমার সম্পর্ক এখন অতীতের যেকোনো সময়ের চেয়ে চমৎকার। আমি সবসময় চেষ্টা করেছি, ইসলামের সৌন্দর্য তাদের সামনে তুলে ধরতে। আমার আচরণ দিয়ে উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছি, ইসলাম মা-বাবার সাথে কী চমৎকার ব্যবহার করার কথাই না বলে!

আমি আমার মাকে একটা বই দিয়েছিলাম। বইয়ের নাম 'মা'। সে বইতে কুরআন হাদিসের পাশাপাশি অনেক সুন্দর সুন্দর কবিতা ছিল, যাতে একজন মানুষ বুঝতে পারে, ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী মায়ের সাথে কেমন ব্যবহার করতে হবে।

www.pathagar.com

একটা হাদিসে এসেছে, এক লোক এসে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলেন, 'হে রাসূল! কে আমার কাছ থেকে সবচেয়ে সুন্দর ব্যবহার পাবার অধিকারী?' তিনি বললেন, 'তোমার মা।' লোকটি আবার জিজ্ঞাসা করল 'তারপর কে?' তিনি বললেন, 'তোমার মা'। লোকটি আবার জিজ্ঞাসা করল 'তারপর কে?' তিনি বললেন 'তোমার মা'। লোকটি পুনরায় প্রশ্ন করলে তিনি উত্তর দিলেন, 'তোমার বাবা'।

অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ বোঝাতে চেয়েছেন, তুমি কখনোই তোমার মায়ের ঋণ শোধ করতে পারবে না। যদি কেউ তার বাবাকে দাস হিসাবে পায়, আর নিজের টাকা দিয়ে বাবাকে মুক্ত করে, সেক্ষেত্রে বলা যেতে পারে, সে তার বাবার ঋণ শোধ করতে পেরেছে। কিন্তু মায়ের ঋণ? এ জনমেও শোধ করা সম্ভব নয়।

আরেকটি হাদিসে এসেছে, উমর (রা) তখন ছিলেন খলিফা। এক লোক তার মাকে কাঁধে বয়ে নিয়ে হজ্ব করে এসেছেন। তিনি খলিফাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'হে উমর! তুমি কি মনে কর আমি আমার মায়ের ঋণ শোধ করতে পেরেছি?' হযরত উমর (রা) উত্তর দিলেন, 'তোমাকে জন্মদানের সময় ব্যথায়, যন্ত্রণায় ঝরে পড়া মায়ের এক ফোটা অশ্রুর ঋণও তুমি শোধ করতে পারনি।'

এই হলো ইসলামের শিক্ষা। আমি মাকে বললাম, 'তাহলে, মা তুমি কী করে বলতে পার– ইসলাম নারীদের কোনো মর্যাদা দেয়নি!'

আপনাদের সবাইকে বলি, কোনো অবস্থাতেই আত্মীয়তার সম্পর্ক বিনষ্ট করা যাবে না। এমনকি যদি সন্তান জন্মদানের পরেও আপনার মা-বাবা আপনাকে সহজভাবে গ্রহণ না করে। সর্বাবস্থায় মা-বাবার সাথে সুন্দর আচরণ করে যেতে হবে। হালছাড়া যাবে না। সম্ভব হলে তাদেরকে ফোন দিবেন, সময়ে সময়ে মেসেজ পাঠাবেন, তাদের সাথে দেখা করতে যাবেন।

তারা খুশি হয়, এমন যেকোনো কিছু করার চেষ্টা করবেন; যদি কাজটা হারাম না হয়। এমন যদি হয়, কাজটা সুন্নাত কিংবা মুস্তাহাব, তাদের মন জয় করতে প্রয়োজনে সেটিও ছেড়ে দিন। শুধু খেয়াল রাখবেন, কোনো অবস্থাতেই যাতে ফরজ তরক না হয়, হারাম কোনো কাজে জড়িয়ে না পড়েন।

বোন, ধৈর্য ধরুন, চেষ্টা চালিয়ে যান। আর আল্লাহর কাছে দোয়া করুন। আমরাও দোয়া করি, যাতে এই বোনের মা-বাবার মনকে আল্লাহ নরম করে দেন, তাদেরকে ইসলামের জন্য কবুল করেন। আমিন।

প্রশ্ন : একজন মুসলিম মেয়ে নিয়মিত নামায পড়েন, সিয়াম পালন করেন। কিন্তু তিনি হিজাব পরিধান করেন না। তিনি কি খুব খারাপ মুসলিম? হিজাব পালন না করাটা আসলে কত বড় গুনাহ?

www.pathagar.com

আব্দুর রহিম গ্রিন : কখনো কখনো এমন প্রশ্নের উত্তর দেয়া আসলেই কঠিন। প্রত্যেকের পরিবেশ, পরিস্থিতি, প্রেক্ষাপট আলাদা। আমি জানি না, এই বোন কী ধরনের পরিবেশে আছেন।

আমি ব্যাপারটাকে একটু অন্যভাবে ভাবতে বলি। আপনারা এভাবে ভাববেন না, হিজাব না পরা কত বড় গুনাহ। বরং এভাবে ভাবুন, আল্লাহর হুকুম পালন করা কত বড় সাওয়াবের কাজ। আমাদের আসলে এভাবেই চিন্তা করা উচিত। আমাদের ভাবা উচিত, আল্লাহর বিধান অমান্য করা আমার জন্য আসলে কতটা কল্যাণকর।

আল্লাহ আমাদের যা-ই করতে বলেছেন, সবই আমাদের কল্যাণের জন্য। যদিও আমরা অনেক সময় সেটি বুঝতে পারি না। আমাদের উচিত আল্লাহ যা করতে বলেছেন, তা বিনাবাক্যে মেনে নেয়া, পালন করার চেষ্টা করা। আল্লাহর বিধান অমান্য করা অনেকটাই আল্লাহকে অবিশ্বাস করার শামিল। এর দ্বারা বোঝা যায়, আল্লাহ যে আমাদের চেয়ে ভালো বোঝেন, তিনি যা বলেছেন তা যে আমাদের কল্যাণের জন্য... আসলে তা মন থেকে আমরা বিশ্বাস করি না।

আমি জানি, আমাদের মানবীয় দুর্বলতা থেকে আমরা আল্লাহর বিধান অমান্য করি। তবুও ভালো করে ভেবে দেখুন, আপনি কেন আল্লাহর নির্দেশ মানছেন না? কেন আপনি হিজাব পালন করছেন না, কিংবা সময়মতো নামায পড়ছেন না?

অনেকেই আছেন অফিসে নামায পড়েন না। অফিস শেষে বাসায় ফিরে একসাথে সারাদিনের নামায পড়ে নেন। কেন ভাই, অফিসে নামায পড়লে সমস্যা কী? আসলে আপনি নামায পড়ছেন না– কারণ, আপনার সেই আন্তরিক ইচ্ছাটাই নেই। আপনার ইচ্ছা থাকলে আপনি আপনার টেবিলের পাশেই জায়নামায বিছিয়ে নামায পড়ে নিতে পারেন।

এটা আমাদের ঈমানের বিষয়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আমরা আল্লাহর নির্দেশ মানার চেয়ে কে কী ভাববে, সেটা নিয়েই মাথা ঘামাই বেশি।

কোনটা বেশি গুনাহের কাজ, আমি সে ব্যাখ্যায় যেতে চাই না। বরং আমি মনে করি, আপনার পক্ষে যতদূর সম্ভব আল্লাহর বিধি-বিধান মানার চেষ্টা করুন। কারণ, আমরা জানি, আল্লাহকে ফাঁকি দেয়ার কোনো সুযোগ নেই। আমরা যতই অজুহাত দেখাই না কেন, আল্লাহ তায়ালা আমাদের অন্তরের খবর খুব ভালো করেই জানেন। তিনি জানেন, কোনটা আমাদের আসলে সমস্যা আর কোনটা অজুহাত।

www.pathagar.com

আরেকটা বিষয়। দয়া করে কেউ অন্যের সম্পর্কে নেতিবাচক মন্তব্য করবেন না। অন্যের আমলের বিচার করতে বসবেন না। এমন মন্তব্য করবেন না, 'ঐ মেয়ে হিজাব পরে না, তাই তার সব আমল বরবাদ। তার নেক আমল আল্লাহর দরবারে কবুল হবে না।' আপনি আমি তার পরিবেশ পরিস্থিতি জানি না। হতে পারে, তিনি এমন অবস্থায় আছেন, যার কারণে তার জন্য হিজাব মানা সম্ভব হচ্ছে না। হতে পারে হিজাব পালনের জন্য তার সহায়ক পরিবেশ দরকার।

সুতরাং, আমি মনে করি প্রত্যেকে যার যার অবস্থান থেক যতদূর পারেন আল্লাহর নির্দেশ মানার চেষ্টা করুন, তাঁর নিষেধ করা কাজ থেকে দূরে থাকুন।

জাযাকুমুল্লাহু খাইর।

পরিচিতি

ব্রিটিশ নাগরিক আব্দুর রহিম গ্রিনের জন্ম ১৯৬২ সালে, তানজানিয়ায়। ইসলাম গ্রহণের আগে তার পুরো নাম ছিল Anthony Vatswaf Galvin Green। ক্যাথলিক স্কুলে পড়তে গিয়ে খ্রিষ্টধর্মের নানা নিয়মকানুন, বিধিবিধান নিয়ে তার মনে প্রশ্ন জাগে। একসময় তৎকালীন হিপি, পাঙ্ক সংস্কৃতিতে প্রভাবিত হয়ে তিনি হিপি হয়ে যান।

গ্রিন রহিম ইসলাম গ্রহণ করেন বেশ নাটকিয়ভাবে। ইসলাম গ্রহণের পর তিনি দাওয়াইর কাজে নিজেকে ব্যাপৃত রেখেছেন। তিনি ২০০৯ সালে Islamic Education & Research Academy (IERA) নামে একটি দাওয়াহ একাডেমি প্রতিষ্ঠা করেন।

ব্যক্তিগত জীবনে গ্রিন ১০ সন্তানের জনক। ইসলাম গ্রহণের কাহিনি নিয়ে গ্রিন এক লেকচার দেন ছাত্র-ছাত্রী ও তরুণদের উদ্দেশ্যে। এই কাহিনি সেই লেকচারেরই রূপান্তর।

www.pathagar.com

রহস্যময় কুরআন

ড. জেফরি ল্যাং

এক

উপস্থিত ভাই ও বোনেরা, আপনাদের সবাইকে সালাম। আপনাদের সবার উপর আল্লাহ তায়ালার রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক।

যেকোনো ঘটনা শুরু করার আগে একটা ভূমিকা থাকে। আমি নিজের পরিচয় দিয়ে শুরু করতে চাই।

আমি ড. জেফরি ল্যাং। আমেরিকার কানসাস ইউনিভার্সিটির একজন প্রফেসর। মূলত অংক পড়ানোই আমার কাজ। তবে এখানে এসেছি আপনাদের সাথে আমার ইসলাম গ্রহণের ঘটনা শেয়ার করতে।

অনেকের ধারণা, আমি একজন খ্রিষ্টান থেকে ধর্মান্তরিত মুসলিম। মূলত আমি খ্রিষ্টান ছিলাম না। আমি ছিলাম স্রষ্টার অনস্তিত্বে বিশ্বাসি একজন নাস্তিক।

আমার জন্ম আমেরিকার কানেক্টিকাটের এক রোমান ক্যাথলিক পরিবারে। জীবনের প্রথম ১৮ বছরের অধিকাংশ সময়ই কেটেছিল ক্যাথলিক স্কুলে। স্কুলে থাকতেই আমার মনে অনেক প্রশ্নের উদয় হতো, যার কোনো সদুত্তর খুঁজে পেতাম না। দিনে দিনে রোমান ক্যাথলিক চার্চসহ যত প্রতিষ্ঠান ছিল, সবকিছুর উপর আমার অনীহা চলে এসেছিল।

বয়স ১৮ হতেই আমার মনে হয়েছিল, 'ঈশ্বর বলে আসলে কেউ নেই। ঈশ্বর বলে যদি কেউ থাকেন, তিনি যদি দয়ালুই হবেন, তবে কেন পৃথিবী জুড়ে এত অশান্তি, হতাশা, দুঃখ, কষ্ট? কেন তিনি আমাদের সবাইকে স্বর্গে তুলে নিয়ে যান না? কেন তিনি আমাদেরকে এত দুঃখ ভোগ করার জন্য পৃথিবীতে পাঠালেন?'

www.pathagar.com

একসময় রোমান ক্যাথলিক ধর্ম ছেড়ে আমি পুরদস্তুর নাস্তিক হয়ে যাই।

শিক্ষা জীবনে আমি পারডু ইউনিভার্সিটি থেকে প্রথমে মাস্টার্স ও পরে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করি। পড়া শেষে সানফ্রান্সিস্কো ইউনিভার্সিটিতে যোগ দিই শিক্ষক হিসেবে। সেখানে অনেক মুসলিম ছাত্রের সাথে আমার পরিচয় হয়। অনেকের সাথে আমার ধর্ম নিয়ে বিভিন্ন সময়ে আলাপ আলোচনা হতো।

ইউনিভার্সিটিতে প্রায় সময় আমি আমার রুম খোলা রেখে যেতাম। আমি ছিলাম আত্মভোলা টাইপের। আমি জানতাম, দরজায় তালা লাগিয়ে গেলে আমি নির্ঘাত চাবি হারিয়ে ফেলব। তার চেয়ে এই ভালো, রুম খোলা রাখা; যাতে যখন তখন নির্বিঘ্নে আসা-যাওয়া করা যায়। আমার ছাত্র-ছাত্রীরাও এসে বিভিন্ন সময় তাদের এসাইনমেন্ট জমা রেখে যেত।

একদিন আমার রুমে ঢুকে দেখি টেবিলের উপর একটা সবুজ মলাটের বই রাখা। ভাবলাম, হয়তো কোনো ছাত্র বইটা ভুলে রেখে গেছে। কাছে গিয়ে খেয়াল করে দেখি, বইটার উপরে লেখা পবিত্র কুরআন। সাথে ইংরেজি অনুবাদ।

প্রথমটায় আমি কিছুটা অবাকই হয়েছিলাম, 'কী ব্যাপার! এই জিনিস কে এখানে রেখে গেল'। একটু ভাবতেই আঁচ করতে পারলাম, আমার পরিচিত এক মুসলিমই বোধহয় রেখে গেছেন। কিন্তু তিনিও বা কী বুঝে আমাকে কুরআন দিয়ে গেলেন? তিনি কি আমাকে তার ধর্মে দীক্ষিত করতে চাইছেন? অথচ তিনি নিজেইতো তেমন একটা ধার্মিক নন।

পরে ভাবলাম, আমি নিজে একজন সন্দেহবাদী মানুষ। তাই হয়তো আমার সাথে তিনি ইসলাম নিয়ে সরাসরি কোনো কথা বলতে চাইছেন না। হয়তো নিরবেই বলতে চাইছেন, 'আপনি তো আমাদের ধর্ম নিয়ে কথা বলেন। এই নিন আমাদের কুরআন, এটা পড়লেই আমাদের ধর্ম সম্পর্কে আপনার ভালো একটা ধারণা হবে।'

আমি তার সাথে দেখা হলে এ নিয়ে আর উচ্চবাচ্য করিনি। আমি আমার ফ্ল্যাটের বুক শেলফে কুরআনের কপিটা রেখে দিয়েছিলাম।

দুসপ্তাহ পরের কথা। পারডু ইউনিভার্সিটিতে থাকতেই আমার সব বই সানফ্রান্সিস্কোর উদ্দেশ্যে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। ততদিনে বইগুলো এসে পৌছায়নি। তাই আমার কাছে পড়ার মতো তেমন কিছুই ছিল না। একটা ম্যাগাজিন ছিল, তাও দু-দুবার পড়া শেষ।

এক রাতে ফ্ল্যাটে বসে অলস সময় কাটাচ্ছিলাম। টিভি দেখতে বসেও একঘেঁয়েমি লাগছিল। তাই বন্ধ করে দিলাম। তাহলে কী করা যায়? আমি এদিক-সেদিক তাকালাম। হঠাৎ করে টেবিলের এক কোণে রাখা কুরআনের অনুবাদটা চোখে পড়ল।

www.pathagar.com

আমি উদাসীন ভঙ্গিতে কুরআনটি হাতে তুলে নিলাম। জানি, এই বইয়ের কয়েক পৃষ্ঠা পড়লেই আমার একঘেঁয়েমি চলে আসবে। এমনকি, পড়তে পড়তে ঘুমিয়েও পড়তে পারি। হাতে যখন কিছুই করার নেই, দু-এক পৃষ্ঠা উল্টেই দেখা যাক।

কুরআন সম্পর্কে আমার কোনো ধারণাই ছিল না। এর আগেও আমি বেশকিছু ধর্মগ্রন্থ পড়েছিলাম। সেগুলোতে সাধারণত নানা গল্প, পৌরাণিক ঘটনা থাকে। ভাবলাম এটাও হয়তো তেমনই কিছু একটা হবে। আমি আস্তে আস্তে পাতা উল্টানো শুরু করলাম। প্রথম পৃষ্ঠা, প্রথম সূরা। সূরা ফাতিহা।

শুরুটা এরকম, 'সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য। তিনি বড় দয়ালু ও দয়াময়। তিনি বিচার দিবসের মালিক।'

আমি ভাবলাম, খারাপ কী? এটা বোধহয় বাইবেলের Psalm তথা গীত সংহিতার মতো। মুসলমানরা যাকে জবুর বলে চিনে। এই Psalm তথা গীত সংহিতা

কিন্তু এই বইয়ের ধরন-ধারণ তো পুরোপুরিই আলাদা। দেখে মনে হচ্ছে, ঈশ্বর এই গ্রন্থের লেখককে সরাসরি কিছু বলছেন, আর তিনি ঈশ্বরের ভাষাতেই তা বর্ণনা করছেন। এর মাঝে কোনো বিকৃতি কিংবা কারও নিজস্ব কোনো বক্তব্য নেই। সত্যিকারের ওহীর বাণী যেমন হবার কথা, ঠিক তেমনই।

কুরআন পড়লে মনে হয় যে, পাঠকের সাথে কোনো সংলাপ চলছে। এক জায়গায় কিছু প্রশ্ন করা হচ্ছে, মনে জিজ্ঞাসা জাগিয়ে তোলা হচ্ছে, আবার অন্যখানে তার জবাব দিয়ে দেয়া হচ্ছে। আবার কিছু প্রশ্ন, আবার উত্তর। কুরআন তার পাঠককে কখনই অমনোযোগী হতে দেয় না, নিজের মধ্যে ডুবিয়ে রাখে। এ এমনই এক রহস্যময় কিতাব!

কুরআন পড়তে পড়তে আমার অনুভূতি ছিল এমনই। একটু পড়ি... হয়তো মনে একটা প্রশ্ন জাগে। কিছুদূর গেলে আবার তার জবাব পেয়ে যাই। আমি কুরআন পড়ে চললাম। এই বইয়ের কথা বলার ধরণ আমাকে মুগ্ধ করেছিল।

পড়তে পড়তে আমি সেখানটায় চলে এলাম, যেখানে মানব সৃষ্টি নিয়ে কথা বলা হয়েছে। এটা ছিল সূরা বাকারার ৩০ নং আয়াত। শুরুটা এমন '...আর যখন তোমার রব ফেরেশতাদের মাঝে ঘোষণা করলেন, আমি পৃথিবীতে খলিফা (প্রতিনিধি) পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছি...' তার মানে সৃষ্টিকর্তা মানুষ বানিয়ে দুনিয়াতে পাঠাচ্ছেন বিশেষ দায়িত্ব দিয়ে।

আমার এত দিনকার জেনে আসা শিক্ষা ভালোই ধাক্কা খেল। এ কেমন কথা? কুরআন বলছে মানুষকে উদ্দেশ্যমূলকভাবেই দুনিয়াতে পাঠানো হয়েছে এক সুমহান দায়িত্ব দিয়ে। অথচ বাইবেল বলছে, আদি পিতা আদমের পাপের শাস্তিস্বরূপ মানুষকে দুনিয়ায় পাঠানো হয়েছে।[১] দুনিয়ার মানুষের আগমনের কারণ, এভাবেই তো বুঝে এসেছি এত দিন। না, এই বইয়ের লেখক বড় ধরনের ভুল করছেন।

তারপর আমি পড়ে চললাম, 'তখন ফেরেশতারা বলল, 'আপনি কি এমন কাউকে পাঠাতে চাইছেন যারা পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করবে, রক্তারক্তি করবে? আমরা ফেরেশতারাই তো আছি আপনার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করতে।'

আমি রীতিমতো চমকে উঠলাম। আমার ভেতরকার সেই পুরোনো রাগ-ক্ষোভ আবার ফিরে এল। ফেরেশতারা যেন ঈশ্বরকে বলতে চাইছিলেন- 'আপনি এই নিকৃষ্ট সৃষ্টি বানাতে চান, পাঠাতে চান দুনিয়ায় যারা খুনোখুনি আর রক্তারক্তি করবে, পৃথিবীটা হানাহানিতে ভরিয়ে দিবে? যাদের মননে আছে হিংস্রতা, বিধ্বংসী মানসিকতা।

www.pathagar.com

অথচ আমরা তো এসব নেতিবাচক গুণাবলি থেকে মুক্ত। আমরাই তো আপনার গুণগান গাইছি। তবে কেন শুধু শুধু পৃথিবীতে মানুষ পাঠানো?

আরে! এ প্রশ্ন তো আমারও। আমি নিশ্চিতভাবেই জানতাম, এই প্রশ্নের কোনো জবাব নেই। এই প্রশ্নই তো আমার জীবন, আমার শৈশব অন্য রকম করে গড়ে তুলেছিল।

মনে হলো, এই বইয়ের লেখক তো আগ বাড়িয়ে আত্মহত্যা করতে যাচ্ছেন। নিজ থেকে এমন প্রশ্ন সামনে নিয়ে এলেন, যার কোনো উত্তর নেই। যে প্রশ্ন মানুষের মনে সন্দেহ, সংশয় ও অবিশ্বাস বাড়িয়ে দেয়। আমি বুঝলাম না, মানব সভ্যতার ধর্মতত্ত্বের ইতিহাসের সবচেয়ে জটিল, সবচেয়ে ভয়ংকর এই প্রশ্ন লেখক কেন এভাবে করতে গেলেন?

এ এমন এক প্রশ্ন, যার কোনো যুক্তিসঙ্গত জবাব কারও কাছে নেই।

দুই

আমার সারা জীবন বয়ে বেড়ানো এই প্রশ্নের উত্তর কী হতে পারে? কৌতূহলী মন নিয়ে আমি আরও বেশি কুরআনের মাঝে ডুবে গেলাম। আরও বেশি কুরআন আমাকে নিজের মাঝে আকৃষ্ট করে রাখল। যখন কুরআন পড়া শেষ হলো, স্রষ্টার অবিশ্বাসের পেছনে আমার এত দিনকার যত যুক্তি, যত ভাবনা- সব ধূলিস্মাৎ হয়ে গেল। ঈশ্বরে অবিশ্বাস করার মতো আমার কাছে আর কোনো যুক্তিই অবশিষ্ট রইল না।

তবে অবিশ্বাসী হবার যুক্তিগুলো খণ্ডন হলেও এর মানে এই না, আমি ঈশ্বরে বিশ্বাসী ধার্মিক হয়ে গেলাম।

আমার মেয়ের সাথে একদিন আমি বাগানে হাঁটছিলাম। সে আমাকে জিজ্ঞাসা করল 'আচ্ছা বাবা! কুরআন পড়ে তোমার নাস্তিকতার পেছনের যুক্তিগুলোর উত্তর পেয়েছ, তা না হয় বুঝলাম। কিন্তু ঠিক কবে থেকে তুমি ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস করা শুরু করলে?'

খুবই বুদ্ধিদীপ্ত প্রশ্ন। কারণ, সে বুঝতে পেরেছিল, কোনো কিছুর বিরুদ্ধে যুক্তি খুঁজে না পাওয়ার মানে এই নয় যে, আমি সেটা বিশ্বাস করি। দুটো সম্পূর্ণ আলাদা জিনিস।

আমি উত্তর দিলাম, 'মা রে! ওইভাবে আসলে বলা মুশকিল। তবে কুরআন পড়া শুরু করার পর থেকে নাস্তিকতার যে দুর্গ আমি গড়ে তুলেছিলাম, যে দেয়াল আমি তৈরি করেছিলাম সযত্নে, সচেতন মনে... এক এক করে তার সব ইট খসে পড়েছে।

www.pathagar.com

দিকে দিনে নাস্তিকতার উপর বিশ্বাস আমার দুর্বল হয়ে পড়ল। যত বেশি নাস্তিকতার উপর আস্থা হারাতে থাকলাম, তত বেশি কুরআন আমার মনের উপর, চিন্তা-চেতনার উপর প্রভাব বিস্তার করতে থাকল।'

কুরআন লেখা হয়েছে খুবই চমৎকারভাবে। শুরুর দিকে অনেক নিয়মকানুন, আইন-কানুনের বর্ণনা। মাঝখানে মজার মজার সব ঘটনা, সুন্দর সুন্দর সব উপমা আর রূপক কথামালা। শেষের দিকে চমৎকার বর্ণনা আর অনুপম ভাষাশৈলি পাঠকের মনে অনুভূতির ঝড় তোলে। থরথর আবেগে বিস্ফোরণমুখ হয়ে ওঠে তার সমস্ত সত্তা, সমস্ত হৃদয়। এত চমৎকার, এত দারুণ, এত মনোমুগ্ধকর সে অনুভূতি! আমার মনের ভেতরকার অবিশ্বাসের দেয়াল কী করে যে ভেসে গেল, আমি নিজেও টের পাইনি। পড়তে পড়তে আমার ভেতরটা এক স্বর্গীয় অনুভূতিতে আচ্ছন্ন হয়ে উঠেছিল।

আমার মনে পড়ে, আমি যখন সূরা দোহা শেষ করি, 'শপথ আলোকজ্জ্বল প্রভাতের, শপথ রাতের অন্ধকারের। তোমার প্রভু তোমাকে ভুলেও যাননি, তোমার থেকে মুখও ফিরিয়ে নেননি... তুমি তো পথহারা ছিলে, তিনি তোমাকে পথ দেখিয়েছেন...' আমি প্রায় বিশ মিনিট শিশুর মতো কেঁদেছিলাম। মনে হচ্ছিল এ যেন আমারই কথা, এ যেন আমাকেই উদ্দেশ্য করে বলা। অথচ আমি ছিলাম ঈশ্বরে অবিশ্বাসী নাস্তিক। আমি কোনোভাবেই এ অনুভূতি ভুলতে পারিনি। সর্বক্ষণ আমার মনের ভেতর গুনগুন গুঞ্জরণ বয়ে চলছিল।

কুরআন পড়া শেষে নাস্তিকতা নিয়ে দ্বিধা চরম রূপ ধারণ করল। কিন্তু আমি জানতাম না, আমার এখন কী করা উচিত।

কয়েক সপ্তাহ কেটে গেল। কুরআনের প্রভাবে আমার মন-মস্তিষ্ক ও হৃদয় আচ্ছন্ন। কখনো আমি ঘুমাতে পারতাম না। কখনো আমি এলেমেলো উদাসিন হাঁটতাম। কুরআনের প্রশ্ন, কুরআনের বক্তব্য প্রতিনিয়ত আমাকে ভাবিয়ে তুলত। নিজের কাছে নিজেকেই অচেনা লাগত। ভাবতাম, আমি তো একজন নাস্তিক, অন্তত বাইরের পৃথিবীর সবাই তাই জানে। আমার তো এমন অনুভূতি হবার কথা নয়।

মনের এই অবস্থা নিয়ে কারও সাথে আলাপ করা দরকার, শেয়ার করা দরকার। কিন্তু আমি কার কাছে যাব?

যে মুসলিম পরিবারের সাথে আমার পরিচয় ছিল, তাদের সাথেও কথা বলতে পারছিলাম না। কারণ, তাদের নিজেদেরই ইসলাম নিয়ে জ্ঞান অত গভীরে ছিল না। আমি শুনেছিলাম ক্যাম্পাসে মুসলিমদের মসজিদ আছে। ভাবলাম, সেখানে গিয়ে আলাপ করা যেতে পারে।

www.pathagar.com

অনেক আগে আমার এক ইহুদি ছাত্রীর সাথে, একবার চার্চের পাশ দিয়ে হেঁটে আসছিলাম। সে আমাকে বেইজমেন্টের একটা জায়গা দেখিয়ে বলেছিল, 'এর নিচে মুসলিমদের মসজিদ। তারা ওখানে প্রার্থনা করে।'

আমি নিচে তাকালাম। জায়গাটা চার্চের সিঁড়ি বেয়ে অনেক নিচে। কিছুটা অন্ধকার।

আমার সেই পুরোনো কথা মনে পড়ে গেল। ভাবলাম, সেখানে গিয়ে মুসলিমদের সাথে আলাপ করি। হতে পারে, তাদের সাথে কথা বলে এমন কোনো উত্তর পাব, যাতে আমার মনে সন্তুষ্টি আসবে।

আমি চিন্তা করছিলাম রবিবারে যাব। কিন্তু একদিন একদিন করে দিন পার হয়ে গেল, যাওয়া আর হয়ে উঠছিল না। বলতে গেলে ঠিক সাহস করে উঠতে পারছিলাম না।

শেষে একদিন বুকে সাহস এনে বেইসমেন্টের সিঁড়ির কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। খুব নার্ভাস লাগছিল। আমার হাত-পা কাঁপছিল। একবার মনে হলো নিচে যাই। আবার মনে হলো, আচ্ছা দেখি এই রাস্তা ছাড়া অন্য কোনো পথ আছে কিনা। একটু জেনে আসি, আসলেই এখানে মুসলিমরা নামায পড়ে কিনা।

আসলে আমি নিজের কাছ থেকেই নিজে পালাতে চাচ্ছিলাম।

চার্চের আশেপাশে কতক্ষণ ঘোরাঘুরি করলাম। না, এই পথ ছাড়া দ্বিতীয় কোনো রাস্তা নেই।

চার্চের ভেতরে এক ঝাড়ুদার ঝাড়ু দিচ্ছিল। আমি গিয়ে তাকেই জিজ্ঞাসা করলাম, 'আচ্ছা, তুমি কি বলতে পার, মসজিদটা কোন দিকে?

লোকটা এমন ভাবে আমার দিকে তাকাল, যেন ঝাড়ু দিয়ে আমার মুখে একটা বাড়ি মারবে। 'কী বললে? তোমার কি মাথা খারাপ হলো নাকি? চার্চের ভেতরে এসে মসজিদের খোঁজ করছ?'

আমি বাইরে বেরিয়ে এলাম। বেলা পড়ে এসেছে। আমি মনে মনে নিজেকে দিলাম, 'এত ভয়ের কী আছে। সিঁড়ি দিয়ে নিচের দিকে গিয়েই দেখা যাক না!'

আমি আবার সিঁড়ির গোড়ায় ফিরে এলাম। আবার সাহস হারিয়ে ফেললাম। দাঁড়িয়ে রইলাম কয়েক সেকেন্ড। যতই আমি নিচের দিকে যাচ্ছিলাম ততই আমার হাটু দুর্বল হয়ে আসছিল, পা হয়ে আসছিল ভারী। দরজার কাছে পৌছাতে পৌছাতে আমি রীতিমত কাঁপছি। কী মনে করে পেছন ফিরে দিলাম ছুট। একেবারে ঠিক সিঁড়ির মাথায় গিয়ে থামলাম।

www.pathagar.com

'জেফ! তুমি একটা আস্ত গর্দভ!' আমি নিজেকে নিজে ধিক্কার দিচ্ছিলাম, 'তুমি প্রতিদিন এই ইউনিভার্সিটির মধ্য দিয়ে হেঁটে বেড়াও। অথচ তুমি এই নিচে নামতে ভয় পাচ্ছ। এত ভয়ের কী আছে? হতে পারে মসজিদে কেউ নেই। আর থাকলেও তো সব ছাত্ররাই আছে।'

আমি আবার ঘুরলাম। আবার একই ঘটনা। ঘামে আমার সারা শরীর ভিজে উঠেছিল। আমি কিছুক্ষণ দম নিয়ে প্রার্থনার ভঙ্গিতে উপরে আকাশের দিকে তাকালাম। আমি জানি না, আমরা মানব সন্তানেরা বিশেষ বিশেষ মুহূর্তে এই কাজ কেন করি।

আকাশটা দেখতে লাগছিল রাজকীয়। শূন্যে ভেসে যাওয়া মেঘ, তার ফাঁকে ফাঁকে সূর্যের আলো নরম হয়ে মাটি ছুঁয়ে যাচ্ছিল।

বহু বছর ধরে আমি যা করিনি, আমি তাই করলাম। আকাশের দিকে তাকিয়ে প্রার্থনা করলাম, 'ইয়া খোদা! তুমি যদি সত্যিই থেকে থাক, তবে আমাকে সাহস যোগাও। যাতে আমি নিচে গিয়ে মসজিদে প্রবেশ করতে পারি।'

কিছুক্ষণ আমি নিরবে দাঁড়িয়ে রইলাম। দেখি, যদি কোথাও অলৌকিক কোনো নিদর্শন দেখতে পাই। হঠাৎ করে হয়তো আকাশে বিদ্যুৎ চমকালো। কিংবা একটা পাখি এসে বসল আমার কাঁধের উপরে। এমনকি হয়তো কোনো ভূমিকম্প হলো। এই পৃথিবীতে কত সহস্র ভূমিকম্পই তো হয় প্রতিদিন।

আমি অলৌকিক কিছুর জন্য অপেক্ষা করছিলাম। শুনতে এখন হয়তো গাধামি মনে হচ্ছে, কিন্তু তখন আমার অনুভূতিটা এমনই ছিল। কোনো কিছুই ঘটল না। আমি পেছন ফিরে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এলাম নিচে।

আলতো ছোঁয়ায় দরজা খুললাম, উঁকি দিলাম ভেতরে...

তিন

ভেতরে দুজন ছাত্র বসা ছিল।

তাদেরই একজন আমাকে জিজ্ঞাসা করল, 'আমরা কি আপনাকে কোনোভাবে সাহায্য করতে পারি?'

নার্ভাসনেস আবার ফিরে এল শরীরে। আমি আমার পরিচিত কয়েকটা মুসলিম নাম বলে গেলাম, 'এখানে কি মাহমুদ, সারাস কিংবা উমর আছে?'

www.pathagar.com

তারাও আমার দিকে চার্চের ঝাড়ুদারের মতো তাকিয়ে রইল 'না...না... এই নামে এখানে কেউ নেই।'

'আমি দুঃখিত। আমি মনে হয় ভুল জায়গায় এসে পড়েছি' আমি পেছন ফিরলাম ফিরে যাবার জন্য। এমন সময় দরজা দিয়ে এক মালয়েশিয়ান ছেলে ঢুকল। পরনে তার ঐতিহ্যবাহী মালয়েশিয়ান পোশাক। পরে জেনেছি, তার নাম আবু হানান।

সে আমাকে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি কি ইসলাম সম্পর্কে কোনো কিছু জানতে চাইছেন?'

আমি কিছুটা আত্মস্থ হলাম 'হ্যাঁ! আসলেই তাই।'

'দয়া করে জুতা খুলে ভেতরে আসুন। এখানে আমরা নামায পড়ি তো...'

আমি জুতা খুলে ভেতরে এসে বসলাম।

'আপনি ইসলাম সম্পর্কে আসলে কী জানতে চাইছেন?

আমি আমার কুরআন পড়ার কথা বললাম।

আবু হানান তিন মিনিট ধরে নিজের মতো করে কী কী যেন বলে গেল, আমি ঠিক বুঝতে পারিনি। এরপরে সে বলা শুরু করল, মানুষ যখন মারা যায়, তখন ফেরেশতারা তার আত্মা নিয়ে যায়। পাপী হলে পেটাতে থাকে...'

একে তো নিচে অন্ধকার সিঁড়ি বেয়ে গা ছমছমে পরিবেশ, তার উপর মৃত্যুর পরে ফেরেশতাদের মারপিটের আলোচনা। আমি একটু উসখুস করে বলে উঠলাম, 'ইয়ে, আমার অফিসে একজনের সাথে দেখা করার কথা। আমি তাহলে যাই।'

আমি বেরিয়ে আসার উদ্যোগ নিচ্ছিলাম, এমন সময় আবার দরজা খুলে গেল। ততক্ষণে দরজার বাইরে সূর্য ডুবতে শুরু করেছে।

যিনি মসজিদে ঢুকলেন তার মুখে লম্বা দাড়ি, মাথায় আরবদের মতো বাঁধা চাকতি। চোখে ছিল ঝকঝকে সানগ্লাস, হাতে লাঠি। তার গায়ের জুব্বা পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত লম্বা।

পেছনে অস্তগামী সূর্য, তার সামনে এমন একটা মানুষের আবির্ভাব। আমার মনে হচ্ছিল বাইবেলের নবি মুসা বুঝি সিনাই[২] পর্বত থেকে আমার সামনে এসে উদয় হলেন।

তিনি ভেতরে এসে একপাশে এসে বসলেন। তারপর হাত তুলে এক মনে বিড়বিড় করে কী জানি কী দোয়া পড়ে গেলেন। দুচোখ তার বন্ধ। দোয়া শেষে ইউসুফ নামে এক ছাত্রের সাথে আরবিতে কী সব বলে গেলেন, আমি তার এক বিন্দু বিসর্গও বুঝিনি।

শেষে ইউসুফ আমার দিকে ইঙ্গিত করে বলল 'প্রফেসর...'

www.pathagar.com

তিনি আমার দিকে কিছুটা কৌতূহলি দৃষ্টিতে চাইলেন 'প্রফেসর' তারপর আমার দিকে এগিয়ে এলেন। তার নাম ছিল খাসান। এই মসজিদে তিনি ছিলেন খুবই গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। আমেরিকার তাবলীগ জামায়াতের অন্যতম আমীর। যদিও বয়সে খুবই তরুণ। পেশায় ছাত্র।

খাসান আমার কাছে এসে বসলেন। আমার নার্ভাসনেস দেখে গায়ে হাত দিয়ে আমাকে কিছুটা স্বাভাবিক করার চেষ্টা করলেন। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনার নাম কী?' এই প্রথম কেউ আমার নাম জানতে চাইলেন।

'জেফ ল্যাং।'

'আপনি কী করেন?'

'আমি এখানকার গণিত বিভাগে শিক্ষকতা করি।'

'আপনি কি গণিতের প্রফেসর?'

'জ্বি'।

তিনি আশপাশের দুজনের দিকে সম্মতির ভঙ্গিতে তাকালেন। তারপরে আমাকে আবার জিজ্ঞাসা করলেন, 'শুনলাম আপনি ইসলাম নিয়ে কিছু জানতে চাইছিলেন?'

আমি কুরআন ও অন্যান্য বইপত্র ঘেঁটে ইসলাম নিয়ে যা জানতাম, তা বলে গেলাম। আমার উত্তর শুনে তিনি কিছুটা মুগ্ধ হলেন। তিনিও আমাকে ইসলামের বেশ কিছু নিয়ম-কানুন, বিধি-নিষেধ ইত্যাদি নিয়ে এক নাগাড়ে বলে গেলেন। কঠিন কঠিন সব কথা শুনে আমি কিছুটা আলোচনার আগ্রহ হারিয়ে ফেলছিলাম ।

শেষে আমি বললাম, 'আমার আসলেই এখন যাওয়া দরকার।'

তিনি আমার দিকে কিছুটা অবাক হয়েই জানতে চাইলেন, 'আপনার কি ইসলাম সম্পর্কে আর কোনো কিছুই জানার নেই?'

আমি উঠতে যাচ্ছিলাম, 'তেমন একটা না। আচ্ছা আপনি কি আমাকে বলতে পারেন, মুসলিম হবার অনুভূতি আসলে কেমন? একজন মুসলিম হিসেবে মনের ভেতরে আসলে আলাদা করে কী অনুভূতি হয়?'

খানিক্ষণের নিরবতা। খাসান মানুষ হিসেবে যেমন ছিলেন ধার্মিক, ঠিক তেমনি দাওয়াহর কাজে তার বিশেষ পারদর্শিতা ছিল। কিন্তু আমার এই প্রশ্ন শুনে তিনি কিছুটা চিন্তায় পড়ে গেলেন। হয়তো এমন কোনো প্রশ্নের মুখোমুখি এর আগে কখনো হতে হয়নি তাকে।

www.pathagar.com

তিনি মাথা নিচু করে বেশ কিছুক্ষণ ভাবলেন। চোখ বন্ধ করে বিড়বিড় করে কিছু দোয়া পড়ে গেলেন। সম্ভবত আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইছিল, যাতে সুন্দর কোনো জবাব দেয়া যায়। তারপর আস্তে আস্তে কথা বলা শুরু করলেন। এত ধীরে আর এত গভীরে ডুবে গিয়ে... আমি আজও সে দৃশ্য ভুলতে পারিনি।

চোখ বন্ধ করে তিনি বলে চললেন, 'আল্লাহ...তিনি অত্যন্ত দয়ালু মেহেরবান। একজন মা তার নবজাতক শিশুকে যতটা ভালোবাসেন, আমাদের প্রতি তাঁর ভালোবাসা তার চেয়েও অনেক অনেক গুণ বেশি। আমরা আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া কিছুই করতে পারি না। আমরা শ্বাস নেই আল্লাহর ইচ্ছায়, আমরা নিঃশ্বাস ছাড়ি, সেটিও তার ইচ্ছায়। এমন কী আমরা যখন মাটিতে হাঁটার জন্য পা তুলি, তখনো তাঁর ইচ্ছা ছাড়া পা পড়ে না। বিশাল গাছের অতি ক্ষুদ্র একটি পাতাও যখন হাওয়ায় ভাসতে ভাসতে মাটির দিকে আসে, তখন প্রতি মুহূর্তে আল্লাহর আদেশ তার সঙ্গী হয়।

আমরা মুসলিমরা যখন মাটিতে মাথা ছুঁয়ে নামায পড়ি, তখন আমরা হৃদয়ে পরম তৃপ্তি, সুখ আর প্রশান্তি অনুভব করি। এ এমনই এক অনুভূতি যা ভাষায় প্রকাশ করা কঠিন। ভালোভাবে বুঝতে চাইলে আপনার নিজেকে সে অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যেতে হবে।'

তিনি কথা শেষ করে চোখ মেললেন। তাকে খুব হতাশ দেখাচ্ছিল। হয়তো তার নিজের কাছেও জবাবটা পরিপূর্ণ মনে হয়নি।

কিন্তু আমি তার চোখেমুখে দেখতে পেলাম, স্রষ্টার সামনে আনুগত্যের মস্তক নত করার আকাঙ্ক্ষা, নিজের সকল আশা-আকাঙ্ক্ষা, দুঃখ-যাতনা তুলে ধরার মিনতি, আল্লাহর সামনে নিজের সর্বস্ব সপে দেয়ার পরম পরিতৃপ্তি।

তিনি আমার দিকে ফিরে হঠাৎ করেই বলে উঠল 'তো, আপনি মুসলিম হতে চান?'

আমি উচ্চস্বরে হেসে বললাম, 'আপনার কী মাথা খারাপ হয়েছে নাকি? আরে নাহ! আজকে আমি তো এসেছি সামান্য কিছু প্রশ্ন করতে।' আমার শরীর ভারি হয়ে উঠেছিল, ঘামে ভিজে উঠেছিল আমার কপাল, ঘাড়। আমিও উনার সাথে তালমিলিয়ে হাসি দিয়ে নিজেকে হাল্কা করতে চাইলাম।

তিনি গভীর অন্তর্দৃষ্টি মেলে আমার দিকে তাকিয়ে থাকলেন, 'আমার মনে হয় আপনি মনে মনে বিশ্বাস করেন। তাহলে সত্যকে স্বীকার করেই দেখুন না...'

www.pathagar.com

আমার মাথার ভেতরটা ঘুরছিল। আমি যদি মুসলিম হই, তবে আমার ক্যাম্পাস, আমার পরিচিত আত্মীয়, বন্ধু মহলে বেশ একটা হাসাহাসি পড়ে যাবে। কল্পনার চোখে আমি দেখতে পারছিলাম, সবাই আমার দিকে তাকিয়ে বিদ্রূপের হাসি হাসছে, আর আমি ইনিয়ে-বিনিয়ে আমার যুক্তি তুলে ধরার চেষ্টা করছি। আমি যেন সবার ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ নিজ কানে শুনতে পাচ্ছিলাম।

খাসানের সর্বশেষ কথা শুনে আমার এতক্ষণের কল্পলোকের সব আওয়াজ থেমে গেল। আমি শান্ত হয়ে বসলাম। আমার হৃদয় অনুভূতিশূন্য হয়ে গেল। মনে পড়ে গেল আমার মায়ের কথা। মা বলতেন 'বাবা! জীবনে যা-ই কিছু তুমি অন্তর দিয়ে বিশ্বাস করবে, যা-ই তুমি সত্য বলে জানবে, তা-ই তুমি ধারণ করতে চেষ্টা করবে। সে সত্যকে গ্রহণ করতে কখনো পিছপা হয়ো না। এমনকি যদি সারা পৃথিবীও তোমার বিরুদ্ধে থাকে, তবুও...'

জানি, মায়ের কথাটা অনেকটা নীতি বাক্যের মতো শোনাচ্ছে। কিন্তু এ মুহূর্তে মায়ের ওই কথাটাই মনে পড়ে গিয়েছিল আমার।

আমাদের আলাপের ফাঁকে আরও দুজন এসে যোগ দিয়েছিলেন। পাঁচ জনের দিকে ফিরে আমি মাথা দোলালাম, 'হ্যাঁ, আমি মুসলিম হতে পারি...'

আপনি যদি তাদের চেহারা দেখতেন! দেখে মনে হচ্ছিল, তারা একেকজন চাঁদে যাওয়া প্রথম মানুষ। খুশিতে একজন আরেকজনকে জড়িয়ে ধরছিলেন, হাতে হাত মিলাচ্ছিলেন। মুখ থেকে হাসির রেখা যাচ্ছেই না। তাদের অভিব্যক্তি দেখে আমি কিছুটা অভিভূত হলাম।

এর মধ্যেই খাসানের মতো আরেক বাইবেলীয় চরিত্র এসে হাজির। সেই লম্বা জুব্বা, লম্বা দাড়ি। তার বিশাল পেট ছিল অনেকটা সান্তা ক্লজের[৩] মতো।

একজন তাকে উদ্দেশ্য করে বললেন 'মোস্তফা ভাই! ইনি মুসলিম হতে যাচ্ছেন।'

মোস্তফা খুশিতে আমাকে জড়িয়ে ধরলেন। হাসান আস্তে করে বলল, 'মোস্তফা ভাই, তিনি এখনো মুসলিম হননি' মোস্তফা কিছুটা চমকে আমাকে ছেড়ে দিলেন।

খাসান আবার বলল, 'মোস্তফা, তাকে শাহাদাহ পাঠ করাও।'

মোস্তফা আমার দিকে ফিরল। তারপর প্রতিটা শব্দ ধীরে ধীরে উচ্চারণ করে আমাকে শাহাদাহ পাঠ করাল। প্রতিটা শব্দ উচ্চারণের সাথে সাথে যেন পানির একেকটি ফোঁটা আমার শরীর বেয়ে গড়িয়ে পড়ছিল। আমার অন্তর হয়ে উঠছিল পরিশুদ্ধ।

আমি মসজিদ থেকে বেরিয়ে এসে খোলা হাওয়ায় শ্বাস নিলাম। পুরোনো অবিশ্বাসীর খোলস ছেড়ে, একজন আত্মসমর্পণকারী মুসলিম হিসেবে...

www.pathagar.com

পরিচিতি

শুধুমাত্র কুরআন পড়েই যে, একজন মানুষ আমূল বদলে যেতে পারেন, ড. ল্যাং তার চমৎকার উদাহরণ। ড. ল্যাং মূলত আমেরিকার কানসাস ইউনিভার্সিটির গণিতের অধ্যাপক।

ক্যাথলিক স্কুলে পড়া ল্যাং ছোটবেলা থেকে ধীরে ধীরে ধর্মের উপর আগ্রহ হারিয়ে ফেলেন। ১৮ বছর হতে না হতে হয়ে যান ঈশ্বরে অবিশ্বাসী নাস্তিক। সানফ্রান্সিস্কো ইউনিভার্সিটিতে থাকার সময় ঘটনাক্রমে কুরআনের একটা কপি তার হাতে আসে। পড়তে পড়তে তিনি মুগ্ধ হন। শেষে ইসলাম গ্রহণ করেন।

'Even Angels Ask ও Struggling to surrender' তার দুটো বিখ্যাত বই।

পাদটিকা

১. আদম عليه السلام-এর দুনিয়ায় আগমন : আমাদের মুসলিমদের মাঝে প্রচলিত আছে, গন্ধম ফল খাবার কারণে শাস্তি হিসেবে আদমকে দুনিয়ায় পাঠানো হয়েছে। কেউ কেউ আবার এর জন্য হাওয়াকে দোষারোপ করেন। ভাবেন, হাওয়া যদি আদমকে প্ররোচিত করে গন্ধম না খাওয়াতেন, তবে মানুষের বংশধররা জান্নাতেই থাকত।

গন্ধম খাওয়ার পর দুজনকে দুনিয়ায় নামিয়ে দেয়া হয়। আদম عليه السلام-কে নামানো হয় বর্তমান শ্রীলঙ্কায় আর হাওয়াকে নামানো হয় সৌদি আরবে। আদম عليه السلام পৃথিবীতে নেমে অনুতপ্ত হন, হাওয়ার খোঁজ করতে থাকেন। শেষে আরাফার ময়দানে দুজনের মিলন হয়। বর্তমানে শ্রীলঙ্কায় আদম عليه السلام যেখানে নেমেছিলেন, সে স্থানটা Adams Peak নামে পরিচিত। অনেক পর্যটক সেটি দেখতে যান। সেখানে বিশাল বড় একটা পায়ের ছাপও আছে।

এই ঘটনাতে বেশ কিছু ভুল রয়েছে। প্রথমত, আদমের দুনিয়ার আগমন পাপের শাস্তি হিসেবে, এটা বাইবেলের ভাষ্য, কুরআনের নয়। কুরআন পরিষ্কার ভাষায় বলছে, আল্লাহ আগ থেকেই আদমকে দুনিয়াতে পাঠানোর পরিকল্পনা করেছেন। সৃষ্টির পরে কিছু দিন জান্নাতে রেখে দিয়েছেন, যাতে আদম عليه السلام জান্নাত ও জাহান্নামের স্বরূপ বুঝতে পারেন। বুঝতে পারেন শয়তান কী করে বন্ধু বেশে মারাত্মক ক্ষতি করতে পারে।

দ্বিতীয়ত, গন্ধম শব্দের উল্লেখ কুরআন কিংবা সহীহ হাদিস কোথাও নেই। সম্ভবত

www.pathagar.com

সর্বশেষ, আদম ﷺ-এর জান্নাত থেকে শ্রীলঙ্কায় অবতরণ ও আরাফার ময়দানে হাওয়ার সাথে মিলন, এই ঘটনার কোনো ভিত্তি নেই। সহীহ সনদে কোনো হাদিসের কিতাবেও এমন কোনো বর্ণনা নেই। ঘটনাটি এক ধরনের লোক কথা মাত্র।

(বিস্তারিত জানতে দেখুন : হাদীসের নামে জালিয়াতি-ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, ৪র্থ সংস্করণ,পৃ. ২৮৮-২৮৯, বাইবেল, আদী পুস্তক ৩ : ১৬)

২. সিনাই পর্বত : মিসরে অবস্থিত একটি পাহাড়, যা মুসলিমদের মাঝে তুর পাহাড় নামে পরিচিত। এখানেই আল্লাহ মুসা ﷺ-এর সাথে কথা বলেন। এখানেই তাকে তাওরাত দেয়া হয়।

৩. সান্তা ক্লজ : কল্পিত এক বুড়ো চরিত্র। তার আছে লম্বা সাদা দাড়ি, গায়ে শীতের বিশাল জুব্বা। দুহাত দস্তানায় ঢাকা। খ্রিষ্টানরা তাদের প্রধান ধর্মীয় উৎসব বড়দিনে এমন একটি চরিত্র সাজে। বলা হয়, সান্তা ক্লজ স্বর্গ থেকে হরিণ টানা স্লেজ গাড়িতে চড়ে বড়দিনের আগে আগে বাচ্চাদের জন্য অনেক অনেক খেলনা আর উপহার নিয়ে আসেন। বাচ্চারা অপেক্ষা নিয়ে বসে থাকে।

কথিত আছে, অনেক অনেক আগে Saint Nicholas নামে একজন ধর্মীয় যাজক ছিলেন। তিনি বড়দিনের সময় ছোট বাচ্চা আর গরীব মানুষদের মধ্যে উপহার বিলি করতেন। তার স্মরণেই এই সান্তা ক্লোজের চরিত্রের সৃষ্টি হয়।

www.pathagar.com

বৌদ্ধ থেকে আলোর পথে

হুসাইন ইয়ি

আমার ঘটনা শুরু করার আগে, বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কে কিছু ধারণা দিই।

বৌদ্ধ ধর্মের প্রবর্তক গৌতম বুদ্ধের জন্ম লুম্বিনিতে। অনেকের মতে এটি আধুনিক নেপালের একটি অংশ। জন্মের সময়ই তার মা মারা যান। তিনি প্রতিপালিত হন তার খালার কাছে। গৌতমের বাবা ছিলেন সে অঞ্চলের রাজা। সে হিসেবে গৌতম ছিলেন রাজকুমার।

১৮ বছর বয়সে তিনি বিয়ে করেন। রাজপুত্র হিসেবে তার টাকা কড়ি ধন সম্পত্তির অভাব ছিল না। তবুও তার মনে শান্তি ছিল না। তিনি ভাবতেন, পৃথিবীতে কেন এত দুঃখ-ক্লেশ। কেন মানুষ দিনের পর দিন নানা কষ্টে দিন যাপন করছে? মানব জীবনের উদ্দেশ্যইবা কী?

২৯ বছর বয়সে এক পূর্ণিমায় কাউকে কিছু না বলে, সত্যের সন্ধানে তিনি বাড়ি ছাড়েন। তৎকালীন সময়ে অনেক সাধু পুরুষের তিনি সান্নিধ্য পেয়েছিলেন। কিন্তু তাদের জীবনযাপন তার কাছে ভালো লাগেনি। এই সাধুদের অনেকের ছিল লম্বা জটা চুল, বিশাল বিশাল নখ।

একসময় গৌতম নির্জনে গিয়ে ধ্যান করা শুরু করেন। ডুবে যান গভীর ভাবনায়।

বৌদ্ধ ধর্মমত অনুযায়ী, একটি গাছের নিচে ধ্যান করা অবস্থায় তিনি আলোকপ্রাপ্ত হন। তার অন্তরাত্মা জেগে উঠে। তিনি খুঁজে পান এত দিনকার মনের সব প্রশ্নের জবাব। যে গাছের নিচে তিনি আলোকপ্রাপ্ত হয়েছিলেন, তার নাম 'বোধী বৃক্ষ' (অশ্বথ গাছ)। পরিপূর্ণ আলোকপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে বলা হয় বুদ্ধ। যেহেতু গৌতম ছিলেন প্রথম জেগে উঠা আলোকপ্রাপ্ত মানুষ, তাই তার নামের সাথে যোগ করা হয় বুদ্ধ। তিনি পরিচিত হয়ে উঠেন গৌতম বুদ্ধ নামে।

www.pathagar.com

মানুষের মাঝে ধারণা আছে, বৌদ্ধ ধর্মে ঈশ্বরের কোনো স্থান নেই। কিন্তু গবেষণায় আমি দেখেছি, গৌতম বুদ্ধের শিক্ষার সাথে ইসলামের তাওহিদ বিশ্বাসের অনেক মিল। তিনি নিজে কখনো স্রষ্টাকে অবিশ্বাস করে কিছু বলেননি। যদিও আজকাল তার অনুসারীরা যা করে থাকে, তা সম্পূর্ণ তার শিক্ষার বিপরীত। তিনি কখনোই তার মূর্তি বানিয়ে পূজা করতে বলেননি। অথচ অনুসারীরা মন্দিরে গিয়ে তার নাম করে তার কাছেই নিজেদের যত চাওয়া-পাওয়া বলে যাচ্ছে।

অনেকেই আমাকে প্রশ্ন করেন, আপনার কী মনে হয় গৌতম একজন নবি ছিলেন? আমি বলি, নিশ্চিত করে বলা সম্ভব নয়। যেহেতু এর সুস্পষ্ট জ্ঞান আমাদের কাছে নেই। তবে গভীরভাবে গৌতম বুদ্ধের মৌলিক শিক্ষার দিকে খেয়াল করলে দেখা যায়, তাওহিদের সাথে তার চিন্তার বেশ মিল। হতে পারে, তিনি একজন নবি ছিলেন। পরবর্তী সময়ে তার অনুসারীরা তার শিক্ষাকে বিকৃত করে ফেলেছে, সে শিক্ষা থেকে সরে এসেছে অনেক দূরে।

আমার নিজের কথা বলি। আমার জন্ম একটি চায়নিজ পরিবারে। আমার মা-বাবা দুজনেই ছিলেন বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারী। ছোটবেলায় আমি বৌদ্ধ আশ্রমগুলোতে যেতাম। সাধু-সন্ন্যাসীদের সাথে কথা বলতাম। কিন্তু তরুণ বয়স হতে হতে বৌদ্ধ ধর্ম সম্পর্কে আগ্রহ হারিয়ে ফেলি। এই ধর্মের নিয়ম-কানুন অনেক কড়া। যেমন, মাছ-মাংস খাওয়া যাবে না, নিরামিষভোজী হতে হবে। কারণ, মাংস খেলে শরীরে নানা জৈবিক আকাঙ্ক্ষা বাসা বাঁধবে। তাই কেবল শাক-সবজি খেতে হবে। অথচ এই ধারণা যতটা না বৌদ্ধ ধর্মের– তার চেয়ে অনেক বেশি প্রাচীন ব্রাহ্মণ তথা হিন্দু ধর্মের। বৌদ্ধ ধর্ম ছিল হিন্দু ধর্মের কাছাকাছি সময়ের।

সন্দেহ নেই, এই ধর্মের কিছু শিক্ষা চমৎকার। যেমন : মানুষের সাথে ভালো ব্যবহার, পশু-পাখি ও প্রাণীদের সাথে সুন্দর আচরণ, কাউকে কষ্ট দেয়া যাবে না ইত্যাদি। কিন্তু ভালো বৌদ্ধ হতে গেলে আপনাকে গৃহ সংসার ত্যাগ করতে হবে, গেরুয়া পোশাক পরে সন্ন্যাস জীবন নিতে হবে। এমনকি খালি পায়ে রাস্তায় হাঁটতে হবে। বিয়ে করে সংসারী হবারও কোনো জো নেই।

আমার কাছে মনে হয়েছিল, এই বিধি-নিষেধগুলো ঠিক মানব প্রকৃতি, যাকে আমরা ফিতরাত বলি, তার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। যৌবনে আমি খ্রিষ্ট ধর্ম সম্পর্কে আগ্রহী হয়ে উঠলাম। আমার এক আত্মীয় ছিলেন, যিনি বৌদ্ধ ধর্ম ছেড়ে খ্রিষ্টান হয়ে গিয়েছিলেন। তার সংস্পর্শে এসে আমিও একসময় খ্রিষ্টান হয়ে গেলাম।

এ নতুন ধর্ম ছিল বৌদ্ধ ধর্মের পুরো বিপরীত। বৌদ্ধ ধর্মে যেখানে নানা বিধি-নিষেধ ছিল, এখানে ওসবের বালাই নেই। যিশুখ্রিষ্টের উপর বিশ্বাস রাখাই যথেষ্ট। যিশু আপনার পাপের জন্য ক্রুশে জীবন দিয়েছেন। যিশুর উপর বিশ্বাস রাখলে আপনি যাই করেন না কেন, যিশু আপনাকে পাপ মুক্ত করে দিবেন। শুধু মাঝে মাঝে পাদ্রীর সামনে গিয়ে নিজের পাপ স্বীকার করতে হবে। আপনি হয়ে যাবেন, মাসুম, নিষ্পাপ।

www.pathagar.com

এই ধর্মের যে জিনিসটি আমার ভালো লাগল, তা হলো এই ধর্মে ভালোবাসার কথা আছে। ঈশ্বর আপনাকে ভালোবাসেন, যিশু আপনাকে ভালোবাসেন। ভালোবাসার কথা আছে নিজের প্রতিবেশী, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবদের প্রতি। পুরো ধর্মটাই ভালোোবাসার বাণীতে ভরপুর।

একসময় আমার মনে হলো, এত চমৎকার একটি ধর্ম মানুষের মাঝে বেশি বেশি প্রচার করা উচিত। প্রচার করতে গেলে তো আগে ভালোমতো জানতে হবে। তাই আমি এক মিশনারী স্কুলে ভর্তি হয়ে গেলাম। সেখানে আরও গভীরভাবে জানলাম ত্রিত্ববাদের কথা। যদিও গোটা বিষয়টা আমার ঠিক বুঝে আসেনি। যিশু একদিকে ঈশ্বর, আবার তিনি মানুষ। একদিকে তিনি পুত্র, আবার তিনি পিতার সমতুল্য। যুক্তির দিক দিয়ে বুঝে ওঠা কঠিন।

যেহেতু আমার বিশ্বাসটা অনেক জোরালো ছিল, কী বুঝেছি আর কী বুঝিনি, তা নিয়ে আর অত মাথা ঘামাইনি। আমার আশেপাশে কিছু পরিচিত মুসলিম ছিলেন। তাদের সাথে কখনো ধর্ম নিয়ে আলাদা করে কথা হয়নি। আমি ভাবলাম, তাদের মাঝে ঈসায়ী ধর্মের দাওয়াতি কাজ করা দরকার। কিন্তু তাদেরকে বোঝাতে গেলে তো আগে মুসলিমদের ধর্ম ইসলাম সম্পর্কে জানা ও বোঝা জরুরি।

সে সময়ে মুসলিমরা সাধারণত অমুসলিমদের হাতে কুরআনের কোনো কপি দিতেন না। তারা মনে করতেন, অমুসলিমদের কুরআন ছোঁয়াও পাপ, যদিও তা অনুবাদ হয়। যেহেতু কুরআন পড়ার সুযোগ নেই, আমি হযরত উমারের একটা জীবনী পড়া শুরু করলাম।

হযরত উমর (রা.) প্রথম জীবনে ছিলেন ঘোরতর ইসলাম-বিদ্বেষী। এমনকি তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে হত্যা করতেও উদ্যত হয়েছিলেন। যখন তার ভগ্নিপতির কণ্ঠে তিনি কুরআনের সূরা তোয়াহা শুনতে পান, কুরআনের বাণী তার হৃদয় এতটাই ছুঁয়ে গিয়েছিল, তিনি সাথে সাথে ইসলাম গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেন। মুসলিম হবার পর তিনি তাওহিদের প্রশ্নে ছিলেন আপোসহীন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে 'ফারুক' উপাধি দিয়েছিলেন। অর্থাৎ সত্য-মিথ্যার মাঝে পার্থক্যকারী। তিনি বলতেন, উমর যে পথ দিয়ে হেটে যায়, শয়তান তার উল্টো পথে পালাতে থাকে।

আমার মনে হলো, কুরআনের মাঝে কী এমন শক্তি আছে, যা একজন চরম অবিশ্বাসীকে একজন পরম বিশ্বাসীতে রূপান্তরিত করেছিল? তার গোটা জীবনটাকে এভাবে আমূল বদলে দিয়েছিল? ভাবলাম, আমাকে যেভাবেই হোক এই কুরআন সংগ্রহ করতে হবে। জানতে হবে, কী এর সম্মোহনী শক্তি।

একসময় কুরআনের একটা কপি সংগ্রহ করি। গভীর মনোযোগের সাথে পড়া শুরু করি। সুবহানাল্লাহ! কুরআন পড়া যখন শেষ করি, তত দিনে আমার মনের অনেক দ্বিধা-দ্বন্দ্ব পরিষ্কার হয়ে গেছে।

www.pathagar.com

বিশেষ করে কুরআনের তাওহিদের বাণী আমাকে দারুণভাবে আকৃষ্ট করে। যেমনটা, সূরা ইখলাসে বলা হয়েছে, আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয়। তাঁর কোনো সন্তান নেই, শরীক নেই। তাঁর কোনো নির্দিষ্ট আকার কিংবা রূপও নেই। তাঁর ইবাদাত করতে প্রয়োজন নেই কোনো মূর্তি কিংবা ছবির।

এত দিনকার খ্রিষ্ট ধর্ম কিংবা বৌদ্ধ ধর্মের যে জিনিসগুলো আমার কাছে অযৌক্তিক ঠেকত, কুরআন খুব সুন্দর ভাষায় তার সন্তোষজনক জবাব দিয়ে দিল।

আপনাদের মুসলিম ভাই বোনদের বলি, আপনারা অমুসলিমদের হাতে অনুবাদসহ কুরআন দিতে ইতস্তত করবেন না। আল্লাহ নিজেই তো বলেছেন, রমজান মাস সেই মহিমান্বিত মাস, যাতে নাযিল হয়েছে কুরআন। যে কুরআন মানুষের জন্য হিদায়াত, সত্যের প্রমাণ ও সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী। অমুসলিমরা যদি কুরআন পড়তেই না পারে, তবে কী করে তারা এর হিদায়াতের দিকে এগিয়ে আসবে, কী করে এর শিক্ষা উপলব্ধি করতে পারবে?

একসময় আমি মুসলিম হবার সিদ্ধান্ত নিই। আমি স্থানীয় এক ইমামের হাতে শাহাদাহ উচ্চারণ করি।

আমি জানি, ইসলাম সত্য সুন্দর ত্রুটিমুক্ত ধর্ম। মুসলিমদের মধ্যে হাজারো ত্রুটি থাকতে পারে, কিন্তু ইসলামে কোনো ভুল নেই। অনেক সময় আমার কাছের মানুষজন মন্তব্য করে, মুসলিমরা খুব খারাপ। অমুক মুসলিম এই করেছে, সেই করেছে... আমি চুপ থাকি।

মুসলিমদের মধ্যে কিছু খারাপ মানুষ থাকতেই পারে। খারাপ সব ধর্ম, জাতি, গোষ্ঠীতেই আছে। হিন্দু, বৌদ্ধ, ইহুদি, খ্রিষ্টান- সব ধর্মের লোকই খারাপ হতে পারে। কিন্তু কেউ যদি বলে ইসলাম খারাপ, আমি তীব্র প্রতিবাদ করি, আপত্তি জানাই। যারা এমন কথা বলে, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তারা ইসলাম সম্পর্কে কিছুই জানে না। আমি বলি, ইসলামকে মূল্যায়ন করতে কুরআনের শিক্ষার দিকে তাকান, মুসলিমদের দিকে নয়।

ইসলাম গ্রহণের পর আমি এখন ইসলামকে আরও ভালো করে জানার, বুঝার চেষ্টা করে যাচ্ছি। সবাই আমার জন্য দোয়া করবেন।

পরিচিতি

হুসাইন ইয়ি : চাইনিজ বংশোদ্ভূত হুসাইন ইয়ির জন্ম মালয়েশিয়ার এক বৌদ্ধ পরিবারে। বৌদ্ধ ধর্মের বিভিন্ন অনুশাসনে নিরুৎসাহিত হয়ে হুসাইন খ্রিষ্ট ধর্ম গ্রহণ করেন। মুসলিমদের কুরআন নিয়ে পড়াশুনা করতে গিয়ে কুরআনের তাওহিদের চিত্র তাকে মুগ্ধ করে। ১৯৬৮ সালে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। ইসলাম গ্রহণের পর মদিনার ইসলামিক ইউনিভার্সিটি থেকে হাদিসের উপর তিনি উচ্চতর ডিগ্রি নেন। বর্তমানে তিনি এশিয়া, ইউরোপসহ দেশি-বিদেশি বিভিন্ন দাওয়াহ প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পৃক্ত থেকে দাওয়াহর কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন।

www.pathagar.com

মসজিদ ভাঙা হাত আজ মসজিদ গড়ার কারিগর

বলবীর সিং ওরফে মুহাম্মাদ আমির

ধিকি ধিকি আগুন

সে দিনটাকে আমি কোনোভাবেই ভুলতে পারি না। চাইলেও কি সে দিনটা ভোলা যায়? না মন তাকে ভুলতে দেয়?

এতগুলো বছর ধরে যে জ্বালা আমি বয়ে বেড়াচ্ছি, তুষের আগুনের মতো যে বহ্নি শিখা আমার হৃদয়টাকে অহর্নিশি জ্বালিয়ে পুঁড়িয়ে অঙ্গার করে দিচ্ছে, আমি যদি তা কোনোভাবে নেভাতে পারতাম! যদি পারতাম, জীবনের খাতা থেকে সেই দিন, সেই সময়কে ঘষে ঘষে মুছে ফেলতে! তাহলে এই অনুশোচনার ধিকি ধিকি আগুন থেকে হয়তো আমার মুক্তি মিলত। স্বস্তির নিশ্বাস ফেলত আমার অন্তরাত্মা।

চোখ বন্ধ করলেই আজও সেই দিনটাকে পরিষ্কার দেখতে পাই। একটি সুউচ্চ মসজিদকে ঘিরে হাজার হাজার উত্তেজিত জনতা। এই আমি বসে আছি মসজিদের গম্বুজের উপর। আমার হাতে উদ্যত কুঠার। অপেক্ষা... কখন সে ঘোষণা আসে। একটু পরেই দূর থেকে স্লোগান ভেসে এল। আর আমি উদ্যত কুঠার সর্বশক্তি দিয়ে নামিয়ে আনলাম মসজিদের দেয়ালে। যেন ভেঙে খানখান না করা পর্যন্ত হৃদয়ের তৃষ্ণা মিটবে না। আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে তখন হর্ষধ্বনি চলছিল 'ভগবান রামের জয়!'

আমার জীবনের পরম আরাধ্য, দারুণ গৌরবের সেই দিন, সেই মুহূর্ত যে এমনি করে একদিন আমার বুকে যন্ত্রণাদায়ক ফলার মতো তীক্ষ্ণ হয়ে বিঁধবে, সেটাওবা কে জানত?

www.pathagar.com

ফেলে আসা সেই দিনের কথা

আমার জন্ম ১৯৭০ সালে ভারতের হরিয়ানায় পানিপথ[১] গ্রামে। আমার বাবা ছিলেন একজন সম্ভ্রান্ত কৃষক। পাশাপাশি তিনি স্থানীয় এক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করছিলেন। ব্যক্তি জীবনে তিনি ছিলেন সৎ, মানবতাবাদী। যেকোনো ধরনের অন্যায়, অত্যাচার, শোষণ, নিপীড়নের তিনি ঘোরবিরোধী ছিলেন।

১৯৪৭ সালের দেশ বিভাগের[২] সময়কার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা তিনি স্বচক্ষে দেখেছিলেন। সে সময়ের গণহারে মুসলিম হত্যাকে তিনি দেখতেন জাতীয় বিপর্যয় হিসেবে। তিনি অনেক বাস্তুহারা মুসলিমদেরকে পুনর্বাসনে সহায়তা করেছিলেন। তার স্কুলের মুসলিম ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতি তিনি বিশেষ যত্ন নিতেন।

বাবা নিজে কখনো মূর্তি পূজা করেননি। মূর্তি পূজায় তার বিশ্বাস ছিল না। আমরা মন্দিরে তেমন একটা যেতাম না। বাড়িতে গীতা পড়তেও কাউকে দেখিনি।

জন্মের পর আমার নাম রাখা হয় বলবীর সিং। মাধ্যমিক শেষ করার পর আমি পানিপথের একটা কলেজে ভর্তি হই। মুম্বাইয়ের পর সম্ভবত পানিপথই ছিল হিন্দুত্ববাদী শিবসেনার[৩] শক্তিশালী ঘাঁটি। কলেজে পড়ার সময়ই আমার সাথে অনেক উগ্রবাদী ছাত্রের সাথে পরিচয় হয়। তারা আমার মনে মুসলিমদের বিরুদ্ধে ঘৃণা আর হিংসার বিষবাষ্প ঢুকিয়ে দিয়েছিল। তারা কথায় কথায় অনেক ঐতিহাসিক ঘটনার উদ্ধৃতি দিয়ে আমাকে উত্তেজিত করে তুলত। এখন বুঝতে পারি, তাদের দেয়া সেই সব ইতিহাস ছিল বহুলাংশেই বিকৃত ও ভুলে ভরা।

আমার বাবা যখন শিবসেনার সাথে আমার সম্পর্কের কথা জানতে পারলেন, তিনি আমাকে নানাভাবে বোঝানোর চেষ্টা করলেন। তিনি বললেন, বাদশাহ আলমগীর, বাবরের সময় তারা অমুসলিমদের সাথে কত চমৎকার ব্যবহার করেছিলেন। তিনি আরও বললেন, আমাদের ইতিহাসের মধ্যে এই যে বিকৃতি, এটা মূলত ইংরেজরাই করেছিল। তাদের উদ্দেশ্য ছিল, হিন্দু মুসলিমের মাঝে ঘৃণার আগুন জ্বালিয়ে তাদের ঐক্যে ফাটল ধরানো।

দুঃখজনক হলেও সত্য, বাবার এত সব কথা, যুক্তি-তর্ক আমাকে মোটেও প্রভাবিত করতে পারেনি। শিবসেনার উগ্রবাদী দর্শনে তখন আমার মন-মগজ আচ্ছন্ন। হৃদয়ের মাঝে মুসলিম বিরোধী উত্তেজনা, ঘৃণা আর অবজ্ঞার যে বহ্নি শিখা দাউ দাউ করে জ্বলছিল, বাবার সেই শান্ত-সুবোধ কথা তাকে নেভাতে যথেষ্ট ছিল না।

১৯৯০ সালে মি. আদভানির[৪] রথযাত্রায় আমাকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দেয়া হয়। প্রচণ্ড মুসলিম-বিদ্বেষী মনোভাব নিয়ে আমি অযোধ্যার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হই। শিবাজির[৫] নামে কসম খেয়েছিলাম, যে করেই হোক বাবরি মসজিদ ধ্বংস করে সেখানে রাম মন্দির আমি বানাবোই।

www.pathagar.com

৩০ই অক্টোবর আমাকে শিবসেনার ছাত্র সংগঠনের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব দেয়া হয়। আমি আমার বিপুল সংখ্যক কর্মী বাহিনী নিয়ে অযোধ্যা অভিমুখে যাত্রা শুরু করি। পথিমধ্যে পুলিশ আমাদের ঠেকানোর চেষ্টা করেছিল। দুয়েক জায়গায় গুলিও ছুঁড়েছিল।

ভগবান রামের তীর্থভূমিতে পুলিশের গুলি চালানো উপস্থিত জনতাকে দ্বিগুণ উত্তেজিত করে তুলল। প্রচণ্ড রাগে ক্ষোভে আমরা বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠলাম। আমার ভেতরটা এতটাই তেতে ছিল যে, মাঝে মাঝে মন চাইত যেকোনো মূল্যে নিজের জীবন দিয়ে ফেলি। কখনো মন চাইত, লাখনৌ[৬] গিয়ে মুলায়াম সিংকে[৭] গুলি করে হত্যা করি।

তত দিনে দেশব্যাপী সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ভয়ংকররূপ ধারণ করেছে। আমরা দিন গুনছিলাম, কবে বাবরি মসজিদ[৮] ধুলোয় মিশিয়ে দিব। অবশেষে এল সেই প্রতিক্ষিত দিন। ১৯৯২ সালের ১লা ডিসেম্বর আমরা সদলবলে অযোধ্যা[৯] পৌঁছাই। অযোধ্যায় আমার সাথে অন্তরঙ্গ বন্ধু যোগেন্দ্র পালের দেখা হয়। যোগেন্দ্র ছিল স্থানীয় এক জমিদারের ছেলে। তার বাবাও তাকে অযোধ্যা আসতে দুহাতে বারণ করেছিলেন। যোগেন্দ্র তার সে নিষেধ শোনেনি।

ডিসেম্বরের ৫ তারিখে আমরা বাবরি মসজিদের পাশে গিয়ে পৌঁছাই। আমরা রাত কাটাই পার্শ্ববর্তী কিছু বাড়ির ছাদে। উত্তেজনায় আমাদের ভেতরটা টগবগ করছিল। বাবরি মসজিদ ভাঙার জন্য আমাদের তর সইছিল না। গেল বছরের অক্টোবরেও আমরা একই রকম একটা উদ্যোগ নিয়েছিলাম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পরিকল্পনা সফল হয়নি। কিন্তু এবারে আর খালি হাতে ফিরব না, এই ছিল পণ।

৬ই ডিসেম্বর, সকাল। উমা ভারতীর জ্বালাময়ী ভাষণ আমাদের উত্তেজনার আগুনে বারুদ ঢালল। আমি একটা কুড়াল নিয়ে বাবরি মসজিদের চূড়ায় চড়ে বসলাম। যোগেন্দ্র আমার সাথি হলো। উমা ভারতী[১০] যখন স্লোগান তুলল 'ভেঙে ফেল ওই মসজিদ!' আমি তীব্র বেগে আমার কুঠার দিয়ে মসজিদের গম্বুজে আঘাত করলাম। আকাশ বিদীর্ণ করে আওয়াজ তুললাম 'ভগবান রামের জয়!'

একসময় আমাদের চোখের সামনেই পুরো মসজিদ ধুলায় মিশে গেল। আমরা আনন্দচিত্তে নিচে নেমে এলাম। ভগবান রামের প্রতি ভক্তি, ভালোবাসায় লুটিয়ে পড়লাম সিজদায়।

আমরা মসজিদের দুটো ইট সাথে করে নিয়ে এসেছিলাম। পানিপথের মানুষেরা সে ইট দেখতে পেয়ে অত্যন্ত উৎফুল্ল হয়ে উঠল। ইটগুলোকে রাখা হলো শিবসেনার অফিসে।

www.pathagar.com

এ উপলক্ষ্যে এক সংবর্ধনার আয়োজন করা হলো। মসজিদে প্রথম আঘাতকারী হিসেবে আমার নাম ঘোষণা করা হলো। সবাই আমার নামে জয়োধ্বনী দিল। চারদিকে তখন আমার বেশ নাম-ডাক।

বাড়িতে ফিরে বাবাকে সব কথা বলতেই বাবা রেগে আগুন হয়ে গেলেন। তিনি আমাকে বললেন, বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে। কারণ, আমি ঈশ্বরের ঘর ধ্বংস করে এসেছি। তিনি আমাকে আরও বললেন, আমি যেন তার জীবদ্দশায় কখনোই আর বাড়ি ফিরে না আসি। তিনি এতটা উত্তেজিত হয়ে উঠবেন, এতটা রেগে যাবেন আমি ভাবতেই পারিনি।

আমি তাকে নানাভাবে বুঝাতে চেষ্টা করলাম, আমি কতটা সক্রিয়ভাবে মসজিদ ভাঙায় অংশ নিয়েছি আর মানুষের মাঝে আমার জনপ্রিয়তা কী পরিমাণ বেড়েছে। তিনি আমার কোনো কথাই কানে তুললেন না। আমার উত্তর শুনে তিনি নিজেই বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে উদ্যোগী হলেন। আমার মতো সন্তানের সাথে এক গৃহে বসবাস করা তার পক্ষে সম্ভব নয়।

'ঠিক আছে, তবে আমিই বাড়ি ছেড়ে যাচ্ছি, আমি তাকে প্রণাম জানিয়ে বাড়ি ছেড়ে নেমে এলাম পথে। এমন 'রাম' বিদ্বেষী মানুষের সাথে আমারও বসবাস করা সম্ভব নয়।

বাবার উপর রাগ করে তীব্র মনোজ্বালা নিয়ে বাইরে এলাম ঠিকই, কিন্তু আল্লাহ পাক আমার জন্য ভিন্ন চিন্তা করে রেখেছিলেন। বাবরি মসজিদ ভাঙায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণকারী ব্যক্তির জীবনটা যে এমন করে তিনি বদলে দিবেন, সে কি কেউ ভেবেছিল? না কারও পক্ষে চিন্তা করা সম্ভব ছিল?

যোগেন্দ্রের পাপ ও প্রায়শ্চিত্ত

একদিন যোগেন্দ্র বাবরি মসজিদের ইটগুলো নিয়ে এল সাথে করে। তারপর উপস্থিত জনতাকে বলল, এগুলোর উপর প্রস্রাব করার জন্য। উন্মত্ত জনতা বিপুল উত্তেজনা আর হই হুল্লোড়সহ লেগে গেল প্রস্রাব করতে। কিন্তু বিশ্ব সংসারের উপর মহান প্রভু এটা আর সহ্য করেননি।

কী জানি কেন, ৪/৫ দিন পরে যোগেন্দ্রের পুরো মাথা খারাপ হয়ে গেল। সে আচরণ করতে লাগল বদ্ধ উন্মাদের মতো। পরনে পোশাক-আশাক রাখতে চাইত না। গায়ের জামা ছিঁড়ে কুটিকুটি করতে চাইত। সম্ভ্রান্ত জমিদারের একমাত্র পুত্র প্রায় নগ্ন হয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছে, এ ভাবা যায়?

www.pathagar.com

যোগেন্দ্র সহ্যের সকল সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছিল। সে কয়েকবার তার মায়ের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে শারিরীকভাবে হেনস্তা করতে উদ্যত হয়েছিল। তার বাবা ছেলের রোগ সারাতে কত কী করে গেলেন। কত মাদুলি, তাবিজ-কবজ, কত সিদ্ধপুরুষের পানি পড়া, কিছুতেই কিছু হলো না। তিনি কায়মনোবাক্যে ছেলের জন্য ঈশ্বরের কাছে ক্ষমা চাইলেন। আশেপাশের দরিদ্রদের মাঝে দান খয়রাত করলেন। কিন্তু যোগেন্দ্রের অবস্থার কোনো উন্নতি হলো না।

একদিন যোগেন্দ্র তার মায়ের শ্লীলতাহানির চেষ্টা করল। আশেপাশের প্রতিবেশীদের হস্তক্ষেপে সে যাত্রা তাকে নিবৃত্ত করা গেল। যোগেন্দ্রের বাবা এই ঘটনায় এতটাই ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন যে, তিনি চাইলেন ছেলেকে গুলি করে মেরে ফেলতে। এমন কুলাঙ্গার সন্তানের বেঁচে থাকার চেয়ে মরে যাওয়া হাজার গুণ ভালো।

শোনিপথের ঈদগাহ সংলগ্ন এক মাদরাসায় মাওলানা কলিম সিদ্দিকী প্রায়ই আসতেন। একদিন এক প্রতিবেশী যোগেন্দ্রের বাবাকে পরামর্শ দিলেন, তিনি যেন যোগেন্দ্রকে সাথে নিয়ে তার সাথে দেখা করেন। আরেক দোকানি বলল, স্থানীয় মসজিদের ইমামের সাথে যোগাযোগ করতে। ওই ইমামের সাথে মাওলানার সুসম্পর্ক ছিল।

বাবরি মসজিদ ধ্বংসের পরে মাওলানা ওই মসজিদে ভাষণ দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, এই ঘটনার পেছনে মুসলিমদেরও কিছুটা দায় আছে। মুসলিমরা হিন্দুদের কাছে ইসলামের সঠিক দাওয়াত দিতে ব্যর্থ হয়েছেন। মাওলানা প্রায় দোয়া করতেন, যাতে এমন হিন্দুদের কাছে ইসলামের দাওয়াত সঠিকভাবে পৌঁছে দেয়া যায়।

যোগেন্দ্রের পিতা চৌধুরি রঘুবীর সিং মসজিদের ইমামের সাথে দেখা করলেন। আকুতি জানালেন ছেলের সুস্থ্যতার জন্য তিনি যেন তাবিজ দেন। ইমাম সাহেব তাবিজ না দিয়ে তাকে মাওলানার সাথে দেখা করতে বললেন।

ইমাম সাহেব যোগেন্দ্রের পিতাকে বললেন, যোগেন্দ্রের উপর আল্লাহ প্রদত্ত অভিশাপ নেমে এসেছে। এর থেকে মুক্তি মিলতে পারে কেবল সঠিক সময়ে ইসলাম কবুলের মাধ্যমেই।

নির্দিষ্ট দিনে যোগেন্দ্রের পিতা শেকল বাঁধা প্রায় নগ্ন যোগেন্দ্রকে সাথে নিয়ে মাওলানার পায়ের উপর পড়লেন, 'আমি এই ছেলেকে হাজার বার নিষেধ করেছি, সে যাতে এই অপকর্মে না জড়ায়। কিন্তু কিছু উন্মত্ত দুর্বৃত্তের প্ররোচনায় সে আমার কোনো কথা-ই কানে তোলেনি। আজ আমার পারিবারিক মানসম্মান সব ধুলায় লুটাতে যাচ্ছে। আমাদের ক্ষমা করুন। দয়া করে আমার পরিবার আর পরিবারের সম্মানকে আপনি বাঁচান।'

www.pathagar.com

মাওলানা দৃঢ় ভাষায় তাদের উঠে দাঁড়াতে বললেন। বললেন, 'যারা মহান স্রষ্টার পবিত্র ঘর এভাবে ভেঙেছে, তাদের অপরাধ এতটাই মারাত্মক, এতটাই জঘণ্য, সর্বশক্তিমান আল্লাহর আদেশে সারাবিশ্ব ধ্বংস হয়ে যেতে পারত সে অপরাধের কারণে। অপরাধের তুলনায় আপনার ছেলের বয়ে বেড়ানো যন্ত্রণা, কষ্ট খুব সামান্যই। কিন্তু এই ঘটনার জন্য আমাদের মুসলিমদেরও দায় আছে। আমরা মসজিদ ধ্বংসকারীদের সামনে ইসলামের সঠিক বার্তা পৌঁছে দিতে পারিনি। আসলে গোটা দেশের আপামর জনতা সবারই আল্লাহর সামনে মাথা নত করে ক্ষমা চাওয়া উচিত, তার রহমত প্রার্থনা করা উচিত।'

মাওলানা সাহেব যোগেন্দ্রের পিতা চৌধুরী সাহেবকেও তাই করতে বললেন। চৌধুরী আবার মাওলানার পায়ের উপর পড়লেন, 'আপনি যা বলেন, আমি তা-ই করব। দয়া করে আমার ছেলেকে ভালো করে দিন।'

মাওলানা নামায পড়লেন। তারপর উপস্থিত লোকদের নিয়ে যোগেনের জন্য দোয়া করলেন। মাওলানা চৌধুরী সাহেবকে কিছু নাস্তা খেতে দিলেন। লোকজন অবাক বিস্ময়ে লক্ষ্য করল, পাগলা যোগেনের মধ্যে কিছু পরিবর্তন এসেছে। সে নিজ থেকে মাথার পাগড়ি দিয়ে তার লজ্জাস্থান ঢেকে রেখেছে। মাওলানা চৌধুরী সাহেবকে আহবান জানালেন, তিনি যেন ইসলাম ক্ববুল করেন। নয়তো তার ছেলে আবার আগের মতো পাগল হয়ে যেতে পারে। চৌধুরী সাহেব রাজি হলেন।

দিন কয়েক পরে তিনি মসজিদের উদ্দেশ্যে চললেন, মুসলিম হতে। যোগেন বলল, সেও মুসলিম হতে চায়। চায় বাবরি মসজিদ পুননির্মাণের জন্য কাজ করতে। তারা দুজন অযু করে মসজিদে প্রবেশ করলেন। ইসলাম কবুলের পর তাদের নাম রাখা হয় মুহাম্মাদ উসমান ও মুহাম্মাদ উমর। গ্রামে ফিরে এলে তাদের ইসলাম কবুলের খবর সারা গ্রামে ছড়িয়ে পড়ে। কিছু স্থানীয় প্রভাবশালী হিন্দু পরিকল্পনা করল তাদেরকে হত্যা করার জন্য। কিন্তু কোনোভাবে এই খবর ফাঁস হয়ে যায়। পৌঁছে যায় স্থানীয় ইমামের কানে।

তৎক্ষণাৎ তাদের ফুলাত পাঠিয়ে দেয়া হয়। সেখান থেকে তারা তাবলীগ জামাতের সাথে ৪০ দিনের জন্য বেরিয়ে পড়েন। পরবর্তী সময়ে যোগেনের মা-ও ইসলাম কবুল করেন।

বদলে যাওয়া জীবন আমার

বাবরি মসজিদ ভাঙার পরে হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা ভয়ংকর রূপ ধারণ করে। অনেক মুসলিম আমাকে খোঁজা শুরু করল যেকোনো মূল্যে হত্যা করার জন্য।

www.pathagar.com

বাড়ি থেকে বেরিয়ে আমার জীবন কাটে অনেকটা পলায়নপর। মাঠে-ঘাটে পুরোনো ভাঙা বাড়িতে আমার রাত কাটে। এমন অবস্থা হয়, দাড়িওয়ালা কোনো লোক দেখলেই আমি ভয়ে আঁতকে উঠতাম।

১৯৯৩ সালের মার্চ মাসে আমার বাবা মারা যান। বাবরি মসজিদ ভাঙা ও তাতে আমার অংশগ্রহণের ঘটনায় বাবা প্রচণ্ড আঘাত পেয়েছিলেন। তিনি মাকে তার সুতীব্র ব্যথা আর হতাশার কথা বলতেন। বলতেন, পুনর্জন্মে যেন তার মুসলিম পরিবারে জন্ম হয়। তিনি কঠোরভাবে নিষেধ করেছিলেন তার শেষকৃত্যে আমি যেন কোনোভাবেই অংশ না নেই। তাকে যেন মুসলিম রীতিতে দাফন করা হয়। মা তার শেষ ইচ্ছে ঠিক ঠিক পালন করেছিলেন।

বাবার মৃত্যুর ৮ দিন পরে আমাকে জানানো হয়। বাবার মৃত্যু আর আমার প্রতি তার অনুভূতি জেনে আমার হৃদয় ভেঙে গিয়েছিল। আমি উপলব্ধি করতে পারছিলাম, বাবরি মসজিদ ভাঙা ছিল এক ধরনের স্বেচ্ছাচারিতা। মায়ের সাথে আমি যখনই দেখা করতে যেতাম,তিনি বাবার কথা স্মরণ করে খুব কাঁদতেন। বাবার মতো একজন মহান মানুষের মৃত্যুর জন্য মা আমাকেই দায়ী করতেন। আমি সইতে পারতাম না। শেষে মায়ের সাথে দেখা করাই ছেড়ে দিই।

জুন মাসে মুহাম্মাদ উমর (যোগেন) তাবলীগ থেকে ফিরে আসে। আমাকে শোনায় তার পুরো ঘটনা। ঈশ্বরের অভিশাপের ভয় এমনিতেই আমাকে তাড়া করে ফিরছিল। উমারের ঘটনা শুনে আমি আরও ভীত হয়ে পড়লাম। উমর আমাকে মাওলানা সাহেবের কাছে নিয়ে গেল। তিনি আমাকে বললেন 'মহাবিশ্বের প্রভু যোগেনের মতোই তোমাকে শাস্তি দিতে পারেন। এই ভুবনে না হলেও পরকালীন জীবনে তোমার জন্য ভয়াবহ শাস্তি অপেক্ষা করছে। একমাত্র ইসলাম গ্রহণ আর আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়ার মধ্য দিয়েই তোমার মুক্তি মিলতে পারে।'

আমি ঘণ্টাখানেক গভীর ভাবনায় ডুবে গেলাম। একসময় সিদ্ধান্ত নিলাম, পরকালীন শাস্তি থেকে মুক্তি পেতে ইসলামই আমার জন্য একমাত্র পথ। আমি তাকে অনুরোধ করলাম, তিনি যেন আমাকে তার সাথে রাখেন। আমি তার সাথে হরিয়ানা দিল্লি খুরজা হয়ে ফুলাত এসে পৌছালাম। সেখানে সে বছরের জুন মাসে আমি ইসলাম কবুল করি। মাওলানা আমাকে বললেন, ফুলাতে কিছুকাল থেকে যেতে। যেন আমি ইসলাম সম্পর্কে আরও গভীর জ্ঞান অর্জন করতে পারি।

তিন মাস পরে আমার স্ত্রীও ইসলাম কবুল করেন।

আমার মা আমার ইসলাম গ্রহণের খবরে খুবই খুশি হয়েছিলেন। মা বলতেন, বাবা বেঁচে থাকলে আজ তার চেয়ে খুশি আর কেউ হতে পারত না। কিছু দিন পরে মা-ও ইসলাম কবুল করেন।

www.pathagar.com

ইসলাম কবুলের পরে আমি আর মুহাম্মাদ উমর এক নতুন সিদ্ধান্ত নিই। আমরা শপথ করি, ভেঙে পড়া মসজিদগুলোর সংস্কারের কাজ করব। নতুন নতুন মসজিদ গড়ব, যাতে আমাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়। আমাদের লক্ষ্য অন্তত ১০০ মসজিদের সংস্কার এবং নতুন করে ১০০ মসজিদ নির্মাণ করা। আল্লাহর রহমতে ২০০৯ সাল পর্যন্ত আমরা ৬৭টি মসজিদের সংস্কার করি। নতুন মসজিদ নির্মাণ করি প্রায় ৩৭টি। প্রতি বছর ৬ই ডিসেম্বরে আমরা অন্তত একটি মসজিদের সংস্কার ও একটি নতুন মসজিদ নির্মাণ করে আসছি। এই সেই দিন, যেদিন বাবরি মসজিদ আমরা নিজ হাতে ভেঙেছিলাম।

আল্লাহর রহমতে আমাদের কাজ খুব সুন্দরভাবে এগিয়ে চলছে। উমর ভাই এ কাজের নেতৃত্ব দিচ্ছেন।

আমার পরিবারে আমার মায়ের সাথে আমার এক বড় ভাইও আছেন। ভাইয়ার চার-চারটি সন্তান। এর মাঝে একটি ছেলে শারীরিকভাবে প্রতিবন্ধী। আমার ভাবি মারা যান বছর চারেক আগে। সে থেকে আমার স্ত্রীই বাচ্চাদের দেখাশোনা করে আসছিল। ভাইয়া এ জন্য আমার স্ত্রীর প্রতি খুব কৃতজ্ঞ ছিল। আমি ভাইকে ইসলামের দাওয়াত দেই। ভাইয়া আমার উপর খুব একটা সন্তুষ্ট ছিলেন না। কারণ, আমি বাবার মনে অনেক কষ্ট দিয়েছিলাম।

একদিন আমি আমার স্ত্রীকে বললাম, 'দেখ আমাদের বাচ্চারা এখন বড় হয়ে গেছে। তুমিও ভাইয়ার বাচ্চাদের খুব ভালোভাবেই দেখাশোনা করে আসছ। স্ত্রী মারা যাবার পর থেকেই ভাইয়ার মনটা খুব খারাপ থাকে। এক কাজ করলে কেমন হয়? ভাইয়া যদি ইসলাম গ্রহণ করে আর তুমি যদি রাজি থাক, তবে আমি তোমাকে তালাক দিয়ে দিই। ইদ্দত পালন শেষে তুমি ভাইয়াকেই বিয়ে করে নিলে। দেখ, আল্লাহ এই সম্পর্কে বরকত দিবেন।'

প্রথমটায়তো আমার স্ত্রী রেগে আগুন হয়ে গেল। সে কোনোভাবেই এমন প্রস্তাব মন থেকে মেনে নিতে পারছিল না। শেষে অনেক আলাপ আলোচনা আর বোঝানোর পর সে সম্মতি দিল।

এবার আমি ভাইয়াকে বুঝাতে শুরু করলাম। শুরুতে ভাইয়াও রাজি হননি। বলতেন, মানুষ কী ভাববে, পরিবারের দুর্নাম হবে...এই সব। আমি যুক্তি দিলাম এই প্রস্তাব সব দিক দিয়েই যৌক্তিক। আর ইসলামেও এর অনুমোদন আছে। শেষে তিনিও রাজি হলেন। ইদ্দত শেষে তারা পরস্পর বিয়ে করে নেয়। বর্তমানে তারা সুখেই আছেন।

www.pathagar.com

মাওলানা সাহেবের পরামর্শে আমিও একজন বয়স্কা নওমুসলিম মহিলাকে বিয়ে করি। আল্লাহর রহমতে আমরাও ভালো আছি। আমি বর্তমানে একটি English Medium স্কুল চালাই। আমি বাচ্চাদের ইসলামের বিভিন্ন বিষয় শেখাই।

আপনাদের প্রতি অনুরোধ

আমি প্রত্যেক মুসলিম ভাই ও বোনদেরকে অনুরোধ করি, আপনারা আপনাদের জীবনের উদ্দেশ্য অনুধাবন করুন। মুসলিম হিসেবে আমাদের দায়িত্ব, আমাদের কর্তব্য হলো অন্য মানুষদের কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে দেয়া; প্রতিশোধ কিংবা প্রতিঘাতের মনোবৃত্তি জাগিয়ে তোলা নয়।

আমার শুধু মনে হয়, আজ যদি সাধারণ হিন্দু ভাইবোনেরা ইসলাম, কুরআন, মসজিদ সম্পর্কে সঠিকভাবে জানতেন, যদি বাল থ্যাকারে[১১], উমা ভারতীর মতো প্রমুখ নেতারা সত্যিকারে ইসলামের শিক্ষা সম্পর্কে জানতেন, তবে হয়তো বাবরি মসজিদ ভাঙার মতো এমন নির্লজ্জ কাজ সংঘটিত হতো না। হিন্দুদের মধ্যে শতকরা ৯৯ জনই আমার বাবার মতো। যারা মানবতায় বিশ্বাস করে, ইসলামকে মন থেকে শ্রদ্ধা করে।

আমার বাবা অমুসলিম হিসেবে মারা গিয়েছেন। আজ যদি তার কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছাত, আমার বিশ্বাস তিনি একজন মুসলিম হিসেবেই দুনিয়া থেকে বিদায় নিতেন।

বাবার কথা মনে হলে আজও আমার নির্ঘুম রাত কাটে। মনের নিভৃত কোণে অশ্রু ঝরে।

হায়! আমি যদি আরও আগেই মুসলিম হয়ে আমার বাবাকে ইসলামের দাওয়াত দিতে পারতাম...

পরিচিতি

বলবীর সিং ওরফে মুহাম্মাদ আমির ছিলেন ভারতে ১৯৯১ সালে বাবরি মসজিদ ভাঙা হিন্দুদের একজন। মসজিদের গম্বুজে তিনিই ছিলেন কুঠার হাতে প্রথম আঘাতকারী। এই মানুষটিই একসময় অনুতপ্ত হয়ে আশ্রয় নেন, ইসলামের ছায়াতলে। Mumbai Mirror, দৈনিক আনন্দবাজার, দৈনিক প্রথম আলো ও Winds of Islam অবলম্বনে এই কাহিনি তাঁর এই বদলে যাওয়ার গল্পের রূপান্তর।

www.pathagar.com

পাদটিকা

১. পানিপথ : উত্তর-পশ্চিম ভারতের হরিয়ানা রাজ্যের পানিপাত জেলার একটি শহর। এখানে ভারত উপমহাদেশের ইতিহাসে পানিপথের যুদ্ধ হিসেবে খ্যাত তিনটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। বর্তমানে এটি একটি শিল্প নগরী এবং তাঁত শিল্পের জন্য বিখ্যাত। এখানে দিল্লির লোদী বংশীয় সর্বশেষ সুলতান ইবরাহিম লোদীর কবর আছে।

২. দেশ বিভাগ : ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট ব্রিটিশ ভারত ভেঙে পাকিস্তান ও ভারত নামে দুটি সার্বভৌম রাষ্ট্র গঠন করা হয়। ইতিহাসে এটি দেশ বিভাগ নামে পরিচিত।

৩. শিবসেনা : শিবসেনা হলো মহারাষ্ট্র কেন্দ্রিক উগ্র হিন্দু জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক দল। ১৯ শে জুন ১৯৬৬ সালে বাল ঠাকরে এই দলের প্রতিষ্ঠা করেন। দলটির সদস্যরা শিবের সৈনিক হিসাবে পরিচিত।

৪. মি. আদভানি : ভারতীয় জনতা পার্টি তথা বিজেপির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও শীর্ষস্থানীয় নেতা। তিনি ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও প্রধানমন্ত্রীর ডেপুটি হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছিলেন। বাবরি মসজিদ ভাঙা ও দাঙ্গার পেছনে তার ভূমিকাকে দায়ী করা হয়।

৫. শিবাজী : শিবাজী ভোঁসলে অথবা ছত্রপতি শিবাজী রাজে ভোঁসলে (১৯ ফেব্রুয়ারি ১৬৩০ - ৩ এপ্রিল ১৬৮০), হলেন মারাঠা সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি মুঘল সাম্রাজ্যের সাথে বেশ কয়েকবার যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েন এবং হেরে যান। তিনি একটি স্বাধীন মারাঠা সাম্রাজ্যের পত্তন করেন, যার রাজধানী ছিল রায়গড়ে। তিনি ১৬৭৪ সালে মারাঠা সাম্রাজ্যের রাজা 'ছত্রপতি' হিসেবে মুকুট ধারণ করেন। 'স্বরাজ' নামে তিনি একটি রাজনৈতিক মতবাদ প্রচার করেন, যার মূল বক্তব্য হলো ভারতীয়রাই ভারত শাসন করবে। বিদেশিদের ভারত শাসনের অধিকার নেই।

৬. লাখনৌ : ভারতের উত্তর প্রদেশের রাজধানী। এটি ভারতের ১১ তম জনবহুল শহর। মুঘল সাম্রাজ্যের স্মৃতি বিজড়িত এই শহর নানা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের জন্য বিখ্যাত।

৭. মুলায়াম সিং যাদব : উত্তর প্রদেশের সমাজবাদী দলের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি বাবরি মসজিদ ভাঙার সময়ে উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন।

৮. বাবরি মসজিদ : ভারতবর্ষে মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা জহিরুদ্দীন মুহাম্মদ বাবরের নির্দেশে মীর বাকী ১৫২৮-২৯ সালে এটি নির্মাণ করেছিলেন। এই মসজিদ বিরাট উত্তর প্রদেশের বৃহত্তম মসজিদগুলোর একটি হিসেবে গণ্য হতো। বাবরি মসজিদ নিয়ে হিন্দু-মুসলিম দ্বন্দ্ব-সংঘাত এবং মামলা-মোকদ্দমার সূচনা হয়েছে এটি নির্মাণ করার কয়েকশ বছর পর।

জানা যায়, ১৮৫৩ সালে একদল হিন্দু 'সাধু' সর্বপ্রথম বাবরি মসজিদ চত্বর দখল করে এর ওপর মালিকানা দাবি করেছিলেন। ফলে পরের দুই বছর এ নিয়ে মাঝেমধ্যে সহিংস ঘটনা ঘটেছে। এ অবস্থায় প্রশাসন এখানে মন্দির নির্মাণের অনুমতি যেমন দেয়নি, তেমনি এটাকে প্রার্থনার জন্য ব্যবহার করতে দিতে চায়নি।

১৮৫৫ সালে হিন্দু-মুসলিম সংঘর্ষের পর মসজিদের সীমানা দেয়াল তোলা হয়, যাতে বিবাদ এড়ানো যায়। এরপর মুসলমানরা দেয়ালের ভেতরে নামায পড়তেন এবং হিন্দুরা বাইরে একটি উঁচু চত্বরে পূজা করতেন। ১৮৮৩ সালে এই চত্বরে মন্দির নির্মাণের উদ্যোগ নেয়া হলে মুসলমানরা প্রতিবাদ জানান এবং প্রশাসন মন্দির নির্মাণে নিষেধাজ্ঞা জারি করে। তখন জনৈক হিন্দু পুরোহিত দেওয়ানি মামলা করেন। জবাবে মসজিদের মুতাওয়াল্লি বলেন, পুরো জমিটাই বাবরি মসজিদের সম্পত্তি। একজন হিন্দু বিচারকই পুরোহিতের মামলা খারিজ করে দেন। এর বিরুদ্ধে পরপর দুইবার আপিল করা হলে সেটাও খারিজ হয়ে যায়।

www.pathagar.com

এরপর প্রায় অর্ধশতাব্দী কেটে যায়। ১৯৩৪ সালে অযোধ্যায় দাঙ্গা বাঁধলে দাঙ্গাকারীরা মসজিদের দেয়ালগুলো এবং একটি গম্বুজের ক্ষতি করে। সরকার তা পুনর্নির্মাণ করে দেয়। ১৯৩৬ সালে আইন মোতাবেক বাবরি মসজিদ ও সংলগ্ন গোরস্তান ওয়াকফ সম্পত্তি হিসেবে রেজিস্ট্রি করা হয়।

ভারত স্বাধীন হওয়ার পরই বাবরি মসজিদ ইস্যু চরম আকার নিয়েছে। ১৯৪৯ সালে 'নিখিল ভারতীয় রামায়ণ মহাসভা' মসজিদের ঠিক বাইরেই ৯ দিন ধরে অবিরাম রামচরিত মানস পাঠের আয়োজন করে। এই কর্মসূচি শেষ হওয়ার সাথে সাথে রাতের বেলায় ৫০-৬০ জন মসজিদে ঢুকে রাম ও সীতার মূর্তি সেখানে স্থাপন করে। পরদিন মাইকে ঘোষণা দেয়া হলো, 'বাবরি মসজিদের ভেতরে অলৌকিকভাবে মূর্তির আবির্ভাব ঘটেছে।' এটা দর্শন করে পুণ্য সঞ্চয়ের জন্য ভক্তদের প্রতি আহ্বান জানানো হয়। ফলে হাজার হাজার হিন্দু নর-নারী সেখানে আসতে শুরু করেন। এ অবস্থায় সরকার মসজিদটিকে 'বিতর্কিত এলাকা' ঘোষণা করে গেটে তালা লাগিয়ে দেয়।

১৯৮৪ সালে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ 'মন্দির ধ্বংস করে বাবরি মসজিদ নির্মাণ' করার প্রচারণা চালায় দেশব্যাপী। ৯২ সালে বিজেপির শীর্ষ নেতা এল কে আদভানির নেতৃত্বে ১০ হাজার কিলোমিটার রথযাত্রা করা হয়, বাবরি মসজিদের জায়গায় মন্দির স্থাপনের লক্ষ্যে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য। ৬ ডিসেম্বর কয়েক হাজার লোক পূজা করা এবং 'করসেবা'র লক্ষ্যে বাবরি মসজিদ প্রাঙ্গণে সমবেত হয়। একপর্যায়ে তারা মসজিদটি ভেঙে গুঁড়িয়ে দেয়।

ভারত সরকারের গঠিত 'লিবেরহান কমিশন' তদন্ত করে এল কে আদভানি, অটল বিহারি বাজপেয়ী ও কল্যাণ সিংসহ ৬৮ জনকে দায়ী করেছে বাবরি মসজিদ ধ্বংসযজ্ঞের জন্য।(তথ্যসূত্র- বাবরি মসজিদ ধ্বংসের সে ট্রাজেডি, মীযানুল করীম, দৈনিক নয়া দিগন্ত, ৬ই ডিসেম্বর ২০১৬)

৯. অযোধ্যা : যা সাকেত নামেও পরিচিত। এটি একটি প্রাচীন ভারতীয় শহর। মনে করা হয় এই শহর সংস্কৃত মহাকাব্য রামায়ণে উল্লিখিত হিন্দু দেবতা রামের জন্মস্থান। এর অবস্থান দক্ষিণ ভারতের উত্তর প্রদেশের ফৈজাবাদ শহরে। অতীতে অযোধ্যা প্রাচীন কোশল রাজ্যের রাজধানী ছিল।

১০. উমা ভারতী : বিজেপির অন্যতম শীর্ষস্থানীয় নেতা। তিনি প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীর সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। বাবরি মসজিদ ভাঙাকালীন তাঁর ভূমিকা অত্যন্ত আলোচিত ও সমালোচিত হয়।

১১. বাল থ্যাকারে ওরফে বালাসাহেব ঠাকরে : (জন্ম: ২৩ জানুয়ারি ১৯২৬, মৃত্যু: ১৭ নভেম্বর ২০১২) একজন ভারতীয় রাজনীতিবিদ, শিবসেনা দলের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান। তিনি হিন্দু জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী ছিলেন ও হয়ে উঠেছিলেন মারাঠিদের হৃদয়ের সম্রাট। তার মূল রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড মূলত পশ্চিম ভারতের মহারাষ্ট্র রাজ্যের মারাঠি ভাষীদের মধ্যে ছিল।

www.pathagar.com

শৈলেশের গল্প

সালাহ উদ্দিন প্যাটেল

এক

ইংল্যান্ডের লন্ডন শহর। এই শহরেরই এক ছোট বালক শৈলেশ।

শৈলেশের বাবা ভারতীয়, মা আফ্রিকান। ১৯৮০ দশকের কোনো একসময়ে শৈলেশের বেড়ে উঠা। তার ছেলেবেলা কাটত Night Riders, Dallas, Thunder Cats, Dynasty-এর মতো তখনকার জনপ্রিয় সব টিভি সিরিজগুলো দেখে। ছোট্ট শৈলেশ মুগ্ধ হয়ে সেসব টিভি সিরিজে ডুবে থাকত। নিজেকে কল্পনা করত একেকটি সিরিজের নায়ক হিসেবে।

এখনকার মতো মানুষের হাতে হাতে তখন স্মার্ট ফোন ছিল না। ছিল না বিনোদনের এত কিছু। একটা বড় টিভিই ছিল যত আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু। মাঝে মাঝে ভিসিআরে সিনেমা দেখা হতো। ভিসিআরে ক্যাসেট ঢুকিয়ে চালু হবার জন্য মিনিট কয়েক অপেক্ষা করতে হতো। কখনো কখনো ভিডিও গেমস খেলার সুযোগ হতো, তাও একই কায়দায়। টিভির সাথে প্লেয়ার লাগানো হতো। তারপর ভেতরে ক্যাসেট দিয়ে চালানো হতো।

সে সময়ের শিশুরা ইচ্ছেমতো পার্কে গিয়ে দৌড়াদৌড়ি করত। মা-বাবারা বাচ্চাদের বাইরে যাওয়া নিয়েও এত চিন্তিত থাকত না। সব মিলিয়ে সময়টা ভালোই কাটত শৈলেশের।

কিন্তু এর বাইরেও তার আরেকটা জীবন ছিল। একটি হিন্দু পরিবারে জন্ম নেয়ায় তাকে অনেক ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান মানতে হতো। শৈলেশ মন্দিরে যেত। দিওয়ালী, দীপাবলি, হোলি ইত্যাদি নানা অনুষ্ঠান পালন করত।

www.pathagar.com

মন্দিরে গিয়ে ছোট ছেলেটা আকাশ ছোঁয়া মূর্তিগুলোকে খুব ভালো করে খেয়াল করত। শরীর, গঠন কাঠামো মানুষের মতো। কিন্তু চেহারা একেকজনের একেক রকম। কারও মাথা মানুষের মতো, কারও মাথায় হাতির শুঁড় লাগানো, আবার কেউবা অর্ধেক বানর, অর্ধেক মানুষ। শিব, কৃষ্ণ, রাম...অনেক দেবতা মূর্তিরূপে দাঁড়িয়ে থাকত মন্দিরে।

একটা হিন্দু পরিবারে বড় হওয়া ছোট্ট ছেলেটি নিয়মিত ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান পালন করতে চেষ্টা করত। নিজেকে একজন ভালো মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে সচেষ্ট থাকত। কখনো কখনো আকাশ ছোঁয়া বিশাল বিশাল মাটির মূর্তি দেখে তার মনে ভয় জাগত। দিনে দিনে হিন্দু ধর্মের বিভিন্ন নিয়ম-কানুন, বিধি-নিষেধ, দর্শনের সাথে ছেলেটির পরিচয় ঘটল।

ছেলেটি জানল, হিন্দু শব্দটি একটা ফার্সি শব্দ। যার মানে ইন্দু নদ কিংবা ইন্দু পর্বতের আশেপাশে বসবাসকারী মানুষেরা। জানল, এই ধর্মের অন্যতম মৌলিক বিশ্বাস হলো, সর্বেশ্বরবাদ (Pantheism)। অর্থাৎ স্রষ্টা তার সমস্ত সৃষ্টির মাঝে বিরাজমান। ইট কাঠ পাথরের মাঝেও ঈশ্বর আছেন। আছেন সমগ্র সৃষ্টির সত্তা জুড়ে।

ছেলেটি আরও জানল, হিন্দু ধর্মের ঈশ্বরের সংখ্যা অনেক। একেক গোষ্ঠীর কাছে সংখ্যাটা একেক রকম। কেউ বলেন হাজার হাজার। কেউ বলেন লাখ লাখ। আবার কেউবা বলেন তেত্রিশ কোটি।

এই ধর্মে আরেকটা বিশ্বাস আছে অবতারবাদ (Anthropomorphism)। অবতারবাদের মূল কথা হলো, ঈশ্বর একজন মানুষ হয়ে দুনিয়াতে নেমে আসেন। খ্রিষ্টানরা যেমন বিশ্বাস করে, যিশুখ্রিষ্ট মূলত ঈশ্বর। কিন্তু মানুষ হয়ে পৃথিবীতে নেমে এসেছেন।

হিন্দু ধর্মের বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ সম্পর্কেও ছেলেটির ভালো ধারণা জন্মাল। এই ধর্মে মৌলিক ধর্মগ্রন্থ অনেক। বেদ, গীতা, মহাভারত, রামায়ণ, উপনিষদ... সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বেদ, যা সংস্কৃত ভাষায় লেখা। এটি বহু প্রাচীন একটি গ্রন্থ। ঠিক কবে বেদ লেখা হয়েছে সুনিশ্চিতভাবে বলা কঠিন। কারও মতে দশ হাজার বছর আগে, কারও মতে তার চেয়েও অনেক বেশি পুরোনো।

এরপরে আছে উপনিষদ। প্রাচীন ভারতে গুরু শিষ্যের পদ্ধতি বর্তমান ছিল। গুরু বলে যেতেন, আর শিষ্যরা তার সামনে মাটিতে বসে মনোযোগ দিয়ে শুনত। গুরুদের কাছ থেকে শেখা বিভিন্ন শিক্ষার লিখিত রূপই হলো উপনিষদ। ভগবত গীতা মূলত মহাভারতেরই একটা অংশ। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে যখন পান্ডব আর কৌরবগণ মুখোমুখি হয়, তখন অর্জুন তার জ্ঞাতি ভাইদের বিরুদ্ধে অস্ত্র হাতে নিতে ইতস্তত করছিলেন।

www.pathagar.com

কৃষ্ণ এসে ন্যায়ের পথে যুদ্ধ করতে তাকে উদ্বুদ্ধ করেন। কৃষ্ণের এই সব উপদেশের সংস্করণই গীতা। গীতা পুরোটাই পদ্য আকারে লেখা।

এরপরে আছে রামায়ণ। ভগবান রাম তার ভাই লক্ষণ ও স্ত্রী সিতাকে নিয়ে যান বনবাসে। একদিন সীতা একটি হরিণ দেখে ভগবান রামকে অনুরোধ করেন, হরিণটি শিকার করে এনে দিতে। রাম তার পেছন পেছন ছুটতে থাকেন। ছুটতে ছুটতে রাম একসময় গহীন বনে হারিয়ে যান। ইতোমধ্যে রাক্ষসরাজ রাবন এসে সীতাকে অপহরণ করে নিয়ে যান দ্বীপদেশ শ্রীলঙ্কায়। রাম ঘরে ফিরে দেখেন, সীতা নেই। খবর পান, তাকে অপহরণ করা হয়েছে। তিনি বুঝতে পারেন, সেই হরিণ ছিল আসলে মায়া হরিণ। ভুলিয়ে ভালিয়ে তাকে বাড়ি থেকে দূরে রাখতেই রাক্ষসেরা এই হরিণকে পাঠিয়েছিল।

রাম তার ভাই লক্ষণ ও দেবতা হনুমান (যার শরীর অর্ধেক মানুষ অর্ধেক বানর) কে সাথে নিয়ে লঙ্কা জয় করেন। রাবণ নিহত হয়। রাম স্ত্রীসহ আবার ফিরে আসেন বনে। আশেপাশের গ্রামবাসী তাদের সে বিজয়কে উদযাপন করতে, রাস্তাকে আলোকিত করতে মোমের বাতি জ্বালান। সেই থেকে হিন্দু ধর্মাবলম্বীগণ বাতি জ্বালিয়ে প্রতি বছর দিওয়ালী তথা দীপাবলি উৎসব পালন করেন।

হিন্দু ধর্মের আর একটি বিশ্বাস হলো, জন্মান্তরবাদ (Reincarnation)। অর্থাৎ মানুষ মারা গেলে তিনি শেষ হয়ে যান না। তিনি এই পৃথিবীতে আবার জন্ম নেন। তিনি যদি এই জগতে ভালো মানুষ হিসেবে জীবনযাপন করেন, তবে পরের জন্মে তিনি আবার একজন মানুষ হিসেবে জন্ম নিবেন। কিন্তু তার ক্রিয়াকর্ম যদি খারাপ হয়, পরের জন্মে তিনি হয়তোবা কাকড়া কিংবা বিছা হিসেবেও জন্ম নিতে পারেন। আবার কাকড়া, বিছা...এই প্রাণীগুলোও যদি ভালো হয়, তবে মৃত্যুর পর তারাও মানুষ হিসেবে পুনর্জন্ম নিতে পারে। এভাবেই জন্ম-মৃত্যু, চলতে থাকে।

হিন্দুরা বিশ্বাস করে, যদি কারও প্রতিবন্ধী সন্তান জন্ম নেয়, তবে এই সন্তান পূর্ব জন্মে খুব খারাপ ছিলেন। কর্মফলের কারণেই তার আজ এই দুর্দশা।

আপনি যদি ভালো হিন্দু হন, ধর্মীয় নিয়ম-কানুন সব সঠিকভাবে মেনে চলেন। তখন এমন একটা সময় আসবে যখন আপনাকে আর জন্ম মৃত্যুর ধারাবাহিকতার মধ্য দিয়ে যেতে হবে না। আপনি হবেন ঈশ্বরের আশীর্বাদপ্রাপ্ত পরিপূর্ণ মানুষ। এটাকে বলে মোক্ষ্য লাভ। যেমনটা বৌদ্ধ ধর্মে বলা হয় 'নির্বাণ' লাভ করা।

হিন্দু ধর্মের এই সব মতাদর্শ, নিয়ম-কানুন, বিশ্বাস লন্ডনের মাটিতে বসে বালক শৈলেশ যুক্তি দিয়ে বোঝার চেষ্টা করত। অগণিত ঈশ্বরের ধারণা, ঈশ্বরের মানুষ হয়ে পৃথিবীতে নেমে আসা, কিংবা প্রতিটা কাজের জন্য আলাদা আলাদা দেবতার

www.pathagar.com

নিকট প্রার্থনা করা, ছোট বালকের যুক্তিতে ঠিক বুঝে আসত না। সে ভাবত, এই যে প্রতিমা... সব তো মানুষেরই গড়া। এই প্রতিমাগুলো পড়ে গেলে নিজেদেরই রক্ষা করতে পারে না। তবে কী করে তারা আমাদের কাজে আসবে।

কিন্তু সাধারণত, যুক্তি-বুদ্ধিতে যা-ই মনে হোক না কেন, মানুষ তার পারিবারিক ও সামাজিক রীতি-নীতি পালন করে যায়। বালক শৈলেশও তাই করে যেতে লাগল। দিনে দিনে সে বড় হলো। স্কুল-কলেজের গন্ডি পেরিয়ে পা রাখল ইউনিভার্সিটিতে। তখন তার আশেপাশে অনেক মুসলিম বন্ধুও হলো। এটা এমন একটা বয়স, যখন মানুষ আরও স্বাধীনভাবে চিন্তা-ভাবনা করে। অনেক অনেক ধর্মমত, মতাদর্শ সম্পর্কে সে জানতে পারে।

শৈলেশের জীবনে সে সময় এসে একটা মজার ঘটনা ঘটল। তার এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল মুসলিম। স্কুল জীবন থেকেই পরিচয়। এই ছেলেটার পরিবার ছিল ধার্মিক। তারা মানুষ হিসেবেও খুবই ভালো। ছেলেটি 'জন' নামে একজন খ্রিষ্টান বন্ধুকে নিয়মিত ইসলামের দাওয়াত দিত। দাওয়াহ সম্পর্কিত অনেক বই পুস্তক বিলি করত।

একদিন ঘটনাক্রমে মুসলিম বন্ধুটি 'জন' কে দাওয়াহ সম্পর্কিত পুস্তিকা দেয়ার সময় শৈলেশও সেখানে উপস্থিত ছিল। কিছু পুস্তিকা শৈলেশের হাতেও এল। শৈলেশ যখন সূরা ফাতিহা পড়ল, পড়ল সূরা ইখলাস, সে অভিভূত হয়ে গেল। জানল সত্যিকারের প্রভু কে, কী তার পরিচয়। সে জানল, স্রষ্টা একজনই। তার কোনো শুরু নেই, শেষ নেই। নেই স্ত্রী-পুত্র-সন্তান। স্রষ্টার স্বরূপ কারও চিন্তা, বুদ্ধি, কল্পনার বাইরে। কোনো মানুষই তার আকৃতি, চেহারার ধরন কল্পনা করতে পারে না। শৈলেশের মনে হলো, এতদিনে ঈশ্বরের আসল স্বরূপ সে খুঁজে পেয়েছে।

এতগুলো বছর লন্ডনে থেকেও, আশেপাশে মুসলিম বন্ধু থাকা সত্ত্বেও এই প্রথমবার শৈলেশ ইসলামের সত্যিকারের চিত্র খুঁজে পেল। বুঝল, ইসলামের দর্শন একেবারে খাঁটি ও যৌক্তিক। বিশেষ করে হিন্দু ধর্মের সাথে মিলিয়ে দেখলে এটি আরও পরিষ্কারভাবে বোঝা যায়। প্রতিটি মানুষের অন্তরেই এক স্রষ্টার প্রতি বিশ্বাস আছে। প্রতিটা মানুষ ভাবে, এই মহাবিশ্বের একজন সৃষ্টিকর্তা আছে। মানুষের এই বোধ তার মজ্জাগত। শৈলেশ যদিও হিন্দু ধর্মের বহু ঈশ্বরের ধারণায় পুরোপুরি আস্থাশীল হতে পারেনি, কিন্তু ইসলামের এক ঈশ্বরের ধারণায় বিশ্বাসী হতে তার এতটুকুও বেগ পেতে হয়নি। সে মনে মনে এত দিন একজন স্রষ্টার কাছেই তার মনের আকুতি জানিয়ে আসছিল। তাই কুরআনে দেয়া স্রষ্টার স্বরূপ খুব দ্রুতই তার মনে জায়গা করে নিল।

যখন কুরআনের সাথে তুলনা করা হয় ভগবত গীতা, মহাভারত কিংবা উপনিষদের সাথে... দেখা যায় কুরআন আজও অবিকৃত অবস্থায় তার আদি রূপে বর্তমান।

www.pathagar.com

কুরআন যেমন লিখিতভাবে আছে, ঠিক তেমনি আছে মানুষের হৃদয়ে মুখস্ত রূপে। কিন্তু হিন্দু ধর্মের এই সব ধর্মগ্রন্থগুলোকে তার আদী রূপে পাওয়া যায় না। কুরআন পড়লে বুঝা যায়, এটি তার স্রষ্টার কাছ থেকেই এসেছে।

কুরআনের বাণী খুবই সহজ এবং জটিলতা মুক্ত। কুরআন বলে, এক আল্লাহর ইবাদাত করতে, তার সাথে কাউকে শরীক না করতে, একটা সুন্দর পুণ্যময় জীবন গঠন করতে। আপনি যদি এটি করতে পারেন, তবে আল্লাহর রহমতে আপনার স্থান হবে জান্নাতে।

শৈলেশ পড়ল মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর রাসূল। তার কাছে মনে হলো, 'আরে এটাই তো যুক্তির দিক দিয়ে গ্রহণযোগ্য। সৃষ্টিকর্তা নিজে পৃথিবীতে নেমে আসার তো কোনো প্রয়োজন নেই। তিনি মানুষদের মধ্য থেকে একজনকে তার বাণী পৌঁছানোর দায়িত্ব দিলেই তো হয়।'

ইহুদি, খ্রিষ্টানদের ধর্মগ্রন্থ থেকে জানা যায়, তারাও একজন নবির অপেক্ষায় ছিলেন। শৈলেশ আরও গভীরভাবে হিন্দু ধর্ম, ইসলাম ধর্ম নিয়ে পড়াশোনা শুরু করল। সে বিস্ময়ের সাথে লক্ষ্য করল, হিন্দু ধর্মের গ্রন্থগুলোতে একইভাবে মুহাম্মাদ ﷺ-এর আগমনের ইঙ্গিত দেয়া আছে। বলা হয়েছে, তিনি হবেন আরবের অধিবাসী। তার অনুসারীরা সুন্নাতে খতনা করবে, নামাযের জন্য আযান দিবে।

সন মিলিয়ে তরুণ শৈলেশ ভাবল 'যথেষ্ট হয়েছে। এটি যে সত্য, এ নিয়ে আর কোনো সন্দেহ নেই'। আল্লাহর রহমতে একদিন সে রিজেন্ট পার্ক মসজিদে গিয়ে হাজির হলো। উচ্চারণ করল শাহাদাহ 'আশহাদু আন লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ, ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ।'

সেই শৈলেশ প্যাটেল, নাম বদলে হয়ে গেল সালাহ উদ্দিন প্যাটেল। প্রিয় ভাই ও বোনেরা, এতক্ষণ যা বললাম, সে আমারই জীবনের গল্প।

কিন্তু ঘটনার এখানেই শেষ নয়...

দুই

আমি বিভিন্ন আইটি কোম্পানী, ব্যাংক ইত্যাদিতে কন্ট্রাকটর হিসেবে কাজ করতাম।

তখন আমার জীবন ছিল আর দশটা সাধারণ মানুষের মতোই। সবার মতো আমিও দুনিয়ার জীবনে সফল হতে চাইতাম। চাইতাম গাড়ি, বাড়ি, টাকা পয়সার মালিক হতে। তার পেছনে সাধনা করে দিন কাটছিল আমার। দিনে দিনে একে একে সফলতার সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠছিলাম।

সময়টা ২০০৮ সাল। আপনারা জানেন, সে সময় বিশ্ব অর্থনীতিতে মন্দা দশা চলছিল। রিয়েল এস্টেট ইন্ড্রাষ্ট্রি পুরো ধ্বসে পড়ে। আমার মতো লোক যে কিনা

www.pathagar.com

সপ্তাহ জুড়ে ফোনে ব্যস্ত সময় কাটাতাম, অলস বসে রইলাম মাসের পর মাস। জীবনে প্রথমবারের মতো আমি হন্যে হয়ে কাজ খুঁজছিলাম।

কাজহীন সে অলস সময়ে আমি আমার জীবন নিয়ে নতুন করে ভাবা শুরু করলাম। অনুভব করছিলাম, আমার জীবনে কোথাও কী যেন একটা ঘাটতি আছে। এটা ঠিক আমি একজন মুসলিম। আমি এই শহরে থাকছি, টাকা কামাচ্ছি, ব্যাংকে সঞ্চয় করছি। তবুও কোথাও যেন কী একটা নেই।

অনুভব করলাম, আমি আসলে ইসলামের অনুশাসনগুলো সঠিকভাবে পালন করছি না। মনে হলো, আমি দুনিয়ার পেছনে ছুটছি, টাকা কামাচ্ছি, তবুও আমার মন জুড়ে শূন্যতা। দিন দিন সে শূন্যতা বেড়েই চলেছে। কারণ, আমি ইসলাম সঠিকভাবে পালন করছি না। আমি নতুন করে ইসলাম নিয়ে ভাবা শুরু করলাম। বুঝলাম, কিছু দায়-দায়িত্ব আমাকে অবশ্যই সঠিকভাবে পালন করতে হবে। যেমন : নিয়মিত পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করা।

আমি এক ধরনের মানসিক পট-পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যাই। আমার ধারণা অনেক মুসলমানেরই একই অবস্থা। তারা মুসলিম ঠিকই, কিন্তু হয়তো অতটা ধার্মিক নন। একদিন ঠিকই নিজেদের ভুল বুঝতে পারেন। তারপর আবার ফিরে আসেন।

২০০৯ সালের কথা। আমার বোন ছিল একজন ধার্মিক হিন্দু। সে লেষ্টার ইউনিভার্সিটিতে মাইক্রোবায়োলজিতে পড়ত। মাস্টার্স পরীক্ষা শেষে সে বাড়িতে ফিরে এল। অনেক দিন পর তাকে বাড়িতে পেয়ে আমি খুব খুশি হলাম। আমি যত বেশি মন দিয়ে ইসলাম নিয়ে পড়াশোনা করছিলাম, যত বেশি নিজের আমল উন্নত করার চেষ্টা করছিলাম, তত বেশি তার সামনে ইসলামের সৌন্দর্য তুলে ধরার তাগিদ অনুভব করছিলাম।

আমি একদিন গিয়ে বোনকে বললাম, 'আচ্ছা বোন, বলতে পার তুমি আসলে হিন্দু ধর্ম কেন পালন করছ? এটা কী এই কারণে যে, তোমার মা-বাবা হিন্দু? কেবল কোনো ঘরে জন্ম নেয়ার দ্বারাই তার আচার, অনুষ্ঠান, বিশ্বাস কি সত্য ও সঠিক হতে পারে? এভাবে ভাবলে, যারা অন্য ধর্মের মা-বাবার ঘরে জন্ম নিয়েছে, তাদের কী হবে?'

বোন গভীর ভাবনায় ডুবে গেল। সে আমাকে এর কোনো জবাব দেয়নি।

আলহামদুলিল্লাহ, তার কিছু মুসলিম বান্ধবী ছিল যারা খুবই ধার্মিক। তেমনই এক বান্ধবী ছিল 'আল মাগরেব' সংগঠনের সাথে জড়িত। সে বান্ধবী একদিন আমার বোনকে এক সেমিনারে যাওয়ার আমন্ত্রণ জানায়।

আমার বোন কিছুটা চিন্তায় পড়ে যায়। সে আমাকে বলছিল, 'শুক্রবার বিকেলে তুমিও আমার সাথে চল। বিকেল বেলায় তাদের কিছু ফ্রি-কোর্স থাকে। তুমিও তাতে ভর্তি হয়ে গেলে।'

www.pathagar.com

আমি অভয় দিলাম 'অত চিন্তা করছ কেন? আমি যেতে না পারলে তুমি একাই যেও। আর ভয় পেয়ো না। তোমার মনে কোনো প্রশ্ন থাকলে তুমি নিঃসঙ্কোচে জিজ্ঞেস করবে।' আমি অবশ্য কী একটা কাজ থাকায় আর যেতে পারিনি। ও একাই গিয়েছিল।

আলহামদুলিল্লাহ। সে সেমিনার পরিচালনা করেছিলেন মিসরের একজন শাইখ। দুবছর পরে তিনি আমাকে বলেছিলেন, 'সেদিন আলোচনার বিষয় ছিল সিরাতুল মুস্তাকিম, সহজ-সরল পথ। কী করে তা অনুসরণ করে জান্নাতে যাওয়া যায়, তাই নিয়ে আমি আলোচনা করছিলাম। আমার মনে পড়ে বোনদের মধ্যে সবাই ছিল হিজাব পরা, একজন বোন ছাড়া। তার দিকে তাকিয়ে আমার মনে হলো, আহা! এই বোনটা হিজাব পরে না। তার যে কী হবে?

প্রশ্নোত্তর শুরু হলে সে বোনটা আমাকে প্রশ্ন করা শুরু করলেন। একটু পরে আমি বুঝতে পারলাম, এই বোন তো আসলে অমুসলিম। আমি এবার টেবিল উল্টে দিলাম। তাকেই পাল্টা প্রশ্ন করা শুরু করলাম। শেষে বললাম, আপনি তাহলে কেন ইসলামে বিশ্বাস করবেন না? কেন শাহাদাহ উচ্চারণ করবেন না?'

শাইখের উত্তরে সন্তুষ্ট হয়ে আমার বোন সে সময়েই শাহাদাহ উচ্চারণ করে। আল্লাহু আকবার। প্রায় শ খানেক বোন সেখানে উপস্থিত ছিলেন। আমি মোবাইলে তার মেসেজ পাই, সে মুসলিম হয়ে গেছে।

শাইখ বলছিলেন, 'আমি নিজের কাছেই নিজে লজ্জিত হয়ে গেলাম। এই বোনটির দিকে তাকিয়ে হিজাব না থাকায় আমি মনে মনে বিরূপ ধারণা পোষণ করছিলাম। অথচ আল্লাহর কী রহমত, এই বোনটি আমারই সামনে শাহাদাহ উচ্চারণ করে মুসলিম হয়ে গেলেন। হয়ে গেলেন পরিশুদ্ধ।'

এক পরিবারে দুজন অনুশাসন মানা মুসলিম থাকাটা বিরাট ব্যাপার। আলহামদুলিল্লাহ।

আপনারা আব্দুর রহিম গ্রিনকে চিনেন তো? যিনি বিভিন্ন টিভিতে ইসলামিক অনুষ্ঠান করে থাকেন। তার উদ্যোগেই ২০১০ সালে IERA প্রতিষ্ঠিত হয়। এর অফিস লন্ডনে। তাদের উদ্যোগে নওমুসলিমদের নিয়ে নয় দিনব্যাপী একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। আমার বোন তার এক বান্ধবীর মাধ্যমে দাওয়াত পান। বোন আমাকে বলল, তুমিও চল আমার সাথে।

এই কয়টা দিন আমাদের খুবই চমৎকার কাটল। দুনিয়ার সব চিন্তা থেকে মুক্ত হয়ে এ কয়দিন আমরা ইবাদাতে ব্যস্ত ছিলাম। আমরা শিখলাম, কী করে আরও বেশি আল্লাহর সাথে সম্পর্ক গড়া যায়। আল্লাহর রহমতে অনেক ভাইদের সাথে আমার পরিচয় হলো। অনেকের সাথেই আন্তরিক সম্পর্ক গড়ে উঠল। সে সময়টা ছিল আমার জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেয়ার মতো ঘটনা।

www.pathagar.com

ধীরে ধীরে আমি IERA-এর সাথে যুক্ত হয়ে পড়লাম। আরও বেশি সময় দিতে লাগলাম। আমি এখন মানুষকে প্রশিক্ষণ দিই, কী করে মানুষের কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে দেয়া যায়। একটা হিন্দু পরিবার থেকে আসার কারণে আমি বুঝতে পারি দাওয়াহর কাজের গুরুত্ব কতখানি। দেশ-বিদেশের অনেক মুসলিমের সাথে আমার কথা হয়। পাকিস্তানি, ভারতীয়, বাংলাদেশি...আমি তাদেরকে বলি, আসুন আমরা এক সাথে কাজ করি। আসুন আমরা আমাদের মুসলিম ভাই-বোনদেরকে দ্বীনের পথে ফিরে আসতে উদ্বুদ্ধ করি।

আল্লাহর রহমতে আমাদের প্রচেষ্টার ফলে অনেক মুসলিম ভাইবোন দ্বীনের পথে ফিরে এসেছেন। আমরা তাদের নিয়ে মসজিদে যাই, দ্বীনি বিষয়ে তা'লিম দিই।

আমি তাদেরকে তায়েফের গল্প বলি। বিশেষ করে উপমহাদেশের মুসলিমদের। মুহাম্মাদ ﷺ-এর তায়েফ গমনের ঘটনা মনে আছে আপনাদের? তিনি যখন ইসলামের দাওয়াত দেয়ার জন্য তায়েফ গিয়েছিলেন, তায়েফবাসী পাথর মেরে তাকে রক্তাক্ত করেছিল। রক্তে ভিজে পায়ের জুতা পায়ের সাথেই আটকে গিয়েছিল। ফেরেশতা এসে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলেছিলেন 'হে নবি! আপনি আদেশ দিলে আমরা তায়েফবাসীকে দুপাহাড়ের মাঝে চাপা দিয়ে ধ্বংস করে দিব।'

আল্লাহর নবি ﷺ উত্তর দিলেন, 'না, এটা করবেন না। আজ তারা আমাকে পাথর মেরেছে। হতে পারে, তাদের পরবর্তী প্রজন্ম ইসলামের বিজয়ে বিরাট ভূমিকা রাখবে' এটা ছিল রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দূরদৃষ্টি ও প্রজ্ঞা।

খেয়াল করুন, আল্লাহর নবির সে কথা কী করে সত্য হয়ে গেল। ভারতে প্রথম ইসলামের আগমন সিন্ধু বিজয়ের' হাত ধরে। রাজা দাহিরের বিরুদ্ধে সে যুদ্ধে মুসলিমদের নেতৃত্ব দেন মুহাম্মাদ বিন কাসেম। আপনারা কি জানেন, মুহাম্মাদ বিন কাসেমের জন্ম কোথায়? জ্বী, ভাইয়েরা, তিনি ছিলেন তায়েফের সন্তান। উপমহাদেশের মুসলমানদের কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছানোর পেছনে মুহাম্মাদ বিন কাসিমের সে অভিযানের গুরুত্ব ছিল অনেক।

আমাদের মুসলিম কম্যুনিটিতে অনেকেই আছেন যারা অমুসলিম পরিবেষ্টিত। তাদের আমল মানসম্মত নয়। তাই আমাদের দাওয়াহর কাজ নিয়মিত করা দরকার। মুসলিম-অমুসলিম উভয়ের মাঝে। এর গুরুত্ব যে কতখানি, তা বলে বোঝানো যাবে না। এই যে আমি এতগুলো বছর মুসলিমদের মধ্যে বড় হয়েছি, কেউ আমাকে ইসলামের দাওয়াত একবারের জন্যও দেয়নি। আমার মতো এরকম লক্ষ কোটি মানুষ আছে, যারা সঠিকভাবে ইসলামের দাওয়াত পাচ্ছে না।

আমাদেরকে তাই দাওয়াতের কাজ করে যেতে হবে। এটা আমাদের দায়িত্ব, আমাদের কর্তব্য। আপনার বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-প্রতিবেশী, খেলার সাথি সবার মাঝে দাওয়াতের কাজ করুন।

www.pathagar.com

হাশরের মাঠে যদি আল্লাহ অমুসলিমদের জিজ্ঞাসা করেন, তোমরা কি আমার ইবাদাত করতে? তারা বলবে, না। আল্লাহ বলবেন, কেন? তোমাদের কাছে ইসলামের বাণী আসেনি? তারা বলবে, কই, না তো! আল্লাহ বলবেন, কেন তোমার আশেপাশে কি মুসলিম ছিল না? তারা বলবে 'হাজার হাজার ছিল। কিন্তু তারা কোনোদিন একবারের জন্য এসেও আমাকে ইসলামের কথা বলেনি।

ভাবুন ভাইয়েরা, তখন আমরা আল্লাহর দরবারে কী জবাব দিব? একজন মুসলিম হিসেবে আমাদেরকেও যে তখন অপরাধীর কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে।

আল্লাহ আমাদেরকে বুঝার, তাঁর দাওয়াত পৌঁছে দেবার তাওফিক দান করুন। আমিন।

পরিচিতি

ভারতীয় বাবা ও আফ্রিকান মায়ের ঘরে জন্ম নেয়া সালাহ উদ্দিন প্যাটেলের জন্ম, বেড়ে ওঠা ইংল্যান্ডে। পারিবারিকভাবে হিন্দু ধর্মের অনুসারী হবার কারণে হিন্দু ধর্মের বিভিন্ন বিধি-বিধান ও রীতি-নীতি মানতে গিয়ে তার মনে অনেক প্রশ্ন জাগে। তিনি হিন্দুর ধর্মের গভীরে গিয়ে পড়াশুনা শুরু করেন। পরবর্তী সময়ে বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে এসে ইসলামের বিভিন্ন দিক ও তাওহিদের বাণী তাকে মুগ্ধ করে। একসময় তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন।

বর্তমানে তিনি খ্যাতিমান ইসলাম প্রচারক আব্দুর রহিম গ্রিনের পরিচালনাধীন IERA-তে দাওয়াহর কাজ করছেন।

পাদটিকা

১. সিন্ধু বিজয় : বর্তমান পাকিস্তানের অন্তর্গত সিন্ধুর রাজা ছিলেন রাজা দাহির। তার শাসনকালে, এক মুসলিম বাণিজ্যিক জাহাজ সিন্ধু নদীর মধ্য দিয়ে যাচ্ছিল। পথিমধ্যে দেবলে পৌঁছালে জাহাজ লুণ্ঠনের ঘটনা ঘটে। অনেক মুসলিম পুরুষকে হত্যা করা হয়, নারীদের করা হয় বন্দি।

এ খবর তৎকালীন উমাইয়া শাসক হাজ্জাজ বিন ইউসুফের কানে পৌঁছালে তিনি রাজা দাহিরের কাছে চিঠি লিখেন। তাকে বলেন, যাতে মুসলিম বন্দিদের মুক্তি দেয়া হয়। সেই সাথে এ ঘটনার সাথে সম্পৃক্তদের বিচার করার পাশাপাশি যেন ক্ষতিগ্রস্তদের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দেয়া হয়। কিন্তু রাজা দাহির হাজাজ্জের এ দাবি মেনে নিতে অস্বীকার করেন।

হাজ্জাজ বিন ইউসুফ তখন মুহাম্মাদ বিন কাসিমের নেতৃত্বে এক সেনাবাহিনী পাঠান রাজা দাহিরের বিরুদ্ধে। যুদ্ধে রাজা দাহির নিহত হয়। প্রথমবারের মতো এ অঞ্চলে মুসলিম কতৃত্ব প্রতিষ্ঠা হয়। ইসলামের দাওয়াত ছড়িয়ে পড়ে চারিদিকে। অনেক স্থানীয় মানুষ ইসলাম গ্রহণ করেন। তাই সিন্ধু বিজয়কে ধরা হয় উপমহাদেশে ইসলামের গোড়াপত্তন হিসেবে।

www.pathagar.com

পথহারা এক মুসাফির

ইউসুফ চেম্বারস

এক

আসসালামু আলাইকুম। আজ আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তু হলো, আমি কীভাবে মুসলিম হলাম।

আচ্ছা, মুসলিম কাকে বলে? ইসলামেরই বা মানে কী?

মুসলিম মানে হলো, আপনার স্বাধীন ইচ্ছাকে সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী পরিচালিত করা। আমার প্রায় এগারোটি বছর সময় লেগেছিল, জীবনের সঠিক উদ্দেশ্য খুঁজে পেতে। কত চিন্তা-গবেষণা, কত পরিশ্রম! ইসলামে আসার আগে আমি বিভিন্ন ধর্মতত্ত্ব, মতবাদ, তত্ত্বকথার উপর গভীর গবেষণা চালিয়েছিলাম। প্রতিটা দর্শনেই কিছু না কিছু ঘাটতি পেয়েছি।

এমন অনেকেই আছেন যারা মানবতার কল্যাণে কাজ করছেন। তাদের কাজ সত্যিই প্রশংসনীয়। মুসলিম হবার আগে আমি এরকম অনেক সংগঠনের সাথে কাজ করেছি। কিন্তু একটা প্রশ্ন, একটা জিজ্ঞাসা, সবসময় আমার মাথায় ঘুরপাক খেত, 'আমি এই পৃথিবীতে কেন এসেছি? পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষের আসলে জীবনের সত্যিকারের উদ্দেশ্য কী?'

এই প্রশ্নের কোনো সন্তোষজনক জবাব আমি পাইনি। যাদের কাছেই জানতে চেয়েছি, তাদের কেউই যৌক্তিকভাবে সুন্দর কোনো ব্যাখ্যা দিতে পারেননি।

হলিউডের সিনেমা 'গান্ধী' দেখে আমি গান্ধীবাদের দিকে ঝুঁকে পড়ি। অনেক লম্বা সময় ধরে মহাত্মা গান্ধীর জীবনাদর্শ নিয়ে পড়াশোনা করেছি।

www.pathagar.com

তিনি ছিলেন মানুষের কল্যাণে একজন নিবেদিত প্রাণ। মালকোঁচা বাঁধা ধুতি ছাড়া তাঁর অন্যান্য বিষয়গুলো ভালো লেগেছিল। তিনি ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা রেখেছিলেন। তাঁর জীবনাদর্শের মধ্যে আমি জীবনের সত্যিকারের মানে খুঁজে পাইনি। আমি জবাব পাইনি, 'মানুষ কেন পৃথিবীতে এল?'

বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী অনেকের সাথে কয়েক মাস সময় কাটিয়েছিলাম। বুঝতে চেয়েছিলাম কী তাদের উদ্দেশ্য, আদর্শ, জীবনদর্শন। তাদের সাথে থাকা সময়টা চমৎকারই কেটেছিল। আমি মেডিটেশন করা শিখেছিলাম। তারা আমাকে শিখিয়েছিলেন, চা কফি বাদ দিয়ে কী করে পরিপূর্ণ নিরামিষভোজী হতে হয়।

একদিন বৌদ্ধ আশ্রমের প্রধানকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'আপনার মতে, মানবজীবনের আসল উদ্দেশ্য কী? কেন এই পৃথিবীতে আসা, বেঁচে থাকা?'

'জীবনের উদ্দেশ্য? হুম... তিনি আপন মনে তার হারবাল চায়ের কাপে চামচ নাড়াচ্ছিলেন, 'জীবনের উদ্দেশ্য হলো সুগভীর নৈশব্দের উদ্দেশ্যে গভীর ধ্যান।'

আমার মনে হলো, ধুর ছাই! তিন তিনটে মাস আমার বাজে খরচ হয়েছে। অস্বীকার করব না, মেডিটেশন জিনিসটা অনেক উপকারী। সময় সুযোগ পেলে আমি এখনো মেডিটেশন করি। কিন্তু তাই বলে, এটাই মানব জীবনের উদ্দেশ্য হতে পারে না।

তারা আমাকে একটা বই দিয়েছিলেন 'বুদ্ধ সূত্র'। সেই বইয়ে গৌতম বুদ্ধের সাথে তার শিষ্যের আলাপ-আলোচনা লিখা আছে।

এটা এতটাই দুর্বোধ্য, এক পৃষ্ঠার বেশি আমি এগুতে পারিনি। মনে হলো, আমিই যেখানে মাথা মুণ্ডু কিছু বুঝতে পারছি না, আমজনতা যারা স্বল্পশিক্ষিত কিংবা পড়ালেখা জানে না, তারা বুঝবে কী করে? এর শিক্ষাও বা কী করে সবার কাছে পৌঁছবে? একসময় আমি বৌদ্ধ মতবাদ নিয়ে পড়াশোনা ছেড়ে দিলাম।

কয়েক বছর পরের কথা। তখন সাসেক্স ইউনিভার্সিটিতে পড়ি। আমার বিষয় ছিল রাজনীতি ও উন্নয়ন। তৃতীয় বিশ্ব নিয়ে অনেক কিছু পড়তাম। আপনারা কী জানেন, তৃতীয় বিশ্ব কী? তৃতীয় বিশ্ব বলতে বোঝায় তৃতীয় শ্রেণির রাষ্ট্রগুলো। ৯০ দশকের শুরুতে স্নায়ু যুদ্ধ চলাকালীন আমেরিকা, ইউরোপসহ উন্নত দেশগুলোকে বলা হতো প্রথম বিশ্ব। সোভিয়েত রাশিয়া ছিল দ্বিতীয় বিশ্ব। আর তৃতীয় বিশ্ব ছিল ল্যাটিন আমেরিকা, আফ্রিকা ইত্যাদি অঞ্চলের দরিদ্র দেশগুলো। এখন অবশ্য শব্দ পাল্টে গেছে। তৃতীয় বিশ্ব না বলে এখন বলা হয় 'উন্নয়নশীল দেশ'। আসলেই উন্নয়নশীল, কারণ তারা শুধু উন্নয়নের চেষ্টাই করে যাবে, কিন্তু উন্নত হতে পারবে না। উন্নত দেশগুলো তা হতে দিবে না।

www.pathagar.com

সত্যি বলতে আধুনিক বিশ্বে দাসপ্রথা এখনো বর্তমান। বিশ বছর আগের চেয়েও বর্তমানে দাসের সংখ্যা অনেক বেশি। আমরা অনেকেই উৎফুল্লচিত্তে বলি, 'দাসপ্রথা বিলুপ্ত হবার দুশ বছর পার হয়ে গেল'। আমরা আসলে আব্রাহাম লিঙ্কনের ১৮৬৩ সালের দাসপ্রথা বিলুপ্তির ঘোষণাকে বুঝাই। অথচ, আজও পৃথিবীর শতকরা ষাট ভাগের বেশি মানুষ চরম দরিদ্রসীমার নিচে বাস করছেন। তাদের উপার্জন দৈনিক পাঁচ ডলারেরও কম। মানুষগুলো তাদের রুটি-রুজির জন্য তাদের চাকরি দাতাদের কাছে জিম্মি। দাসপ্রথা ছাড়া এ অবস্থাকে আর কী বলবেন?

যাহোক, মূল ঘটনায় ফিরে আসি। একদিন আমি সাসেক্স ইউনিভার্সিটির পথ ধরে হেঁটে আসছিলাম। এক তরুণী এসে আমাকে বললেন, 'আমাদের একটা মিটিং আছে। আপনাকে সেখানে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।'

গেলাম তাদের মিটিংয়ে। ব্রাইটনে সাগর পাড়ের এক অডিটোরিয়ামে গিয়ে হাজির হলাম। সেখানে কয়েকশ মানুষ এসেছেন। মনটা অপার্থিব চিন্তায় আচ্ছন্ন, 'যদি এখানে আমার এত দিনকার প্রশ্নের জবাব মেলে!'

আমরা একে অন্যের সাথে কথা বলছিলাম। হঠাৎ করেই সব শব্দ থেমে গেল। এক লোক গিটার হাতে মঞ্চে উঠে এলেন। আরেকজন এলেন ড্রাম হাতে। শুরু হলো বাদ্যের তালে তালে গান 'যিশু...আছেন তোমার হৃদয়ে'। মাঝে মাঝে গান থামিয়ে গায়ক উপস্থিত কাউকে উদ্দেশ্য করে চিৎকার দিয়ে উঠতেন, 'হেই, তোমার ভেতরকার শয়তানটাকে ছুঁড়ে ফেলে দাও' এভাবে তিনি একে একে সবাইকে উদ্দেশ্য করে চিৎকার করে গেলেন।

পেছনে বসে বসে আমি ভাবছিলাম 'সর্বনাশ! কিছুক্ষণ পরে তো এই লোক আমাকে ধরবে। এখন কী করি?'

গাইতে গাইতে লোকটা একসময় হাত পা ছুঁড়তে ছুঁড়তে মাটিতে পড়ে গেলেন। ভাব দেখে মনে হলো, অজ্ঞান হয়ে গেছেন। অন্যরা তাকে তুলে নিয়ে চ্যাংদোলা করে দোলাচ্ছিলো আর গাইছিল, 'যিশু তোমায় ভালোবাসেন, যিশু তোমায় ভালোবাসেন...' ধীরে ধীরে সবাই এতে যোগ দিলেন।

পরিস্থিতি বেগতিক দেখে আমি পেছনের দরজা দিয়ে আস্তে করে সটকে পড়লাম। যে পরিবেশ, এখানে থাকা আমার কম্ম নয় বাবা!

এমন কোনো দৃশ্য মুসলমানদের মসজিদে দেখতে কেমন লাগবে? ভাবতে অবিশ্বাস্য মনে হলেও আজকাল অনেক মসজিদে এই তামাশা হয়। ভুলেও ভারতীয় কিছু মুসলিম এলাকায় যাবেন না। বিশেষ করে দরগাহগুলোতে।

www.pathagar.com

ভয়ংকর আর পাগলামোতে ভরপুর সব দৃশ্য চোখে পড়ে সেখানে। ভাগ্যিস! ইসলাম গ্রহণের আগে আমি এই সব দরগাহগুলোতে যাইনি। তাহলে আমি ভাবতাম, ইসলাম বোধহয় এরকমই।

আপনাদেরকে এই সব ঘটনা বলছি, যাতে আপনারা বুঝতে পারেন একজন মানুষ যখন সত্যকে খোঁজার জন্য, তার স্রষ্টার দিকে ফিরে আসার জন্য সঠিক রাস্তা হন্য হয়ে খুঁজতে থাকে; তখন তাকে কী প্রতিকূল পরিস্থিতির ভেতর দিয়ে যেতে হয়। বিচিত্র সব অভিজ্ঞতা, বিচিত্র মানুষের অদ্ভুত সব ক্রিয়াকলাপের মুখোমুখি হতে হয় তাকে।

সত্যকে খোঁজার এই প্রক্রিয়া একটা উদাহরণ দিয়ে বুঝাই। ধরুন, আপনি একটা অন্ধকার রুমে বসে আছেন। আপনার চোখ দুটো বাঁধা। খুবই সামান্য আলো আপনার চোখে এসে বিঁধছে। আপনি আশেপাশের শব্দ কানে শুনতে পাচ্ছেন, কিন্তু দরজা খুঁজে পাচ্ছেন না। অন্ধকারে হাতড়ে মরছেন, কিন্তু আপনি জানেন না দরজাটা কোথায়। আমার মনে হচ্ছিল, আমার অবস্থা ঠিক এমনই।

তিনদিন পরে আমি সাহিত্য, জ্যোতির্বিদ্যা ইত্যাদি নিয়ে পড়ছিলাম। জানালার পাশে তারা ভরা আকাশ। আকাশ জুড়ে অসংখ্য তারা ঝকমক করছে। আমি ভাবছিলাম, একেকটি তারা আমাদের এই পৃথিবীর চেয়ে অনেক অনেক গুণ বড়। এরকম লক্ষ কোটি তারা নিয়ে গঠিত এই মহাবিশ্ব। তাহলে মহাবিশ্ব না জানি কত বড়! এই বিশাল মহাবিশ্বের বিশালত্বের কাছে আমি একজন মানুষ কত ক্ষুদ্র, কত নগণ্য!

যিনি এই মহাবিশ্ব সৃষ্টি করেছেন, তিনি নিশ্চয় এই বিশাল সৃষ্টি কর্মের চেয়েও অনেক মহীয়ান, অনেক বড়। তাহলে এই মহাবিশ্ব কী তিনি এমনি এমনি বানিয়েছেন? এই পৃথিবীতে মানুষের অস্তিত্বের পেছনে কী কোনোই কারণ নেই? এ যে অসম্ভব, এ যে অনেক বড় পাগলামো!

একটা গাছেরও জীবনে বিশেষ উদ্দেশ্য আছে। গাছ অক্সিজেন উৎপাদন করে। টিকিয়ে রাখে পশু-পাখি, মানুষের জীবন ও জীবিকা। ছায়া দেয়, পরিবেশকে সুন্দর রাখে। তবে মানুষের বেঁচে থাকার পেছনে কোনো উদ্দেশ্য কেন থাকবে না? দুনিয়াতে এলাম, খেলাম আর চলে গেলাম। এই কী মানুষের নিয়তি, এই কী মানুষের পরিণতি! আমার মন বলছিল, এ হতে পারে না। নিশ্চয় মানুষের জীবনের বিশেষ কোনো উদ্দেশ্য আছে। কিন্তু কী সেটা?

নান্দনিক সৌন্দর্যের বিশাল আকাশের দিকে তাকিয়ে আমি রাতের পর রাত কাঁদতাম। গলায় আকণ্ঠ হুইস্কি ঢালতাম। কোথায় খুঁজে পাব সে উত্তর? কে দেবে আমাকে সে জবাব?

www.pathagar.com

আমি ভেবে দেখলাম, যেহেতু আশেপাশের অধিকাংশ মানুষ খ্রিষ্টান, তাহলে একজন খ্রিষ্টান ধর্মযাজক, পণ্ডিত ব্যক্তিকে আমি আমার মনের জিজ্ঞাসার কথা বলি। হয়তো তার কাছে এর কোনো উত্তর আছে।

একদিন সকালে আমি এক চার্চে গেলাম। চার্চটা ছিল বাইবেলের বর্ণনা অনুযায়ী নবি নুহের নৌকার মতো বানানো।

চার্চের যাজক আমাকে বললেন, 'আমার হাতে আজ সময় নেই। আপনি সোমবারে আসুন।'

সোমবার! তার মানে তিনদিন পর।

তিনদিন পর আমি আবার গেলাম। সেদিনও তিনি মহাব্যস্ত। তারপরেও এক ফাঁকে অল্প সময়ের জন্য তিনি আমার সাথে কথা বললেন, 'আচ্ছা, আপনার বিষয়টা যেন কী?'

'দেখুন, একটা বিষয় আমাকে দারুণভাবে ভাবাচ্ছে। আমি জানতে চাই, এই পৃথিবীতে আমি কেন এসেছি, কী আমার পরিচয়। কে আমার সৃষ্টিকর্তা, কেন তিনি আমায় বানিয়েছেন। আর আমার জীবনের উদ্দেশ্যইবা কী?' বলতে বলতে আবেগে আমি প্রায় কাতর হয়ে ভেঙে পড়েছিলাম। চোখ দুটো ছলছল করে উঠেছিল। এ যে আমার অনেক দিনের চাওয়া! আমার মনে হচ্ছিল, আমি বুঝি সত্যের অনেক কাছে চলে এসেছি। ব্যাকুল হয়ে ভাবছিলাম, হয়তো একটু পরেই মিলবে তার সদুত্তর।

যাজক কিছুক্ষণ ভাবলেন। তারপরে বললেন, 'আপনি ধর্মতত্ত্বের উপরে অনার্স কোর্সে ভর্তি হয়ে যান না কেন?'

আমার ভেতরটা রাগে ফেটে পড়ছিল, 'আপনি আমাকে তিন তিনটি দিন অপেক্ষায় রাখলেন, আর আজ বলছেন চার বছরের অনার্স কোর্সে ভর্তি হতে? ধর্মতত্ত্বে যা পড়ানো হয়, সবই আমি জানি। সব নিয়েই আমি গবেষণা করেছি। এখানে ত্রিত্ববাদ যে কতটা বৈজ্ঞানিক, তা নিয়ে বিশদ আলোচনা আছে। কিন্তু সবচেয়ে সহজ ও সাধারণ প্রশ্ন, কেন এই দুনিয়ায় এসেছি, কী আমার উদ্দেশ্য তার জবাব নেই?'

তিনি উত্তর দিলেন, 'সেক্ষেত্রে আমি আপনাকে কোনো সাহায্য করতে পারছি না।'

এতটা তৃষ্ণার্ত হয়ে আমি এত বড় ধর্মীয় পণ্ডিতের কাছে ছুটে এলাম, আর তিনি কিনা বলছেন, আমাকে সাহায্য করতে পারবেন না! অত্যন্ত হতাশ হয়ে আমি চার্চ থেকে বেরিয়ে এলাম।

www.pathagar.com

আটটি বছর ধরে আমি কত শত মানুষের সাথে ঘুরেছি, কতজনকে এই প্রশ্ন করেছি। সবাই আমাকে মনে মনে পাগল ভাবতেন। ভাবতেন, আমার মাথায় সমস্যা আছে। যে মানুষটা মানব জীবনের উদ্দেশ্য খুঁজে বেড়াচ্ছে, সমাজের আর দশজনের চোখে সে আলাদা, সে একটা পাগল, সে একটা উন্মাদ! ভাবা যায়!

কত শত সেমিনারে গিয়েছি। কত দেশ-বিদেশ ঘুরেছি। কত বিচিত্র মানুষের সাথে আমার কথা হয়েছে। আমি ইতালির পম্পেই দুইবার গিয়েছি। পম্পেই চিনেছেন তো? ইতালির মাউন্ট ভিসুভিয়াসের আগ্নেয়গিরি যে শহরটাকে পুঁড়িয়ে ছাই করে দিয়েছিল। পম্পেই ছিল জ্ঞানে গুণে সভ্যতায় উন্নত এক নগরী। এ জন্যই আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে বলেছেন, পৃথিবীতে ঘুরে দেখ। দেখ তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিদের পরিণতি কী হয়েছিল, যারা শৌর্যে বীর্যে তোমাদের চেয়ে অনেক উন্নত ছিল। সূরা আর রূম : ৯

উন্নত পম্পেই নগরীর মানুষগুলো পাশবিক ক্রিয়াকর্মে অভ্যস্ত ছিল। এমন একটা রাস্তা দিয়ে আমি হেঁটেছি, যেখানে লোকেরা কুকুরের সাথে মিলিত হতো। বুঝতেই পারছেন আমি কিসের কথা বলছি। কেন পম্পেই নগরী ধ্বংস হয়ে গেল? কেন মাউন্ট ভিসুভিয়াসের লাভা মানুষগুলোকে এমনভাবে মৃত্যুর মুখে ঢেলে দিল, যাতে পরবর্তী যুগের মানুষেরা এসে দেখতে পারে ঠিক কী অবস্থায় তাদের মৃত্যু হয়েছে?

সে দৃশ্যের ভয়াবহতা সহ্য করা কঠিন। আমার মাথায় সেই পুরোনো চিন্তা ফিরে এল। এই যে এত বড় সভ্যতা এভাবে ধ্বংস হয়ে গেল, এর পেছনে নিশ্চয়ই মহাশক্তিধর কোনো সত্ত্বার অস্তিত্ব আছে, আছে সুচিন্তিত পরিকল্পনা।

ইউনিভার্সিটিতে আমার এক গার্লফ্রেন্ড ছিল। কয়েক বছর ধরেই আমরা একসাথে সময় কাটাতাম। এক রাতে সে আমাকে বলল, 'তুমি আর কাল থেকে আমার এখানে এসো না।'

আমি তো আকাশ থেকে পড়লাম, 'কথা নেই, বার্তা নেই। হঠাৎ করে কেন তুমি তোমার ভালোবাসার মানুষকে দূরে ঠেলে দিচ্ছ?'

সে বলল, 'কিছু ধর্মীয় কারণে।'

আমি শ্লেষের সাথে বললাম, তোমার ধর্মে নিশ্চয়ই গণ্ডগোল আছে। কাউকে কোনো কিছু না জানিয়ে, কোনো ব্যাখ্যা না দিয়ে যে ধর্ম একজনকে বাইরে বের করে দেয়, সে ধর্মে গণ্ডগোল না থেকে পারে না। আমি কি এমন কোনো কিছু করেছি, যাতে তুমি আহত হতে পার?'

'না, সে রকম কিছু নয়। আসলেই ধর্মীয় কারণে এই সম্পর্ক আমি কন্টিনিউ করতে চাচ্ছি না।' সে ছিল মূলত মুসলিম।

www.pathagar.com

আমি কিছুটা বিদ্রুপের সাথেই বললাম, 'হয়তো তুমি, নয়তো তোমার ধর্ম, এ দুয়ের কোনো একটার মাঝে গণ্ডগোল আছে।'

সে অনেকটা রাগ করেই চলে গেল।

পরদিন আমি আবার তার বাসায় এসে দরজায় ধাক্কা দিলাম। সৌদি স্টাইলে এক লোক বেরিয়ে এলেন। লম্বা জুব্বা, মুখে বিশাল দাড়ি। আমি তাকে চিনতাম না। আগে কখনো দেখিনি।

আমার গার্লফ্রেন্ডের নাম উল্লেখ করে বললাম, 'তার সাথে আমি কথা বলতে চাই।'

তিনি ভারিক্কি গলায় বললেন, 'তোমরা কেউ কারও জন্য উপযুক্ত নও। তাকে ভুলে যাওয়াই তোমার জন্য মঙ্গল।'

আমার কিছুটা রাগই হলো 'কাল সে আমাকে বের করে দিল। আজ আপনিও আমাকে তার থেকে দূরে থাকতে বলছেন, বিশেষ কোনো কারণ ছাড়াই। কিরে ভাই, এ কেমন ধর্ম আপনাদের?'

তিনি আমাকে এক গাদা বই ধরিয়ে দিলেন, 'তুমি ইসলাম সম্পর্কে জানতে চাও? তবে এ বইগুলো নিয়ে পড়।'

বাসায় গিয়ে বইগুলো মন দিয়ে পড়লাম। দু-সপ্তাহ পর আমি আবার আমার বান্ধবীর কাছে ফিরে গেলাম, 'আমি দুঃখিত, তোমার ধর্ম নিয়ে আজেবাজে কথা বলেছি। তোমার ধর্ম ঠিকই আছে। গন্ডগোল তো আসলে তোমার মধ্যে। আমায় তুমি এত দিন এই ধর্ম সম্পর্কে বলনি কেন? কেন সব জেনে বুঝেও তুমি আমার সাথে এভাবে সম্পর্ক চালিয়ে গেলে? কেন তুমি আমাকে বিয়ের কথা বলনি? আমি তো ইসলাম সম্পর্কে পড়াশোনা করে মুগ্ধ।'

দিনে দিনে আমি ইসলাম সম্পর্কে আরও পড়াশোনা করলাম, জানলাম। সে মাসটা ছিল রমজান মাস। মাসের শেষের দিকে একদিন রোজাও রাখলাম। আমার মনে হচ্ছিল, এত দিনে যেন আমার চোখের বাঁধন খুলে গেল। আমি যেন অন্ধকার রুম ছেড়ে বাইরে এসে পড়েছি। দেখছি, পৃথিবীটা কত মনোরম, কত সুন্দর! একজন বিশ্বাসীর চোখ দিয়ে আমি এই জগতটাকে দেখা শুরু করলাম। শুরু হলো আমার সত্যিকারের বেঁচে থাকা।

এক রাতে আমি কুরআন পড়ে অনেক লম্বা সময় ধরে গোসল করলাম। ভোরের দিকে রাস্তায় বেরিয়ে সাদা টুপি মাথায় দেয়া এক ভাইকে দাঁড় করালাম। জিজ্ঞাসা করলাম, 'ভাই মসজিদটা কোন দিকে?'

তিনি আমাকে দেখিয়ে দিলেন। আমি সোজা চলে এলাম মসজিদে।

www.pathagar.com

মসজিদের সিঁড়ি দিয়ে উঠতে যেতেই এক ভাই আমার শার্টের কলার ধরে টান দিলেন। লম্বা জামা গায়ে হাসিখুশি একজন মানুষ। তার নাম নাজিব। তিনি ছিলেন, তাবলীগ জামাতের সেখানকার আমীর। তিনি আমার চেহারা দেখে কিছু একটা আঁচ করতে পেরেছিলেন।

তিনি আমাকে কাছে টেনে নিলেন, 'কী ভাই, আপনি এখানে কি জন্য এসেছেন?'

'আমি ইসলাম কবুল করতে এসেছি।'

'আপনি ইসলাম সম্পর্কে কতটুকু জানেন?'

আমি এত দিন যা পড়ে এসেছি, তার সব বলা শুরু করলাম। সম্ভবত আমার জানার পরিধি এ যুগের অনেক মুসলিমের চেয়ে বেশি ছিল। আমি বললাম, 'আমি গত দু-সপ্তাহ ধরেই অনেক বই-পত্র পড়েছি। আমি পুরোপুরি আশ্বস্ত হয়েছি, এটাই সঠিক ধর্ম। তাই আমি ইসলাম কবুল করতে চাই।'

তিনি আমাকে ইমামের কাছে নিয়ে গেলেন।

সময়টা ছিল ফজরের পর। রমজানের শেষের দশক চলছিল। পুরো মসজিদ ছিল মুসল্লিতে ভর্তি। আমি ইমামের সাথে সাথে শাহাদাহ উচ্চারণ করলাম।

উপস্থিত প্রায় তিনশ মুসল্লি একে একে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরলেন। আমি জীবনে কখনো এভাবে কোলাকুলি করিনি। কিছুক্ষণ পরে মনে হচ্ছিল, আমি যেন কোমর দুলিয়ে নাচছি। ডানে বামে এত এত মানুষের সাথে কোলাকুলি করতে হলো! এ অভিজ্ঞতা ও অনুভূতি ছিল সত্যিই দারুণ!

এত সাধনার পরে ইসলাম গ্রহণ করতে পারাটা ছিল বিরাট আনন্দের, বিরাট গর্বের। বিশেষ করে মুসলিম উম্মাহর অংশ হতে পেরে, যারা আমাকে জীবনের এক মহান উদ্দেশ্য বুঝতে সাহায্য করেছেন।

পরিচিতি

ইউসুফ চেম্বারসের জন্ম ইংল্যান্ডের সারেতে। খ্রিষ্টান পরিবারে জন্ম নেয়া ইউসুফ খুব গভীরভাবে জীবন ও জীবনের উদ্দেশ্য নিয়ে ভেবেছেন। অধ্যয়ন করেছেন, বৌদ্ধ মতবাদ, গান্ধীবাদসহ আরও অনেক মতো ও পথ নিয়ে। প্রায় এক যুগ তিনি হন্য হয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন জীবনের মানে। ইসলাম নিয়ে পড়াশুনা শুরুর দুসপ্তাহের মধ্যে তার মনোজগতে পরিবর্তন আসে। তিনি ইসলামে খুঁজে পান তার কাঙ্ক্ষিত সমাধান।

ইসলাম গ্রহণের পরে তিনি Islam Channel এবং Unity TV সহ বিভিন্ন চ্যানেলে দাওয়াহর কাজ করে যাচ্ছেন। পাশাপাশি তিনি বিভিন্ন উপলক্ষ্যে অসহায় মুসলিমদের জন্য তহবিল সংগ্রহের কাজও করে যাচ্ছেন।

www.pathagar.com

পাদটিকা

১. স্নায়ু যুদ্ধ : ১৯১৭ সালে অক্টোবর বিপ্লবের মাধ্যমে রাশিয়ায় বলশেভিক সমাজতান্ত্রিক কমিউনিস্টরা ক্ষমতায় আসে। গোটা রাশিয়ার উপরেই তাদের কতৃত্ব নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা হয়। তাদের বিপ্লবের সফলতা সারা বিশ্বের কমিউনিস্টদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ ও সাড়া ফেলে। সে সময় সোভিয়েত রাশিয়া ছিল সমাজতন্ত্রের তীর্থস্থান, পুণ্যভূমি। রাশিয়া বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন দেশ ও সংগঠনকে সমাজতন্ত্র ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠায়, আর্থিক সামরিক ও অন্যান্য পৃষ্ঠপোষকতা দিয়ে আসছিল।

অন্যদিকে, আমেরিকা ছিল পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের মোড়ল। সমাজতন্ত্র ও পুঁজিতন্ত্র- এই দুই আদর্শের ভিত্তিতে বলতে গেলে গোটা বিশ্ব দুই ভাগে ভাগ হয়ে যায়। একদিকে, রাশিয়ার নেতৃত্বে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলো, অন্যদিকে, আমেরিকার নেতৃত্বে ন্যাটো ও অন্যান্য পুঁজিবাদী রাষ্ট্র। সে সময়ে আমেরিকা রাশিয়ার মধ্যে ছিল সাপে-নেউলে সম্পর্ক।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে দুই দেশের মধ্যে নেতৃত্ব, কর্তৃত্ব নিয়ে এক ধরনের উত্তেজনা চলতে থাকে। ঠিক সরাসরি যুদ্ধ নয়, কিন্তু যুদ্ধ যুদ্ধ ভাব। সব সময় শংকা, এই বুঝি একে অন্যের উপর পারমাণবিক বোমা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল। এ অবস্থা চলতে থাকে ১৯৯০ সালে সোভিয়েত রাশিয়া ভেঙে যাওয়ার আগ পর্যন্ত। ইতিহাসে এই সময়টা স্নায়ু যুদ্ধ (Cold War) নামে পরিচিত।

বিশ্ব বিখ্যাত ইংরেজ লেখক জর্জ অরওয়েল ১৯৪৫ সালে ব্রিটিশ পত্রিকা 'Tribune'-এ লেখা এক নিবন্ধে সর্বপ্রথম এই শব্দ ব্যবহার করেন। কালক্রমে এই শব্দই দুপক্ষের মধ্যকার দ্বন্দ্বের সময় বুঝাতে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে।

২. পম্পেই : প্রাচীন রোমান সম্রাজ্যের একটি আধুনিক নগরী। এর অবস্থান বর্তমান ইতালীর নেপলস এ। খ্রিষ্টপূর্ব ৭৯ সালে এ নগরী ধ্বংস হয়ে যায়। আগ্নেয়গিরির মাউন্ট ভিসুভিয়াসের প্রচণ্ড অগ্নুৎপাতে জ্বলন্ত লাভার নিচে পুড়ে ছাই হয়ে যায় পুরো শহর। অধিবাসীরা সবাই পরিণত হয় জীবন্ত কয়লায়। শহর, বাড়ি, মানুষ চাপা পড়ে প্রায় ৮২ ফুট উচু জ্বলন্ত লাভার নিচে।

সে অঞ্চলের মানুষেরা মূলত ছিল অগ্নী উপাসক। এর পাশাপাশি আরও অন্যান্য দেব-দেবীর ও পূজা করত। অগ্নী দেবতার উপাসনা উপলক্ষ্যে করা বিরাট উৎসবের পরের দিনেই এই ঘটনা ঘটে।

হাজার বছরের বেশি সময় ধরে অজ্ঞাত থাকার পরে ১৫৯৯ খ্রিষ্টাব্দে প্রথম এই নগরী মানুষের নজরে আসে। এরপরে সুদীর্ঘ সময় ধরে চলে প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধান। কয়েক শতকের অব্যাহত চেষ্টার পর এই নগরীর স্বরূপ মানুষের সামনে আসে। গবেষকগণ অনেক স্থাপত্য, ভাষ্কর্য ও চিত্রকলার সন্ধান পান। সে সময়ে মারা যাওয়া অনেক মানুষের শরীর পাওয়া যায় পাথরের মতো। যিনি যেভাবে মারা গিয়েছেন, সেভাবেই তাদের দেহগুলো আবিষ্কার করা হয়।

সার্বিক বিশ্লেষণে দেখা যায়, পম্পেই নগরের মানুষেরা মাত্রাতিরিক্ত অবাধ যৌনতা ও বিকৃতকামে অভ্যস্ত ছিল। তাদের চিত্র কর্ম ও ভাস্কর্যগুলোতে এর পরিচয় পাওয়া যায়।

১৯৯৭ সালে Unesco একে 'World Heritage Site' হিসেবে ঘোষণা করে। বর্তমানে এটি ইতালির অন্যতম প্রধান আকর্ষণীয় পর্যটন কেন্দ্র।

www.pathagar.com

কমিউনিজমের হাত ধরে

ড. আবু আমিনাহ বিলাল ফিলিপস

আমার জন্ম ক্যারিবিয়ান দ্বীপ দেশ জ্যামাইকায়। সংগীত, রামের (এক ধরনের মদ) জন্য এই দেশের খ্যাতি আছে। অবশ্য পর্যটনের জন্যও এই দেশ বেশ বিখ্যাত।

আমার জন্ম হয়েছিল এক খ্রিষ্টান পরিবারে। দাদা ছিলেন জ্যামাইকার প্রখ্যাত খ্রিষ্টান পন্ডিত। বাইবেলের আদি ভাষা গ্রিক, হিব্রুর উপরে তার বিশেষ দখল ছিল। আমি অবশ্য জ্যামাইকায় খুব বেশি দিন থাকিনি। ছোট থাকতেই মা-বাবার সাথে কানাডায় চলে আসি।

জ্যামাইকার জীবনে ধর্ম পালন নিয়ে খুব বেশি স্মৃতি আমার মনে নেই। শুধু মনে পড়ে, আমরা চার্চে যেতাম। চার্চের দানবাক্সে ফেলার জন্য, বাবা আমার হাতে কিছু কয়েন দিতেন। দানবাক্স যখন আমাদের সামনে নিয়ে যেত, আমাদেরকে পয়সা ফেলতে হতো। আমি কিছুটা অনিচ্ছা ভরেই বাক্সে পয়সা ফেলতাম। বুঝতাম না, এই কাজ কেন করছি। আমার শুধু মনে হতো, এর চেয়ে এই পয়সা দিয়ে পকেট ভর্তি লজেন্স কিনলেই ভালো হতো।

কানাডার স্কুলে আমার কিছু বিচিত্র অভিজ্ঞতা হয়েছিল। আমরা ছাত্ররা দলবেঁধে সাঁতার কাটতে যেতাম। তবে সবাই থাকত নগ্ন। কারও গায়েই পোশাক থাকত না। পোশাক পরার অনুমতিও ছিল না। কেউ পরতে চাইলে, তাকে ডাক্তারের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে আসতে হতো। ডাক্তারকে লিখে দিতে হতো- একদম খালি গায়ে নামলে ঠান্ডায় সমস্যা হবে। জীমে গিয়ে ব্যায়াম করার পর দলবেঁধে গোসলও করতে হতো একইভাবে। গোসলখানায় সবাই ঢুকত একসাথে। উপর থেকে পানির ঝরনা ছেড়ে দেয়া হতো।

www.pathagar.com

আমার কিছুটা লজ্জাই লাগত। আমি বুঝতাম না, কেন এরকম করতে হচ্ছে। অনেক পরে আমি বুঝতে পেরেছিলাম, এই কাজের পেছনে একটা 'দর্শন' আছে। সেই দর্শনের উদ্দেশ্য হচ্ছে, মানুষের স্বাভাবিক লজ্জাবোধ ভেঙে দেয়া। এই দর্শনের পেছনে ডারউইনের[১] সমাজতত্ত্ব, মনোবিজ্ঞান অনেক প্রভাব ফেলেছে। এই দর্শনে লজ্জাবোধকে এক ধরনের অসুস্থতা হিসেবে দেখা হয়। মনে করা হয়, কুকুর-বিড়াল ইত্যাদি প্রাণীগুলো একে অপরের সামনে বিবসনা হতে লজ্জাবোধ করে না। তাহলে মানুষ কেন এমন হবে?

কিশোর বয়সে ধর্ম বলতে বুঝতাম 'সানডে স্কুল'[২]। 'সানডে স্কুল' ওই বয়সে আমাদের কাছে খুব আকর্ষণীয় ছিল। কারণ, সেখানে সুন্দরী সব মেয়েদের সাথে দেখা হতো, আমরা দলবেঁধে পার্টি করতাম। সে বয়সে ইসলাম নিয়ে আমার তেমন কোনো ধারণা ছিল না। মনে পড়ে, আমরা একটা গান শুনতাম, 'এহাব দি এর‍্যাব'। আজ আমরা জানি, ইসলামে এহাব বলে কোনো নাম নেই।

কিছু কার্টুনে দেখতাম, এক লোক উটের পিঠে বসে আছেন। তার এক হাতে তলোয়ার, আরেক হাতে কুরআন। তার ভাব-ভঙ্গিমা এমন, কেউ যদি এই কুরআন না মানে, তবে তলোয়ার দিয়ে তার মাথা ফেলে দিবে। ইসলামি বই বলতে আমি সে সময় 'আলিফ লায়লা' পড়েছিলাম। এখন জানি, এটা কোনো ইসলামি বই ছিল না। এটা ছিল বিভিন্ন রাজা বাদশাহদের হেরেমের জীবন নিয়ে আজেবাজে কিচ্ছা-কাহিনিতে ভরপুর।

হাইস্কুল জীবন শেষ হবার পর আমার পরিবার মালয়েশিয়াতে চলে আসে। মা-বাবা উভয়ে পেশায় ছিলেন শিক্ষক। তারা মালয়েশিয়া সরকারের সাথে শিক্ষা বিষয়ক একটা প্রকল্পের সাথে জড়িত ছিলেন। সেখানে আমার বন্ধু-বান্ধবেরা ছিল মূলত আমার মতোই বাইরে থেকে আসা বিদেশি। মনে পড়ে তখনকার মালয়েশিয়ান সমাজে বাহ্যিকভাবে ইসলামের কোনো চিহ্ন ছিল না। শুধু আমরা যারা বিদেশি, আমাদেরকে সতর্ক করা হতো, 'খবরদার! ভুলেও মালয়ী মেয়েদের ধারে-কাছে যাবে না। তাহলে তোমার খবর আছে।'

ইসলাম গ্রহণের কয়েক বছর পরে আমি যখন মক্কায় হজ্ব করতে যাই, কিছু মহিলাকে দেখি আপাদমস্তক এক ভিন্ন রকম পোশাকে ঢাকা। চেহারার দিক দিয়ে অনেকটা মালয়েশিয়ান মহিলাদের মতো। এরকম পোশাকে মালয়েশিয়াতে আমি এর আগে কাউকে দেখিনি।

আমি আমার বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'এই লোকগুলো কারা?'

www.pathagar.com

সে বলল, 'এরা মালয়েশিয়ান।'

'বল কী? আমি তো মালয়েশিয়াতে এমন পোশাকে কাউকে দেখিনি' আমি কিছুটা অবাক।

পরে আমি জানতে পেরেছি, মালয়েশিয়াতে তারা এভাবে পোশাক পরে না, যেমনটা হজ্বে এসে পরেছে। বাইরে সাধারণত তারা তাদের নিজস্ব সংস্কৃতির পোশাকই পরে। তারা ইসলামি পোশাকটা তাদের ব্যাগে রাখে। নামাযের সময় হলে মসজিদে গিয়ে পাল্টে নেয়। আমি তো আর মেয়েদের নামাযের জায়গায় যাইনি। তাই আমার কোনো ধারণাই ছিল না।

সে সময়ে আমার মা-বাবা এক এতিম ছেলেকে 'দত্তক' নেয়। তার নাম ছিল সুলেমান। ছেলেটার জন্ম হয়েছিল মালয়েশিয়ায়, কিন্তু তার মা-বাবা ছিলেন ইন্দোনেশিয়ান। সরকারের নীতি ছিল, ইন্দোনেশিয়ান কোনো ছেলে যদি মালয়েশিয়াতে জন্ম নেয়, তবে হাইস্কুলের বেশি সে পড়তে পারবে না। জানি না, এখনো একই নিয়ম আছে কী না।

আমার মায়ের কাছে ছেলেটাকে খুব ভালো লেগেছিল। তার মনে হয়েছিল, ছেলেটির এখানে কোনো ভবিষ্যৎ নেই। তিনি সুলেমানকে কানাডায় নিয়ে যেতে চাইলেন। যাতে ওখানে গিয়ে সে ইউনিভার্সিটিতে পড়াশোনা করতে পারে। কানাডার সরকার বলল, তাকে এই দেশে নিয়ে আসতে হলে, আনুষ্ঠানিকভাবে দত্তক নিতে হবে। মা-বাবা তাকে আনুষ্ঠানিকভাবে দত্তক পুত্র হিসেবে গ্রহণ করে নেন। তার নামের শেষে আমাদের পারিবারিক নাম জুড়ে দেয়া হয়।

কানাডায় যাওয়ার আগে আমরা ভাই-বোনেরা সুলেমানের সাথে বেশ কিছু বছর একসাথে কাটিয়েছিলাম। আমার পরিবারে সে ছিল ইসলামের প্রতিনিধি। কিন্তু তার কোনো আলাদা ছাপ আমাদের মধ্যে পড়েনি। সুলেমান ছিল খুব শান্ত এবং লাজুক প্রকৃতির। সে কখনো আমাদের সাথে ইসলাম নিয়ে একটা শব্দও বলেনি। মাঝে মাঝে তার রুমের দরজা খুলে দেখতাম সে নামায পড়ছে। আমরা কিছুটা অবাক হতাম, 'এভাবে মাটিতে মাথা ছুঁয়ে সে কী করছে!'

আমরা সবাই শূকরের গোস্ত খেতাম। মা কে দেখতাম, তার জন্য আলাদা করে মাছ রান্না করছেন। রমজানে সারাদিন সে না খেয়ে থাকত, রোজা রাখত। মা খুব ভোরে উঠে তার জন্য সাহরী তৈরি করতেন। এগুলো দেখতাম, কিন্তু মনে আলাদা করে কোনো জিজ্ঞাসা তৈরি হয়নি। সেও কিছু বলেনি।

www.pathagar.com

স্কুলে থাকতে আমি গান-বাজনার সাথে অনেক বেশি জড়িয়ে পড়ি। লোকে আমাকে বলত সাবার 'জিমি হেনরিক'। আপনারা কেউ কেউ হয়তো এই নাম শুনে থাকবেন। আমিও ঠিক তার স্টাইলে পোশাক পরতাম। তখন গানই ছিল আমার ধ্যান-জ্ঞান। আমাদের নিজস্ব একটা রক ব্যান্ডও ছিল।

হাইস্কুল শেষে আমি কানাডায় ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হবার সিদ্ধান্ত নিই। বায়োকেমিষ্ট্রির উপর উচ্চতর ডিগ্রি নিতে ইউনিভার্সিটি অব সাইমন ফ্রেজ এ ভর্তি হই। এই ইউনিভার্সিটির ধরন ছিল একটু আলাদা। সেই সময়ে এই ইউনিভার্সিটি ছাড়া আর কোথাও ক্রেডিট সিস্টেম ছিল না। পাশাপাশি প্রশাসনিক ক্ষেত্রেও তাদের কিছুটা শিথিলতা ছিল।

সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের প্রফেসররা বেশির ভাগই ছিলেন 'টিমোথি লিয়েরী'র[৩] মতাদর্শে। টিমোথি লিয়েরী LSD নামক এক ধরনের মাদক ব্যবহার জনপ্রিয় করে তুলেছিলেন। প্রফেসররা তার সেই ঐতিহ্য ধরে রেখেছিলেন। প্রফেসররা ক্লাস শুরুর আগে 'মারিজুয়ানার' (হেরোইনের মতো এক ধরনের নেশা উৎপাদনকারী মাদক) একটা প্যাকেট ক্লাসে নিয়ে আসতেন। ছাত্র শিক্ষক সবাই মারিজুয়ানা খাওয়ার পরেই ক্লাস শুরু হতো।

সে সময় উল্লেখযোগ্য সংখ্যক আমেরিকান ছাত্র-ছাত্রী এখানে ভর্তি ছিল। তাদের চিন্তা, মতাদর্শ সাধারণ ছাত্রদের উপর বিরাট প্রভাব ফেলেছিল। বিশেষ করে সবার মধ্যে 'কমিউনিজমের[৪]' এক বিরাট আন্দোলন গড়ে ওঠে। চিন্তাধারা এমন ছিল, কমিউনিজমে বিশ্বাসী ছাত্রদের সংগঠিত করা হবে, যাতে তারা বিদ্রোহ করতে পারে। সারা ক্যাম্পাস জুড়ে বিক্ষোভ আন্দোলন এমন একটা রূপ ধারণ করে, বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ হয়ে যায়। ছাত্ররা প্রশাসনিক দপ্তর দখল করে নেয়। ভিয়েতনাম যুদ্ধে[৫] কানাডা তখন ছিল আমেরিকার পক্ষে। এর বিরুদ্ধে ছাত্ররা বিক্ষোভে ফেটে পড়ে।

এই সময়ে এসে আমি বিপ্লবী রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়ি। খ্রিষ্টধর্ম ত্যাগ করি। আমার জীবনের উপর এই ধর্মের বিশেষ কোনো প্রভাব ছিল না। আমি মার্ক্স-লেলিনের[৬] সাহিত্যসহ অন্যান্য তুলনামূলক সাহিত্য গভীরভাবে অধ্যয়ন শুরু করি। একজন আদর্শ বিপ্লবী হতে গেলে কমিউনিজমের বাইরেও বেশ কিছু বই পড়া আবশ্যক। ম্যালকম এক্সের[৭] জীবনী পড়তে গিয়ে ইসলাম সম্পর্কে সামান্য কিছু জানা হয়।

ম্যালাকম এক্সের জীবনের প্রথম দিকের কিছু অংশ আমার মনে খুব দাগ কাটে। বিশেষ করে বর্ণবাদ, গায়ের রঙয়ের কারণে মানুষকে সমাজে নির্যাতন, অপমান আমাকে খুব আহত করে। এসব পড়ে আমি আরও বেশি কমিউনিজমের দিকে ঝুঁকে পড়ি।

www.pathagar.com

কারণ, কমিউনিজম একটা ন্যায়সঙ্গত সমাজের কথা প্রচার করত। এমন সমাজের কথা বলে, যে সমাজে মানুষে মানুষে কোনো ভেদাভেদ থাকবে না, যে সমাজে সবার মধ্যে সাম্য থাকবে, সম্পদের সুষম বণ্টন হবে। সে সময়ের প্রেক্ষাপটে এই স্লোগানগুলো ছিল খুবই আকর্ষণীয়।

একসময় আমি কানাডা ছেড়ে আমেরিকায় পাড়ি জমাই। কারণ, আমেরিকাতেই তখন সত্যিকারের বিপ্লবী কর্মকাণ্ড চলছিল। আমি লস এঞ্জেলেসের একটি বিপ্লবী গ্রুপের সাথে যোগ দিই। এই গ্রুপের কাজ ছিল বিভিন্ন উপলক্ষে চাঁদা ও তহবিল সংগ্রহ করা। সমাজতান্ত্রিক অনেক আদর্শ, নীতিকথা বুকে ধারণ করে আমি আমেরিকায় এসেছিলাম। কিন্তু খুব কাছাকাছি থেকে কাজ করতে গিয়ে আমি তাদের মধ্যে অনেক ধরনের ত্রুটি, অনিয়ম দেখতে পাই। বিশেষ করে নীতি-নৈতিকতার দিক দিয়ে।

একবার একটা সমাবেশ ও মিছিল শেষে আমরা অফিসে ফিরছিলাম। আমার সিগারেট শেষ হয়ে গিয়েছিল। অফিসের একজনকে বললাম, 'ভাই আপনি কি কিছু টাকা ধার দিতে পারেন? আমার সিগারেট শেষ। এক প্যাকেট কিনতে হবে।'

'কোনো সমস্যা নেই' তিনি ড্রয়ারে রাখা চাঁদার টাকা থেকে আমাকে কিছু টাকা দিয়ে দিলেন।

আমার নিজের কাছে কিছুটা খটকা লাগল। মানুষের কাছ থেকে আমরা চাঁদা তুললাম, আর সে টাকায় কিনা আমি সিগারেট কিনতে যাচ্ছি! আমার ইতস্তত ভাব দেখে তিনি বললেন, 'আরে নাও নাও। আন্দোলনের কাজে জরুরি টাকা আমরা এখান থেকেই নিই।'

পরে আমি জানতে পারি, এই টাকা দিয়ে অনেকের বাসা ভাড়াও চলে। অনেকে গাড়ি কিনেছেন, এদিক-সেদিকও যাচ্ছেন। বড় বড় পার্টি হচ্ছে। এমনকি এই টাকা দিয়ে মদ, মাদকও কেনা হতো। বিষয়টা আমি মন থেকে মেনে নিতে পারিনি। মনে মনে আমি খুব হতাশ হয়ে পড়েছিলাম। এই যদি হয় নেতাদের অবস্থা, তবে সমাজতান্ত্রিক আদর্শ প্রতিষ্ঠা হবে কী করে?

লস এঞ্জেলসে একটা বড় সমাবেশ হয়েছিল। 'ব্ল্যাক প্যান্থার'সহ বিভিন্ন বড় বড় সংগঠনের নেতারা এসেছিলেন। সবাই ছিলেন মদে মাতাল। কোথাও কোনো শৃঙ্খলা নেই। মনে মনে আমি বুঝেছিলাম, এই আন্দোলন সংগ্রামের কোনো ভবিষ্যৎ নেই।

সে সময়ে আন্দোলনের পাঠ্যসূচিতে অন্যতম জনপ্রিয় বই ছিল 'Soul on Ice'। এর লেখক ছিলেন ব্ল্যাক প্যান্থারের সদস্য। এই বইটি ছিল মূলত শ্বেতাঙ্গ নারীদের ধর্ষণ করা নিয়ে।

www.pathagar.com

কবে, কীভাবে, কয় জন শ্বেতাঙ্গ নারীকে তিনি ধর্ষণ করেছেন, পুরো বই জুড়েই শুধু তার বর্ণনা। লোকজন এমনভাবে এই বইয়ের কথা বলত, যেন এটি আমেরিকার বর্ণবাদ বিরোধী একটা আদর্শ বই। বইটি পড়তে গিয়ে একজন সিরিয়াল রেপিস্টের জঘন্য যৌনাচার ছাড়া আমি আর কিছু পাইনি। কিন্তু এটাই ছিল আন্দোলনের পাঠ্যসূচি।

লস এঞ্জেলেসের এই র‍্যালি শেষে আমি টরেন্টো চলে যাই। সেখানে 'ব্ল্যাক ইউথ' নামে আরেকটি সংগঠনে যোগ দিই। এই সংগঠন ইউনিভার্সিটি অফ টরেন্টোর ক্যাম্পাসে থাকা কালো ছাত্রদের নিয়ে কাজ করত। এটাও ছিল জাতীয়বাদী ভাবধারার আরেক ধরনের সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন। এই সংগঠনের কাজ ছিল কানাডার কৃষ্ণাঙ্গ ছাত্রদের মাঝে চলমান নিপীড়নের বিরুদ্ধে সচেতনতা বাড়ানো। কিন্তু আমার কাছে মনে হলো, এই আন্দোলনটা কেবল কিছু তরুণ ছাত্রদের মধ্যে সীমাবদ্ধ। সমাজে সত্যিকারার্থে এর কোনো প্রভাবই নেই।

সে সময়ে আমি Feredirk Douglas-এর একটা বই পড়ি। তিনি নিজে ছিলেন একজন দাস। মুক্ত হবার পর তিনি দাসবিরোধী আন্দোলনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখেন। তার লেখায় আমেরিকার কৃষ্ণাঙ্গ লোকদের দুর্দশার কথা ছিল। তিনি তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় সরব ছিলেন। তার এই প্রচেষ্টা আমার মনে বিশেষ দাগ কাটে।

তিনি একটা কথা বলতেন, 'নির্যাতিতরা অত্যাচারিত হবার পেছনে আসলে তারা নিজেরাই সবচেয়ে বেশি দায়ী। তাদের কার্যক্রমই ঠিক করে দেয়, তারা আসলে কতটা নির্যাতিত হবে। তারা যদি সচেতন না হয়, এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ গড়ে না তোলে, তবে অত্যাচারের শিকার তো হবেই। মানুষ নিজেরা সচেতন না হলে আপনি কোনোভাবেই তাদেরকে মুক্তি এনে দিতে পারবেন না।'

এই সময়ে নতুন করে ইসলামের কিছু দিক আমার সামনে আসে। আমাদেরকে আলজেরিয়ার স্বাধীনতা সংগ্রাম নিয়ে একটা সিনেমা দেখানো হয়। সে সিনেমাতে দেখি যোদ্ধারা যুদ্ধের সময় 'আল্লাহু আকবার' বলে ধ্বনি দিতেন। মহিলারা হিজাব পরতেন। তারা হিজাবের ভেতরে স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য অস্ত্র লুকিয়ে রাখতেন।

একই সময়ে কৃষ্ণাঙ্গ মুসলিম এলিজা মুহাম্মাদের[৮] অনুসারীদের সাথে আমার পরিচয় হয়। আমি তাদের কিছু উপাসনালয়েও যাই। তাদের বাহ্যিক কিছু ব্যক্তিগত শৃঙ্খলার দিক আমাকে মুগ্ধ করলেও, 'ঈশ্বর আসলে একজন কালো পুরুষ' (God is a black Man) তাদের এই ধারণাটা আমি মেনে নিতে পারিনি। কমিউনিজমে এসে আমি ঈশ্বরের ধারণা বাদ দিয়ে দিয়েছিলাম। তারপরেও ঈশ্বর একজন কালো পুরুষ, এই ধারণা আমার কাছে বড় বেশি অদ্ভুত লেগেছিল।

www.pathagar.com

সব মিলিয়ে সে সময়ে ইসলামের কোনো দিক আমাকে খুব একটা টানেনি। আমি কমিউনিস্ট সংগঠনটিতে আমার কাজ চালিয়ে যাই। পাশাপাশি আমি তহবিল সংগ্রহের জন্য নাইট ক্লাবে গান গাইতে থাকি। দিনে দিনে আমার কাছে মনে হতে লাগল, আমরা যা করে বেড়াচ্ছি, তার কোনো ভবিষ্যৎ নেই। এর দ্বারা আসলে সমাজে কোনো ইতিবাচক পরিবর্তন আসবে না।

একই সময়ে আর্জেন্টিনার একটা গেরিলা গ্রুপ সরকার উৎখাতে সশস্ত্র বিপ্লবে নামে। তাদের নামটা এই মুহূর্তে আমার পুরোপুরি মনে নেই। আমাদের করে যাওয়া এত এত র‍্যালি, সেমিনারের বিশেষ কোনো ভবিষ্যৎ আমি দেখতে পাচ্ছিলাম না। মনে হলো, এখন এরকম সশস্ত্র বিপ্লবই একমাত্র উপায়।

আমি সিদ্ধান্ত নিলাম, মাও সেতুংয়ের* সশস্ত্র যুদ্ধ ও গেরিলা নীতি নিয়ে আমার পড়াশোনা করা দরকার। সেখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে চেয়ে আমি অটোয়াতে চীনের দূতাবাসে আবেদন করি। আমি দূতাবাসের শিক্ষা বিষয়ক কর্মকর্তার সাথে দেখা করতে যাই। ভদ্রলোক ছিলেন চেইন স্মোকার। তিনি একের পর এক সিগারেট টেনে যাচ্ছিলেন। তামাকের কটু গন্ধে দম বন্ধ হবার জোগাড়।

আমি ভেবেছিলাম, একটি আদর্শিক সমাজে তামাক, মদ, মাদক নিয়ন্ত্রণ করাটা জরুরি। কিন্তু দূতাবাসের কর্মকর্তা নিজেই যেখানে একজন চেইন স্মোকার, সেখানে সে রাষ্ট্র আর সমাজে মাদক নিয়ন্ত্রণই বা হবে কীভাবে, আর আদর্শিক সমাজও বা হবে কী করে। তারপরেও নিয়ম মেনে আমি ভর্তির আবেদন করি।

আমি আবার টরেন্টোতে ফিরে আসি আর দূতাবাস থেকে ডাক পাবার অপেক্ষা করতে থাকি।

১৯৭১ সালের ডিসেম্বরে একটা ইন্টারেস্টিং ঘটনা ঘটে। আমার খুব ঘনিষ্ঠ এক বন্ধু, যে কিনা আমাদের আন্দোলনের একজন প্রথম সারির নেতা ছিলেন, তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন আমার চেয়েও বড় সক্রিয় কমিউনিস্ট। মাও সেতুংয়ের এতটাই ভক্ত ছিলেন, গড়গড় করে মাওয়ের লেখা থেকে মুখস্ত বলে যেতে পারতেন। বিষয়টা আমাকে দারুণভাবে নাড়া দিল। আমি ভাবলাম, ইসলামে কী আছে আমার তা জানা দরকার। কোন জিনিসটা আমার এই সাচ্চা কমিউনিস্ট বন্ধুকে মুসলিম হবার ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করেছে?

আমি ইসলাম নিয়ে পড়া শুরু করলাম। প্রথম যে বইটি পড়ি, তার নাম 'Islam The Misunderstood Religion' (ভ্রান্তির বেড়াজালে ইসলাম)। লেখক মুহাম্মাদ কুতুব এই বইতে ইসলামের সাথে আধুনিক অন্যান্য মতবাদের তুলনামূলক আলোচনা করেছেন।

www.pathagar.com

রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক সব দিক থেকেই তিনি তার মূল্যায়ন তুলে ধরেছেন। এই বইটা পড়ার পরে আমার প্রত্যয় জন্মাল, মানব সমাজের জন্য ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় ইসলামের দেয়া কর্মপদ্ধতিই আর সব মতবাদের চেয়ে সেরা।

আমি এরপরে Towards Understanding Islam (ইসলাম পরিচিতি) সহ আরও বেশ কিছু ইসলামিক বই পড়ি। দিনে দিনে ইসলাম সম্পর্কে আমার আগ্রহ বেড়ে গেল। মনে মনে আমি ইসলামের প্রতি অনেকটাই ঝুঁকে পড়লাম। কিন্তু বহু বছর ঈশ্বরের অবিশ্বাসের পর, নতুন করে তাতে বিশ্বাস স্থাপন করা সহজ ছিল না। এ সময়ে আমার জীবনে এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটল।

আমি যে রুমে থাকতাম, সে রুমটা ছিল বইয়ে ঠাসা। আমার পরিচিত অনেকেই বই পড়তে আসতেন। আমি নিয়ম করে দিয়েছিলাম, চাইলে যে কেউ এখানে পড়তে পারবেন। কিন্তু বই বাইরে নেয়া যাবে না। একদিন বিছানায় আধাশোয়া হয়ে বই পড়ছিলাম। আমার সামনে অদূরেই টেবিলে বসে আরও অনেকে বইয়ের পাতা উল্টাচ্ছিলেন। আমার চোখে কিছুটা তন্দ্রা এসে গিয়েছিল। আমি বুঝতে পারছিলাম আমার আশেপাশে মানুষ আছে। এ অবস্থায়ও আমি স্বপ্ন দেখছিলাম।

আমি দেখলাম, সাইকেলে চড়ে আমি আমাদের গুদাম ঘরের দিকে যাচ্ছি। চারিদিকে অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে। আমার কেমন ভয় ভয় করছিল। মনে হচ্ছিল, আমার দ্রুতই এখান থেকে চলে যাওয়া উচিত। আমি পেছন ফিরে দেখি, রাস্তার আর কিছুই দেখা যাচ্ছে না। আমি যেন জমাট অন্ধকারে ডুবে পুরোপুরি হারিয়ে যাচ্ছি। ভয়ের হিমশীতল স্রোত আমার সারা শরীর জুড়ে বয়ে গেল। আমি বুঝতে পারছিলাম, যদি খুব দ্রুত এই অন্ধকার থেকে বেরিয়ে আসতে না পারি, আমি সারা জীবনের জন্য এখানে আটকা পড়ে যাব।

আমি আতংকে চিৎকার দিতে চাইলাম। বুঝতে পারছিলাম এই রুমে অনেক মানুষ আছে। আমি চাইছিলাম চিৎকার দিয়ে তাদের বলি, 'প্লিজ! আমাকে সাহায্য করুন। আমাকে এই অবস্থা থেকে উদ্ধার করুন।' কিন্তু আমার গলা দিয়ে কোনো আওয়াজ বের হচ্ছিল না। আমি অনুভব করছিলাম, কোনো এক শক্তি আমার কণ্ঠ রুদ্ধ করে দিয়েছে। আমি কোনোভাবেই এই দুঃসহ অবস্থা থেকে বের হতে পারছিলাম না। একসময় বুঝলাম, আমার আর কোনো আশা নেই। আমি এই নিকষ কালো অন্ধকারে চিরতরে হারিয়ে গেছি। ঠিক সে মুহূর্তে আমার ঘুম ভেঙে গেল।

ঘুম ভাঙার পরে এই স্বপ্ন নিয়ে গভীরভাবে ভাবলাম। মনে হলো, আমার নিয়ন্ত্রণের বাইরে কোনো এক অদৃশ্য শক্তির অস্তিত্ব আছে। আমি সেই বিমূঢ় অবস্থা কাটিয়ে উঠতে পারছিলাম না। আমার মনের উপর এই স্বপ্ন এক বিরাট প্রভাব ফেলল। তার কিছুদিন পরে আমি ইসলাম কবুল করি।

www.pathagar.com

যখন আমি নামাযের নিয়ম জানলাম, তখন এতদিনে বুঝতে পারলাম, আমার সেই দত্তক ভাই আসলে একজন মুসলিম। সে সময় একদিকে যেমন আমার খুব আনন্দ হচ্ছিল, অন্যদিকে মনের ভেতর রাগও হচ্ছিল। সুলেমান ইসলাম সম্পর্কে সবই জানত, বুঝত। কিন্তু একটিবারের জন্যও আমাকে কিছুই বলেনি।

আমি অটোয়াতে ফিরে গেলাম। সুলেমান তখনো আমার বাবা-মায়ের সাথে থাকত। সে তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। আমাকে কাছে পেয়ে সে তো মহাখুশি। আমি খুশি হলেও মনের ভেতরের হতাশা লুকিয়ে রাখতে পারছিলাম না। আমি তাকে জিজ্ঞাসাও করলাম, 'কেন? কেন এতগুলো বছর আমাদের সাথে থেকেও তুমি ইসলাম নিয়ে কিছুই বলেনি?'

সে কিছুটা বিব্রত হয়ে বলল, 'আমি মনে করেছিলাম, তোমাদেরকে ইসলামের কথা বলা কিংবা ইসলামের পথে নিয়ে আসার চেষ্টা করা... তোমাদের বাবা-মায়ের প্রতি অকৃতজ্ঞতা হয়ে যায়। তারা আমাকে এত ভালোবাসা দিয়েছেন, আমার জীবনটাকে এত সুন্দর করে গড়ে তুলতে সাহায্য করেছেন। তাদের কারণেই আজ আমি এই অবস্থানে আসতে পেরেছি। আমি কী করে তাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করি। তেমন কিছু হলে, তারা কি মনে মনে কষ্ট পেতেন না! আমি চাইনি পরিবারের মধ্যে আমার কারণে কোনো সমস্যা তৈরি হোক।'

আমি বললাম, 'তুমি কাজটা মোটেও ভালো করনি। হাজার হোক তুমি আল্লাহ সম্পর্কে জান। তুমি জান, তার প্রতি তোমার কী দায়িত্ব। তুমি তো অন্তত আমাদের জানাতে পারতে। এরপর গ্রহণ করা না করা সেটা আমাদের ব্যাপার।'

যাহোক, আমি টরেন্টোতে ফিরে আসি। তখনো আমি নাইট ক্লাবে গান গাইতাম। আমার জানা ছিল না, গান-বাজনা ইসলামে হারাম। আমাকে কেউ বলেনি। নাইট ক্লাবে যখন গাইতাম, মদ-মাদকে পুরো ক্লাব উন্মাতাল হয়ে উঠত। তাদের মাঝে থেকেও আমি তাদের সাথে একাত্ম হতে পারতাম না। মনে হতো আমি যেন ভিন্ন ভুবনের বাসিন্দা। যার সাথে এদের কোনো মিল নেই।

অল্প কিছু দিন পরে আমি গান-বাজনা ছেড়ে দেই। বিক্রি করে দিই আমার সব গানের সরঞ্জাম।

ইসলাম সম্পর্কে আরও ভালো করে জানার জন্য আমি ইংল্যান্ড যাই। সেখানে তাবলীগ জামায়াতের সাথে ছিলাম প্রায় তিন মাস। প্রায় মসজিদেই কমবেশি তাবলীগের জামায়াতের একটা দল থাকত। সে রকম একটা জামায়াতের আমীর ছিলেন কর্নেল আমীরুদ্দিন। আমি বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্ন করতাম,

www.pathagar.com

উত্তরগুলো শুনে নিয়ে খাতায় লিখে রাখতাম। আলহামদুলিল্লাহ। কর্নেল আমীরুদ্দিনের কাছ থেকে আমি সহীহ কুরআন, তাজবীদ ও ইসলামের অন্যান্য মৌলিক বিষয় সম্পর্কে জানতে পারি। হানাফী মাযহাব অনুযায়ী নামাযের বিভিন্ন নিয়ম-কানুনও শিখি।

আমি আর আমার স্ত্রী এক মসজিদের পাশে বাসা ভাড়া নিই। ওই বাড়ির মালিক ছিলেন মাহমুদ খেয়াল ভাই। তার বাড়ি মিসরে। তাঁর বাবা ছিলেন মিসরের 'ইখওয়ানুল মুসলিমিন'-এর গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। আমি মাহমুদ ভাইয়ের কাছ থেকে আরবি শিখি। তাঁর কাছ থেকে ফিকহের উপরে বিভিন্ন বই নিয়ে পড়ি। তিনি ছিলেন শাফেয়ী মাযহাবের অনুসারী। আমি দেখলাম, তাবলীগ জামায়াতের ভাইদের কাছ থেকে শেখা বিভিন্ন মাসয়ালাতে শাফেয়ী মতের বেশ কিছু অমিল আছে।

আমি ঠিক করলাম, আরবি শিখে আমাকে মূল উৎস থেকেই মাসয়ালা জানার চেষ্টা করা উচিত। আমি মদিনা ইউনিভার্সিটিতে ভর্তির আবেদন করি এবং ভর্তি হই। বিএ ডিগ্রি নিই উসূলে দ্বীন ও ইসলামিক স্টাডিজ-এর উপরে। তারপরে 'ইসলামিক ধর্মতত্ত্ব'-এর উপরে মাস্টার্স করতে ভর্তি হই রিয়াদের কিং সাউদ ইউনিভার্সিটিতে।

তত দিনে অনেক দেশ ঘুরে আমার মা-বাবা রিয়াদে এসে পৌঁছেছেন। তারা 'মানারাত' নামে একটা স্কুলে শিক্ষকতা করতেন। তারা আমাকে অনুরোধ করলেন, সে স্কুলে শিক্ষকতা করার জন্য। এই স্কুলে ইংরেজি মাধ্যমে যেসব ছেলে-মেয়ে পড়ত, তাদের বেশির ভাগই ছিল পাশ্চাত্যের দেশগুলো থেকে আসা।

আমার আগের যে শিক্ষক ইসলামিক স্টাডিজ পড়াতেন, তিনি ছিলেন পাকিস্তানি। বাচ্চারা তাকে মোটেও মানত না। উপমহাদেশের স্কুলগুলোর নিয়ম ছিল, শিক্ষক আসার সাথে সাথে ছেলে-মেয়েরা সব উঠে দাঁড়াবে। শিক্ষক কথা বলে যাবেন, ছাত্ররা চুপচাপ লিখে যাবে। শিক্ষক যতক্ষণ ক্লাসে থাকবেন কেউ একটা কথাও বলবে না।

আমেরিকার স্টাইল আবার পুরোপুরি আলাদা। সেখানকার ছাত্ররা ক্লাসে কথা বলে, স্যারকে নানা প্রশ্ন করে। কখনো কখনো শিক্ষকের সাথে তর্ক-বিতর্কও করে। ছাত্ররা সেই পাকিস্তানি শিক্ষককে একেবারে নাজেহাল করে ছাড়ে। বেচারা অল্পদিনেই চাকরি ছেড়ে চলে যান। আমি নিজে যেহেতু ছিলাম পাশ্চাত্যের, তাই তাদের পড়াশোনার ধরন আমার জানা ছিল। ছাত্র-ছাত্রীদের সামলাতে আমার খুব একটা বেগ পেতে হয়নি।

www.pathagar.com

পড়াতে গিয়ে অনুভব করলাম, ইসলামের মৌলিক দিকগুলো নিয়ে ইংরেজিতে মানসম্মত বইয়ের অভাব আছে। তাই আমি নিজেই ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য নোট তৈরি করা শুরু করলাম। কয়েক বছর পরে সেগুলো বই আকারে প্রকাশ পায়।

পরবর্তী সময়ে ওয়েলস বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আমি পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করি। বর্তমানে আমি দাওয়াহ কার্যক্রমের সাথে যুক্ত আছি। আমেরিকান মিলিটারির সাথে সেনাবাহিনীতে কর্মরত মুসলিম ভাইদের জন্য মসজিদ ও লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা কার্যক্রমের সাথেও যুক্ত ছিলাম। আলহামদুলিল্লাহ! আমাদের দাওয়াহ কার্যক্রমের কারণে হিন্দু ধর্ম, খ্রিষ্ট ধর্মের অনেক ভাই ইসলাম কবুল করেন।

এই ছিল আমার ইসলাম গ্রহণ ও তার পরবর্তী কার্যক্রমের বর্ণনা। আপনাদেরকে ধন্যবাদ, আমার কথা মনোযোগ দিয়ে পড়ার জন্য। জাযাকুমুল্লাহু খাইর।

পরিচিতি

ডেনিস ব্রাডলি ফিলিপস ছিল আবু আমিনা বিলাল ফিলিপসের পূর্ব নাম। ১৯৪৬ সালে জ্যামাইকাতে জন্ম হয় তার। পরবর্তী সময়ে বাবা-মায়ের সাথে কানাডায় চলে আসেন। সেখানেই তার বেড়ে ওঠা, শিক্ষা জীবন। রক গানে ভক্ত ফিলিপস গায়ক হিসেবে ভালো নাম করেন। তরুণ বয়সে জড়িয়ে পড়েন সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনে। খুব কাছ থেকে দেখা কমিউনিজম আন্দোলন ও তার দর্শন কিছুদিন পরে তাকে হতাশ করে তোলে। বই পোকা ফিলিপস একসময় ইসলাম নিয়ে পড়াশুনা শুরু করেন। ইসলামের চিন্তাধারা ও দর্শন তার মনের উপর দারুণ প্রভাব ফেলে।

ইসলাম গ্রহণের পরে তিনি মদিনা বিশ্ববিদ্যালয় ও রিয়াদের কিং সাউদ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উচ্চতর ডিগ্রি অর্জন করেন। পিএইচডি করেন ইংল্যান্ডের 'University of Wales' থেকে।

বিলাল ফিলিপস রিয়াদ ও দুবাইতে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতা করেন। উপসাগরীয় যুদ্ধের সময় তিনি আমেরিকান সেনাদের মাঝে ইসলামের দাওয়াতী কাজ করেন। তার দাওয়াতে সাড়া দিয়ে সে সময় বিপুল সংখ্যাক সৈন্য ইসলাম কবুল করে। তিনি কাতারভিত্তিক 'ইসলামিক অনলাইন ইউনিভার্সিটি'-এর প্রতিষ্ঠাতা।

বিলাল ফিলিপসের লেখা বইয়ের সংখ্যা অনেক। তন্মধ্যে 'The purpose of Creation', 'The Fundamentals of Tawheed', 'The Evolution of Fiqh', 'The Clash of Civillisation' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

www.pathagar.com

পাদটিকা

১. ডারউইন : চার্লস ডারউইন (১৮০৯-১৮৮২) ইংল্যান্ডের প্রকৃতিবাদী বিজ্ঞানী। বিবর্তনবাদের জনক হিসেবে তিনি বিখ্যাত। ১৮৫৯ সালে প্রকাশিত তার বহুল আলোচিত বই 'The Origin of Species' তাকে দুনিয়া জোড়া খ্যাতি এনে দেয়। এই বইতে তিনি বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত দিয়ে দাবি করেন, পৃথিবীর সকল প্রাণী মূলত একই প্রাণ থেকে এসেছে। আদিতে সব প্রাণীর উৎপত্তি আসলে এক কোষী এমিবা থেকে। তারপর কালপরিক্রমায় বিবর্তনের মাধ্যমে অন্য সব প্রাণীর উৎপত্তি।

তার এই তত্ত্ব অনুযায়ী মানুষ এসেছে শিম্পাঞ্জি গোত্রীয় এক প্রাণী থেকে। প্রকৃতিতে থাকতে গিয়ে যুগ যুগ ধরে প্রাণীরা নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্য দিয়ে যায়। এই প্রতিকূল পরিস্থিতির সাথে খাপ খাওয়াতে গিয়ে প্রাণীদের শরীরে অভ্যন্তরীন কিছু পরিবর্তন ঘটে। ধাপে ধাপে আকার, বৈশিষ্ট্য পাল্টে গিয়ে এক প্রাণী থেকে আরেক প্রাণীতে রূপান্তর ঘটে।

বিবর্তনবাদ আধুনিক সময়ের অন্যতম আলোচিত সমালোচিত তত্ত্ব। এই মতবাদ স্রষ্টায় বিশ্বাসী ধার্মিকদের প্রবল বিরোধিতার সম্মুখিন হয়। ধর্মীয় মতানুসারে, আল্লাহ নিজে মানুষ সৃষ্টি করেছেন। প্রথম মানব-মানবী আদম ও হাওয়া। বাইবেলের ভাষায় Adam ও Eve। অন্য কোনো প্রাণী থেকে মানুষের সৃষ্টি হয়নি।

অন্যদিকে, স্রষ্টায় অবিশ্বাসী নাস্তিকেরা এই মতবাদকে জোরালো সমর্থন দেন। তাদের ভাষায় এই তত্ত্ব বিজ্ঞানসম্মত। বিবর্তনবাদীরা মানুষের নীতি নৈতিকতা মানার ক্ষেত্রে শরীরের গঠন কাঠামো, মানুষের জিন, মানুষের আদি পুরুষ শিম্পাঞ্জী কিংবা হনুমানের আচরণ বিবেচনায় আনেন। তাদের এই মতবাদ/ধারণা আধুনিক কালের পশ্চিমা মনস্তত্ত্বের উপরও দারুণ প্রভাব বিস্তার করেছে।

২. সানডে স্কুল : খ্রিষ্টান ধর্মালম্বীদের কাছে রোববার হলো পবিত্র দিন। এদিন সাধারণত সাপ্তাহিক বন্ধ থাকে। রোববারে কিছু ধর্মীয় স্কুল পরিচালিত হয়। এগুলোই সানডে স্কুল নামে পরিচিত। রোববারে এসব স্কুলে ছেলেমেয়েরা একত্রিত হয়। বাইবেল থেকে আলোচনা হয়, যিশুকে নিয়ে গান গাওয়া হয়। মাঝে মাঝে বিভিন্ন পার্টি ও উৎসবেরও আয়োজন থাকে।

৩. টিমোথি লিয়েরী (১৯২০-১৯৯৬) : আমেরিকান মনোবিজ্ঞানী। তিনি মনস্তত্ত্ব ও মানসিক রোগের চিকিৎসায় LSD নামক এক ধরনের মাদক ব্যবহারের উপর জোর দেন। মাদক দিয়ে চিকিৎসা, মাদক ব্যবহারে উৎসাহ প্রদান ও নানা পরীক্ষা নিরীক্ষার কারণে তাকে প্রায় ৩৬ বার জেলে যেতে হয়েছিল। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সন তাকে আখ্যা দিয়েছিলেন, আমেরিকার সবচেয়ে ভয়ংকর ব্যক্তি হিসেবে।

৪. কমিউনিজম : কমিউনিজম শব্দটি ইংরেজি Common থেকে এসেছে। যার মানে হলো, সাধারণ। কমিউনিজম গত শতকের সবচেয়ে আলোচিত মতবাদ। এই মতবাদ অনুযায়ী, সৃষ্টির শুরুতে মানুষ গোত্রবদ্ধ হয়ে বাস করত। মানুষের মধ্যে ব্যক্তিগত সম্পদ বলে কোনো কিছু ছিল না। ছিল না মানুষে মানুষে হানাহানি, কাটাকাটি। ব্যক্তিগত সম্পদই মানুষে মানুষে বিভাজন, পার্থক্য তৈরি করেছে। তাই একটি শোষণমুক্ত সমাজ গড়তে হলে ব্যক্তিগত সম্পদের বিলুপ্তি ঘটাতে হবে। এমন ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে, যেখানে সম্পদের মালিক হবে সমাজ, কোনো ব্যক্তি নয়। কারণ, এই ব্যক্তিগত সম্পদই সকল সমস্যার মূল।

www.pathagar.com

১৫২৬ সালে থমাস মুর নামক একজন ইংরেজ লেখক একটি বই লিখেন, যার নাম Utopia। এই বইয়ে তিনি এমন একটি সমাজের কথা বলেন, যে সমাজে ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলে কিছু থাকবে না। পরবর্তী সময়ে ফরাসী দার্শনিক জ্যা জ্যাক রুশোসহ আরও অনেক লেখক ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিরুদ্ধে লেখালেখি করেন। তাদের এই মতামত রেনেসাঁ, ফরাসী বিপ্লবসহ সমকালীন বিভিন্ন আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। আস্তে আস্তে কমিউনিজমের ধারণা একটি রাজনৈতিক রূপ নেয়। সমাজতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠায় বিভিন্ন দেশে অনেক দল-মত গড়ে উঠে।

শিল্প বিপ্লবের পর অনেক শ্রমিকেরাই মানবেতর জীবনযাপন করতেন। তাদের শ্রমের টাকায় পুঁজিপতি মালিকেরা অর্থবিত্ত গড়ে তুলেছিলেন। এ নিয়ে সমাজতন্ত্রী অনেক লেখক দার্শনিক সমালোচনা মুখর হয়ে ওঠেন। তাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য জার্মান দার্শনিক কার্ল মার্ক্স (১৮১৮-১৮৮৩) ও তার সহযোগী ফ্রেডেরিক এঙ্গেলস (১৮২০-১৮৯৫)। তারা দুজন মিলে প্রকাশ করেন বিশ্ববিখ্যাত The Communist Manifesto। এর মাধ্যমে তারা কমুনিস্ট সমাজের রূপরেখা ও সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের স্বরূপ তুলে ধরেন।

১৯১৭ সালের রুশ বিপ্লবের পর সারা বিশ্বব্যাপী কম্যুনিস্ট আন্দোলন ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। দেশে দেশে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে সমাজতন্ত্র এক আদর্শিক আন্দোলন হিসেবে ছাত্রদের মাঝে ব্যাপক জনপ্রিয়তা পায়। ১৯৯০ সালে সোভিয়েত রাশিয়া ভেঙে যাওয়ার আগ পর্যন্ত কমবেশি এই অবস্থা বিরাজমান ছিল।

৫. ভিয়েতনাম যুদ্ধ : রুশ বিপ্লবের পর বিশ্ব মূলত সমাজতন্ত্র ও পুঁজিবাদ...এই দুই শ্রেণিতে বিভক্ত হয়ে পড়ে। একদিকে রাশিয়ার নেতৃতাধীন সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলো অন্যদিকে, আমেরিকার নেতৃত্বে পুঁজিবাদী দেশসমূহ। দুপক্ষই নানভাবে একে অন্যের সাথে সংঘাতে জড়িয়ে পড়ে।

লাওস, কম্বোডিয়া ও ভিয়েতনাম...ইন্দো-চীনভুক্ত এই তিন দেশ ছিল ফ্রান্সের উপনিবেশ। কম্যুনিস্ট নেতা হো চি মিনের নেতৃত্বে ভিয়েতনামের স্বাধীনতাকামী মানুষের সাথে ফ্রান্সের যুদ্ধ শুরু হয় ১৯৪৬ সালে। যুদ্ধে ফ্রান্স পরাজিত হয়। এই তিনটি দেশ পায় স্বাধীনতা।

পরবর্তী সময়ে ভিয়েতনামে দুটো পক্ষ তৈরি হয়। একদিকে, সমাজতান্ত্রীক চীন ও রাশিয়া সমর্থিত হ্যানয়ে অবস্থিত ভিয়েত মিনের সরকার, যেটি উত্তর ভিয়েতনাম নামে পরিচিত। অন্যদিকে আমেরিকা, ইংল্যান্ড ও ফ্রান্স সমর্থিত সায়গনে অবস্থিত সাবেক রাজা বাও দাইয়ের সরকার, যেটি দক্ষিণ ভিয়েতনাম নামে পরিচিত। একসময় দুপক্ষের মধ্যে যুদ্ধ বাঁধে। এ যুদ্ধ স্থায়ী হয় প্রায় ২০ বছর। আমেরিকা রাশিয়াসহ পরাশক্তিগুলো একে অন্যের বিরুদ্ধে ছায়া যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে।

শেষের দিকে আমেরিকা অনেক সক্রিয়ভাবে যুদ্ধে অংশ নেয়। দক্ষিণের সরকারের পক্ষ নিয়ে উত্তরাংশে নির্বিচারে বোমা বর্ষণ করে। আমেরিকান জনমত সরকারের বিরুদ্ধে চলে যায়। দেশব্যাপী তীব্র আন্দোলন, প্রতিবাদ চলতে থাকে। ফলে সরকার তার উচ্চাভিলাসী পরিকল্পনা থেকে সরে আসে।

৬. লেলিন : পুরো নাম ভ্লাদিমির ইলিচ লেলিন (১৮৭০-১৯২৪)। রাশিয়ার অক্টোবর বিপ্লবের নায়ক। বিপ্লবের পর মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তিনি ছিলেন সমাজতান্ত্রিক রাশিয়ার রাষ্ট্রপ্রধান।

৭. ম্যালকম এক্স (১৯২৫-১৯৬৫) : আফ্রিকান বংশোদ্ভুত কৃষ্ণাঙ্গ আমেরিকান মুসলিম। আমেরিকায় কৃষ্ণাঙ্গ মানুষদের অধিকার রক্ষায় তিনি ছিলেন উচ্চকণ্ঠ। আফ্রিকান আমেরিকানদের ইতিহাসে তিনি ছিলেন অন্যতম প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব।

www.pathagar.com

তাঁর ছয় বছর বয়সে তার বাবা খুন হন। তাঁর ১৩ বছর বয়সে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে তাঁর মা ভর্তি হন একটা মানসিক হাসপাতালে। ম্যালকম এক্সের কৈশোর কাটে বিভিন্ন এতিমখানায়।

পরবর্তী সময়ে তিনি Nation of islam নামে একটি সংগঠনের সাথে জড়িয়ে পড়েন। এই সংগঠন মূলত আফ্রিকান-আমেরিকান মুসলিমদের নিয়ে কাজ করত। একসময় সংগঠনের তৎকালীন প্রধান এলিজা মুহাম্মাদের সাথে বিরোধের জের ধরে এই সংগঠন থেকে বেরিয়ে আসেন।

১৯২৬ সালে এই সংগঠনের তিনজন সদস্যের হাতে তিনি নৃশংসভাবে খুন হন।

৮. এলিজা মুহাম্মাদ (১৮৯৭-১৯৭৫): ধর্মান্তরিত আমেরিকান মুসলিম। Nation of islam দলের নেতা।

তার জন্ম আমেরিকার জর্জিয়ায় একটা খ্রিষ্টান পরিবারে। ১৩ ভাই বোনের মধ্যে তিনি ছিলেন ৭ম। সে সময় আমেরিকায় বর্ণবাদ ছিল চরমে। কালো মানুষদের উপর অনেক শ্বেতাঙ্গরা নিষ্ঠুর আচরণ করতেন। এলিজা মুহাম্মাদ বর্ণবাদ বিরোধী বিভিন্ন আন্দোলনে সক্রিয় হয়ে ওঠেন।

১৯৩১ সালে Nation of islam-এর প্রতিষ্ঠাতা ওয়ালী ফরজ মুহাম্মাদের সাথে তার সাক্ষাত হয়। এলিজা তাকে মেসিয়াহ বা ত্রাণকর্তা বলে বিশ্বাস করতেন। একসময় এলিজা ইসলাম গ্রহণ করেন। কিছুদিন পরে ওয়ালী ফরজের রহস্যময় অন্তর্ধানের পর এলিজা Nation of islam-এর নেতৃত্বভার গ্রহণ করেন। এলিজা প্রচার করতে থাকেন, ওয়ালী ছিলেন আসলে ঈশ্বর। মানুষের রূপ ধরে মানুষকে শিখাতে তিনি পৃথিবীতে নেমে এসেছিলেন।

১৯৭৫ সালে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তিনি ঐ সংগঠনের প্রধান ছিলেন।

৯. মাও সেতুং (১৮৯৩-১৯৭৬): চীনের বিপ্লবী কমিউনিস্ট নেতা, আধুনিক গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র চীনের প্রতিষ্ঠাতা।

চীনের হুনানের প্রদেশের এক সম্ভ্রান্ত কৃষক পরিবারে মাওয়ের জন্ম। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী মাও সেতুং ছিলেন একাধারে কবি, লেখক, বিপ্লবী ও রাজনৈতিক প্রজ্ঞার অধিকারী। অক্টোবর রুশ বিপ্লবের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে তিনি চায়না কমিউনিস্ট পার্টিতে সক্রিয় ভূমিকা রাখেন। একসময়ে পার্টির নেতৃত্বে আসেন।

মার্ক্স-এঙ্গেলস-লেলিনের দর্শনে উদ্বুদ্ধ হয়ে বিপ্লব করলেও তার কর্মকৌশল, চিন্তাধারা ছিল কিছুটা ভিন্ন। তিনি মনে করতেন, বন্দুকের নলই সকল ক্ষমতার উৎস। তাই পুঁজিবাদী স্বার্থবাদী গোষ্ঠীকে ক্ষমতা থেকে হটাতে সশস্ত্র বিপ্লবের বিকল্প নেই। পাশাপাশি তিনি সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবকে চীনের পটভূমিতে ব্যাখ্যা করেন। তার মতে, চীনে সফল বিপ্লব করতে গেরিলা পদ্ধতির যুদ্ধই আদর্শ পন্থা।

মার্ক্স লেলিন যেখানে শ্রমিক শ্রেণিকে পুঁজিবাদী গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সংগঠিত করার ওপর জোর দেন, সেখানে মাও গ্রাম পর্যায়ের দরিদ্র কৃষক শ্রেণিকে সংগঠিত করতে মনোযোগী হন। একসময় কমিউনিস্ট পার্টি তৎকালীন শাসক শ্রেণির সাথে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। ১৯৪৯ সালে মাওয়ের নেতৃত্বে আধুনিক চীনের প্রতিষ্ঠা হয়।

১৯৭৫ সালে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত মাও সেতুং আধুনিক গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের রাষ্ট্রপ্রধান ছিলেন।

www.pathagar.com

মক্কার পথে

মুহাম্মাদ আসাদ

আমার নাম মুহাম্মাদ আসাদ। ইসলাম গ্রহণের পূর্বে নাম ছিল লিওপোল্ড লুইস। পোল্যান্ডের এক ইহুদি পরিবারে আমার জন্ম। আমার পরিবারের অতি প্রাচীন ধর্মীয় ঐতিহ্য ছিল। দাদা ছিলেন বংশ পরম্পরায় একজন রাব্বি। আপনারা হয়তো জানেন, ইহুদিদের ধর্মীয় পণ্ডিতকে বলা হয় 'রাব্বি'। অর্থাৎ একজন ইহুদি মোল্লা।

দাদা আমার বাবার জন্মের পরপরই ঠিক করে ফেলেন, বাবাও হবেন একজন রাব্বি। কয়েক পুরুষ ধরে আমাদের পরিবারে এমনটাই চলে আসছিল। বাবাকেও পরবর্তী রাব্বি বানানোর জন্য প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। কিন্তু বাবা ছিলেন বিজ্ঞানমনস্ক। উনার ইচ্ছা ছিল পদার্থবিজ্ঞানে উচ্চশিক্ষা নেয়া। দাদা ছিলেন বিজ্ঞান শিক্ষার ঘোরবিরোধী। তার মতে বিজ্ঞান শিক্ষা এক জাহেলি শিক্ষা। এই শিক্ষা গ্রহণ করলে বিধর্মী হয়ে যাবার আশংকা থাকে।

তবে আমার বাবা হাল ছাড়ার পাত্র নন। তিনি দিনের বেলা 'তালমুদ' পড়তেন এবং রাতের বেলা লুকিয়ে লুকিয়ে সাধারণ শিক্ষার কারিকুলামের বই পড়তেন। আমার দাদি এ বিষয়টা জানতেন। তিনি আমার বাবাকে এ ব্যাপারে সাহায্যও করেছেন। আট বছরের মাধ্যমিক কোর্স বাবা মাত্র চার বছরে শেষ করে বিএ পরীক্ষা দেন এবং পাস করেন। ডিগ্রি পাবার পরও বাবা ও দাদি খবরটা দাদাকে বলার সাহস পাচ্ছিলেন না। অবশেষে অনেক কসরত করে দাদাকে তারা ব্যাপারটি জানিয়ে দিলেন। অনেক অনুরোধের পর দাদা কিছুটা নরম হন এবং রাজী হন যে, বাবা উচ্চতর ডিগ্রি নিতে পারবে। তাকে আর রাব্বির পড়াশোনা করতে হবে না।

কিন্তু অর্থের অভাবে আমার বিজ্ঞানমনস্ক বাবার পক্ষে পদার্থবিজ্ঞান পড়া সম্ভব হয়নি। এ জন্য তিনি অধিক আয় করতে পারবেন ভেবে ব্যারিস্টারি অধ্যয়ন করেন।

www.pathagar.com

এরপর বিয়ে করেন আমার মাকে। আমার মায়ের জন্ম হয়েছিল এক ধনী ব্যাংকার পরিবারে। বাবা-মায়ের তিন সন্তানের মধ্যে আমি ছিলাম দ্বিতীয়।

আমি সাধারণ স্কুলে পড়ালেখা করেছিলাম। আমাদের পরিবারের ধর্মীয় ঐতিহ্য ছিল বিধায়, সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি ধর্মীয় বিষয়েও আমাকে শিক্ষা দেয়া হয়েছিল। তবে আমার মা-বাবা খুব বেশি ধর্ম সচেতন ছিলেন না। আসলে সে সময় দুই শ্রেণির লোক দেখা যেত। এক শ্রেণি হচ্ছে, যারা শুধুমাত্র অভ্যাসমতো ধর্মীয় নিয়মকানুন পালন করত। আরেক শ্রেণি ছিল যারা মনে করত, ধর্ম হচ্ছে একধরনের কুসংস্কারের মতো। মাঝে মাঝে সংস্কৃতির নামে এর কিছু নিয়ম মানা যায়, কিন্তু বুদ্ধি ও যুক্তি দিয়ে তা মানার প্রশ্নই উঠে না। বরং তারা মনে মনে এ নিয়ে কিছুটা লজ্জা অনুভব করত।

উপরের দুই শ্রেণির মধ্যে আমার মা-বাবা ছিলেন প্রথম শ্রেণির মানুষ। যারা পারিবারিক ঐতিহ্য থাকার কারণে এক রকম অভ্যাসবশত ধর্মীয় নিয়মকানুন পালন করতেন। কিন্তু ধর্ম অনুসারে জীবন পরিচালনা করা বা নৈতিক চিন্তা গড়ে তোলার কোনো চেষ্টাই তাদের ছিল না। তাদের মাথায় এ সম্পর্কে বিন্দুমাত্র চিন্তাও আসেনি।

তবে পারিবারিক ঐতিহ্য থাকার কারণেই আমাকে অনেক সময় নিয়ে ইহুদি ধর্মের শিক্ষা দেয়া হতো। একজন শিক্ষক নিয়মিত বাসায় এসে আমাকে হিব্রু ভাষায় ধর্ম শিক্ষা দিতেন। তেরো বছর বয়সেই আমি হিব্রু ভাষায় অনর্গল কথা বলতে পারতাম। এ ছাড়া শিখে ফেলি সুরিয়ানি (Arameich) ভাষা। হিব্রু ভাষার সকল ধর্মগ্রন্থ সম্পর্কেই সম্যক ধারণা পেয়েছিলাম। অনেক ছোট বেলাতেই আমি তালমুদ ও ওল্ড টেস্টামেন্ট সম্পূর্ণ পড়ে ফেলি।

এছাড়া তালমুদের মূলপাঠ এবং এর তাফসির অর্থাৎ, 'মিশনা' ও 'জেমারা'ও পড়ে ফেলি। এমনকি জেরুজালেম এবং ব্যাবিলনের তালমুদের পার্থক্যগুলো নিয়ে আমি অবলীলায় আলোচনা করতে পারতাম। আমি এত আগ্রহ নিয়ে তালমুদ শিখতাম যে, মনে হতো আমিও যেন আমার পূর্বপুরুষদের মতো একজন 'রাব্বি' বা ইহুদি মোল্লা হয়ে যাব।

তবে ধর্ম সম্পর্কে খুব দ্রুত জ্ঞান অর্জনের কারণে যেটা হলো, তালমুদের অসঙ্গতি ও ভুলগুলো খুব দ্রুত আমার চোখে পড়ে যায়। ফলে ইহুদি ধর্ম গ্রন্থগুলো সম্পর্কে আমি হতাশ হয়ে গেলাম। যদিও ইহুদি ধর্মগ্রন্থগুলোর নৈতিক ও সৎকাজগুলো সম্পর্কে আমার কোনো মতবিরোধ ছিল না। নবিদের সম্পর্কেও আমার কোনো অবিশ্বাস ছিল না। কিন্তু আমার মনে হতো ওল্ড টেস্টামেন্টে শুধু বর্ণনা করা হয়েছে যে, একজন পূজারী কীভাবে পূজা-অর্চনা করবে।

www.pathagar.com

আরও যে বিষয়টি আমার খটকা লাগত সেটা হচ্ছে, গ্রন্থটির বর্ণনা অনুসারে আল্লাহ যেন শুধু ইবরাহিমের বংশধর বা ইহুদি জাতির স্রষ্টা। তিনি যেন শুধু ইহুদিদের নিয়েই ব্যস্ত। গোটা সৃষ্টি বা মানবজাতিকে নিয়ে আল্লাহর কোনো চিন্তা ও পরিকল্পনা নেই।

মনে হচ্ছিল আল্লাহ একটি উপজাতির দেবতা। তার উপজাতিটি যদি সৎ কাজ করে তবে তাদেরকে দেশ জয়ের মাধ্যমে পুরস্কৃত করা হয়, আর যদি তারা কোনো অন্যায় করে, তবে যুদ্ধে হারিয়ে তাদেরকে শাস্তি দেয়া হয়। এছাড়া পৃথিবীর বাকি সৃষ্টিদের নিয়ে আল্লাহর কোনো আগ্রহ নেই।

আমি ইহুদি ধর্ম সম্পর্কে আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছিলাম। সে সময় আমি অন্য ধর্মগুলো সম্পর্কেও জানার কোনো চেষ্টা করিনি। ধর্মসংক্রান্ত ভাবনা ছেড়ে আমি এক আধুনিক জীবনে গা ভাসিয়ে দিয়েছিলাম।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ইউরোপের মানুষদের ভেতরে কোনো ধর্মীয় মূল্যবোধ ছিল না। ধর্ম তখন শুধুমাত্র একটা নামসর্বস্ব প্রথা ছিল। তরুণদের সামনে সে সময় কোনো নৈতিক মূল্যবোধ ছিল না। একসময় আমারও মনে হতে থাকে, আল্লাহ নেই। আমি আধুনিক জীবনযাপন শুরু করি। কিন্তু আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতাও আমাকে দিন দিন হতাশ করে তুলছিল। এখানে জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে, যেন আরাম-আয়েশ ও কমফোর্ট। জীবনের একমাত্র লক্ষ্য যেন শুধু ধনী হওয়া। আরও মনে হতো, মানুষ যেন এক অপূর্ণ যান্ত্রিক জীবনযাপন করছে।

আধুনিক জীবনের হতাশা থেকে কিছুদিন আমি কমিউনিজম নিয়ে পড়ালেখা শুরু করলাম। সে সময় চলছিল কমিউনিস্ট বিশ্বাসের জয়জয়কার। কমিউনিস্টরা একটা সুখী জীবনের স্বপ্ন দেখাত। কিন্তু সেটিও আমার আগ্রহকে বেশি দিন ধরে রাখতে পারেনি। কারণ, মনে হতো এরা শুধুমাত্র বাহ্যিক অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনের সমস্যা এবং ত্রুটি খুঁজে বের করে, তার সমাধান দিচ্ছে। কোনো নির্দিষ্ট মৌলিক মূল্যবোধ এদের নেই। এ ছাড়া তারা সবকিছু বিজ্ঞানের আলোকে বিচার করে। কিন্তু আমি বুঝতে পেরেছিলাম, নৈতিক মূল্যবোধ ছাড়া বিজ্ঞান এক ধ্বংসাত্মক হাতিয়ার। যা আমাকে সমাজ নিয়ে আরও চিন্তিত করে তুলত।

আমি এই ভোগবাদী সমাজের পরিবর্তন চাইতাম। মনে মনে ভাবতাম, এর সমাধান কী? তবে আমার চিন্তার জগত শুধুমাত্র ইউরোপের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। এর সমাধানও আমি ইউরোপের সংস্কৃতির মধ্যেই খুঁজছিলাম।

www.pathagar.com

কিন্তু এর বাইরেও যে সমাধান থাকতে পারে, তা কখনো আমার মাথায় আসেনি। আর ইসলাম সম্পর্কে তো তখন আমার কোনো জ্ঞানই ছিল না।

আমি ছিলাম খুবই এডভেঞ্চার প্রিয়। একসময় আমি শিল্পসাহিত্যের প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠি। এজন্য পড়ালেখা শুরু করি ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিল্প ও সাহিত্য নিয়ে। কিছু দিন যেতে না যেতেই তাতেও আমি আগ্রহ হারিয়ে ফেলি। কারণ, সেখানে শিক্ষকরা শুধুমাত্র সাহিত্যের রূপ-রস নিয়ে আলোচনা করতেন। তার অন্তর্নিহিত আধ্যাত্মিক বিষয়ে খুব বেশি একটা কথা বলতেন না।

আসলে আমি কোনো কিছুতেই স্থির হতে পারছিলাম না। সবকিছুর অসঙ্গতিগুলোই শুধু চোখে পড়ছিল। সে সময় সমাজের বিভিন্ন প্রশ্ন প্রতিনিয়ত আমার ভেতরকে জর্জরিত করত। কোনো কিছুরই স্থায়ী সমাধান খুঁজে পাচ্ছিলাম না। এ অবস্থায় আমি পড়ালেখার প্রতিও আগ্রহ হারিয়ে ফেললাম।

আমার বাবার স্বপ্ন ছিল আমি পিএইচডি করব। কিন্তু সে সময় আমি নিজের মধ্যে এক লেখক সত্ত্বা আবিষ্কার করি। আমি সিদ্ধান্ত নিই সাংবাদিকতা করব। স্বাভাবিকভাবেই বাবা এতে মনঃক্ষুণ্ন হন। আসলে আমার সে সময়কার অস্থির অবস্থার কথা আমি কাউকে বুঝাতে পারছিলাম না। প্রতিনিয়ত আমি যেন কিছু একটা খুঁজছি। কিন্তু কী খুঁজছিলাম, তা আমি নিজেও জানতাম না।

পড়ালেখা ছেড়ে পরিবারের বিরুদ্ধে গিয়ে সাংবাদিক হবার চেষ্টা করার কারণে আমাকে প্রচুর অর্থনৈতিক সংকটে পড়তে হয়। সে সময় আজকের মতো এত সংবাদপত্র ছিল না। ফলে যেকোনো বড় সংবাদপত্রে চাকরি পাওয়া ছিল অনেক কষ্টের। কিছুদিন এক সিনেমার পরিচালকের সহকারী হিসেবে কাজ করেছি। জীবন পরিচালনার জন্য বিভিন্ন জায়গায় করেছি অস্থায়ী কাজ। এই পরিমাণ অর্থনৈতিক কষ্টে পড়েছি যে, মাঝে মাঝে দিন কেটেছে শুধুমাত্র চা আর বাড়িওয়ালির দেয়া দুই টুকরো রুটি দিয়ে।

অবশেষে আমি এক পত্রিকায় কাজ পেলাম। তবে তা সামান্য টেলিফোনিস্টের কাজ। যা আমার উচ্চাশার তুলনায় ছিল খুবই হতাশাজনক। কিন্তু অর্থনৈতিক কষ্টের সেই সময় ঐ কাজ ছাড়া আমার আর কোনো পথ ছিল না। ভাগ্যক্রমে আমি ধীরে ধীরে টেলিফোনিস্ট থেকে সেই পত্রিকার রিপোর্টার পদে উন্নীত হই। এভাবে আমার সাংবাদিক হবার স্বপ্ন পূরণ হয়।

www.pathagar.com

তবে তখনও আমার মনের ভেতরের অস্থিরতা কমেনি। আমি শুধু মানুষের জীবনের মানে খুঁজতাম। খুঁজতাম এই মানসিক অবস্থার সমাধান।

হঠাৎ একদিন আমার মামা ডোরিয়ানের কাছ থেকে আমি একটি চিঠি পাই। তিনি ছিলেন আমার মায়ের সব চেয়ে ছোট ভাই। জেরুজালেমের একটি মানসিক হাসপাতালের তিনি প্রধান ছিলেন। তিনি ইহুদি হলেও ইহুদি ধর্ম পালনের প্রতি তার কোনো আগ্রহ ছিল না। বরং আরবদের প্রতি তার এক ধরনের দুর্বলতা ছিল। তিনি ছিলেন অবিবাহিত। এজন্য সেখানে খুব একাকিত্ববোধ করতেন।

তিনি চিঠিতে জেরুজালেমের সৌন্দর্যের বর্ণনা করে, আমাকে সেখানে যাবার আমন্ত্রণ জানান। তিনি চাচ্ছিলেন, আমি তার কাছে গেলে তার একাকিত্ব দূর হবে।

আমি কিশোর বয়স থেকেই ছিলাম উত্তেজনা ও ভ্রমণ প্রিয়। তাই তার এই আমন্ত্রণ পেয়ে আমি আর অপেক্ষা করিনি। আমি সিদ্ধান্ত নিই, আমি জেরুজালেম যাব। পরদিন সকালেই পত্রিকা অফিসে জানিয়ে দিই যে, এক সপ্তাহের জন্য আমি জেরুজালেম যাচ্ছি।

তখন পর্যন্ত ইসলাম সম্পর্কে আমার কোনো ধারণা ছিল না। আরব বলতে তখন আমার জ্ঞান শুধু আরব্য কিছু রোমান্টিক উপন্যাসের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। আমার ধর্মীয় জ্ঞান ছিল শুধুমাত্র ইউরোপের দুটি প্রধান ধর্ম ইহুদি ও খ্রিষ্টান ধমর্কে ঘিরেই। ইসলামকে এদের সাথে তুলনা করার কথা চিন্তাও করতে পারতাম না।

ডোরিয়ান মামার আমন্ত্রণে আমি জেরুজালেমের পথে যাত্রা শুরু করি। বলা চলে সেই সাথে ইসলামের পথেও আমার যাত্রা শুরু হয়।

মধ্যপ্রাচ্যের উদ্দেশ্যে আরবমুখী জাহাজে উঠে বসলাম। জাহাজে করে কয়েক দিন পর নামলাম আলেকজান্দ্রিয়ায়। সেখান থেকে ট্রেনে করে যেতে হয় ফিলিস্তিনে।

যাত্রা পথে ট্রেন মাঝে মাঝেই বিভিন্ন স্টেশনে থামছিল।

একটা স্টেশনে বসে বাইরে আরবের সৌন্দর্য দেখছিলাম। এ সময় এক আরব বেদুইন এসে বসল আমার সামনে। মাথায় পাগড়ি।

আমি আগ্রহ নিয়ে তাকে দেখছিলাম।

সে খাওয়ার জন্য একটি কেক বের করল। আমার উপর তার হঠাৎ চোখ পড়ল। হালকা হেসে কেকটা দুইভাগ করে এক টুকরো এগিয়ে দিল আমার দিকে।

www.pathagar.com

আমি ইতস্ততবোধ করছিলাম।

আমার অবস্থা বুঝে সে মিষ্টি হেসে বলল, 'তফদ্দাল' অর্থ– 'আমাকে অনুগ্রহ করুন।'

আমি কেকের টুকরোটি নিলাম এবং ধন্যবাদ জানালাম।

এই ঘটনা আমাকে অবাক করল। কারণ, ইউরোপে এরকম ব্যবহারের সাথে আমি পরিচিত নই। এই যে অপরিচিত এক সফর সঙ্গীর সাথে কেক ভাগ করে খাওয়ার অভ্যাস আমাকে যেমন অবাক করেছে, তেমনি করেছে মুগ্ধ।

আসলে ইসলাম গ্রহণের পেছনে একটি বড় অবদান হচ্ছে, আরব মুসলমানদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। আর আরবে থাকতে থাকতে একসময় আমি এই বৈশিষ্ট্যের প্রেমে পড়ে যাই। যা আমাকে ইসলাম সম্পর্কে জানতে উৎসাহী করে।

ডোরিয়ান মামার ওখানে থাকার সময়টা ছিল শরৎকাল। প্রায়ই বৃষ্টি হতো। এজন্য আমাকে বেশির ভাগ সময় বাসাতেই থাকতে হতো।

মামার বাসার পেছনেই থাকতেন এক বৃদ্ধ আরব। এলাকার মানুষ তাকে 'হাজি' সাহেব বলে ডাকতেন। কারণ, তিনি মক্কা থেকে হজ্জ করে এসেছিলেন। তার অনেকগুলো গাধা ছিল। যা তিনি ভাড়ায় খাটাতেন। এজন্য সবসময়ই তার বাসার উঠানটি ছিল লোকে লোকারণ্য। লোকটি ছিল দরিদ্র। তার গায়ের জামা ছিল মলিন ও ছেঁড়া। কিন্তু তার মুখে ছিল সবসময় এক প্রকার তৃপ্তির হাসি।

আরবদের চালচলনে সবসময় জীবনের প্রতি তৃপ্তি ও সন্তুষ্টি প্রকাশ পেত। যা আমাকে অবাক করত। তারা প্রতিটা কথায়, কাজে, যেকোনো অবস্থায় স্রষ্টাকে ধন্যবাদ জানাত। আমি খুব আগ্রহ ভরে তাদের সালাত আদায় করতে দেখতাম। তাদের প্রার্থনার বৈশিষ্ট্য আমার কাছে অদ্ভুত লাগত।

সালাতের সময় হলে তারা আশেপাশের সকল মানুষকে জমায়েত করত। তারপর তারা এক লম্বা কাতারে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়াত। হাজি সাহেব ইমাম হিসেবে তাদের সামনে দাঁড়াতেন। সালাত শুরুর পর সবাই একই সাথে দাঁড়াত, মাথা নিঁচু করত, আবার একই সাথে মাটিতে কপাল ঠেকাত। সালাতের এই বৈশিষ্ট্যটি আমার কাছে অনেকটা সৈনিকদের একসাথে অনুশীলনের কথা মনে করিয়ে দিত। মনে হতো তারা প্রত্যেকে যেন এক একটা সৈনিক।

প্রার্থনার সাথে এরকম হাত পা চালানোটা আমার কাছে খুবই অযৌক্তিক লাগত।

www.pathagar.com

একদিন আর থাকতে না পেরে হাজি সাহেবকে জিজ্ঞেস করলাম, আসলেই কি আল্লাহ চান, আপনারা এরকম সকাল-সন্ধ্যা মাটিতে কপাল ঠেকান? এর চেয়ে নিভৃতে প্রার্থনা করাই কি বেশি ভালো না? আর প্রার্থনার সময় এরকম উঠা-বসা করার মানেটাই বা কী?

অবশ্য প্রশ্ন করার পরে আমি এই ভেবে কিছুটা লজ্জা পেলাম যে, একজন ধর্মপ্রাণ মানুষকে আমি আবার অপমান করলাম না তো !

কিন্তু হাজি সাহেব মোটেও অপমানিত হলেন না; বরং এর জবাব দিতে পেরে তাকে আনন্দিতই মনে হলো। তিনি বললেন, 'দেখুন, আল্লাহ কি আমাদের দেহ ও আত্মাকে একসাথে সৃষ্টি করেননি? তাহলে এই দুয়ের সমন্বয়ে ইবাদত করলে সমস্যা কী? আপনি কি আমাদের সালাতের পদ্ধতিটি জানেন? আমরা প্রথমে কা'বার দিকে মুখ করে দাঁড়াই এটা ভেবে যে, মুসলমানদের যে যেখানেই থাকুক না কেন, সে ইবাদতের সময় তার মুখ, মন, ধ্যান-ধারণা আল্লাহর দিকে কেন্দ্রিভূত করবেন। এরপর আমরা সোজা হয়ে দাঁড়াই এবং আল্লাহর কালাম থেকে পাঠ করি। আমরা বিশ্বাস করি, এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে এবং মানুষকে দেয়া হয়েছে যেন এর মাধ্যমে মানুষ সহজ-সরল পথে অটল থাকেন। এরপর আমরা বলি; আল্লাহু আকবার, যার অর্থ আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ।

এটা বলার পর আমরা হাঁটুতে হাত রেখে গভীরভাবে নুয়ে পড়ি। কারণ, তাঁকে সবার উপরে আমরা সম্মান করি।

এরপর সিজদায় লুটিয়ে পড়ি এবং ভাবি, আমরা তাঁর কাছে ধূলিকণা মাত্র। তিনিই আমাদের স্রষ্টা ও পালনকর্তা।

এরপর আবার উঠে বসি এবং বলি, তিনি যেন আমাদের ক্ষমা করেন, আমাদের উপর রহমত বর্ষণ করেন। সরল পথে রাখেন, স্বাস্থ্য ও রিজিক বাড়িয়ে দেন। এরপর আবার সিজদায় যাই।

এরপর উঠে নবি মুহাম্মদ ﷺ-এর জন্য দোয়া করি, যিনি আমাদের কাছে আল্লাহর বাণী পৌঁছে দিয়েছেন। আরও দোয়া করি পূর্ববর্তী নবি-রাসূলদের জন্য।

এরপর আমরা মাথা ডান ও বাম দিকে ঘুরাই এবং পৃথিবীর যেখানে যত সৎকর্মশীল আছে, তাদের সবাইকে অভিবাদন জানাই ও শান্তি কামনা করি।

এভাবেই আমাদের রাসূল সালাত আদায় করেছেন এবং এভাবেই তিনি সবাইকে সালাত আদায় করা শিখিয়েছেন। যেন প্রতিটি মুসলমান এর মাধ্যমে আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করতে পারেন।

www.pathagar.com

আর এটাই ইসলামের মূল শিক্ষা, যেন প্রতিটি মুসলমান আল্লাহর সাথে সম্পর্ক স্থাপন করতে পারেন এবং সম্পর্ক করতে পারেন তাদের নিয়তির সাথে।

আমি মুগ্ধ হয়ে হাজি সাহেবের কথা শুনছিলাম। আমি ইসলাম গ্রহণ করেছিলাম আরও অনেক পরে। কিন্তু আমি এখন অনুভব করতে পারি, হাজি সাহেবের সেদিনের কথাগুলোই আমার সামনে ইসলামের দ্বার প্রথম খুলে দিয়েছিল।

আরেকটি ঘটনা আমাকে খুব নাড়া দিয়েছিল। একবার ট্রেনে ভ্রমণের সময় আমার কামরায় সহযাত্রী হিসেবে ছিলেন এক গ্রিক ব্যবসায়ী এবং এক মিসরীয় গ্রাম্য সরদার। বিভিন্ন বিষয় নিয়ে ব্যবসায়ীর সাথে আলোচনা হচ্ছিল। আর মিসরীয় গ্রাম্য ব্যবসায়ীটি ছিল পুরোই গণ্ডমূর্খ। এমনকি জানতে পারি যে, সে লিখা তো দূরে থাক, পড়তেও জানে না। সে সময় আরব মুসলমানদের প্রতি আমার মাত্র মুগ্ধতা শুরু হয়েছিল। ইসলামের কিছু বিষয় একটু একটু জানতে শুরু করেছিলাম। সেগুলো আমার কাছে যৌক্তিক ও ইনসাফপূর্ণ মনে হয়েছিল। কথায় কথায় গ্রিক ব্যবসায়ীকে সে কথা জানাই।

গ্রিক ব্যবসায়ী কোনোভাবেই আমার সাথে একমত হতে পারছিল না। সে একটু তাচ্ছিল্যের সুরে পড়ালেখা না জানা মিসরীয় সর্দারকে বলল, কীভাবে তোমাদের ধর্ম ইনসাফপূর্ণ হতে পারে? তোমাদের ধর্মের বিধান অনুসারে একজন মুসলমান পুরুষ ইহুদি-খ্রিষ্টান নারীকে বিয়ে করতে পারে, কিন্তু একজন মুসলমান নারীকে ইহুদি এবং খ্রিষ্টান পুরুষের কাছে বিয়ে দেয়া হয় না। এটা কীভাবে সঠিক ও ন্যায়সঙ্গত হতে পারে?

প্রশ্নটা আমার কাছে যৌক্তিক মনে হয়েছিল। কিন্তু আমাকে অবাক করে দিয়ে মিসরীয় ব্যক্তিটি উত্তর দিল–

'অবশ্যই এটা ইনসাফপূর্ণ নিয়ম। আমি তোমাকে বুঝিয়ে বলছি। আমরা যদিও ঈসা ﷺ-কে আল্লাহর পুত্র বলে মানি না, কিন্তু আমরা মনে করি তিনি আল্লাহর নবি। ঠিক সেভাবে আমরা এটা মানি যে, মুসা ﷺ, ইবরাহিম ﷺ এবং বাইবেলে বর্ণিত সকল নবিকেও পাঠানো হয়েছে আল্লাহর পক্ষ থেকে।

সুতরাং, কোনো ইহুদি ও খ্রিষ্টান নারীকে যদি কোনো মুসলিমের সাথে বিয়ে দেয়া হয়, তবে সে নিশ্চিত থাকতে পারবে, সে যে সকল নবিকে সম্মান করে তাদের সম্পর্কে নতুন পরিবারে কোনো খারাপ উক্তি করা হবে না। কিন্তু কোনো মুসলমান নারীর যদি কোনো অমুসলমানের সাথে বিয়ে হয়, তবে আশংকা থাকে, নতুন পরিবারে সে যাকে আল্লাহর রাসূল বলে মানে তাকে অবমাননা করা হতে পারে।

www.pathagar.com

এমনকি আশংকা থাকে তার নিজের সন্তান ও আল্লাহর রাসূলকে অবমাননা করতে পারে। কারণ, সন্তানরা তো তাদের বাবার ধর্ম দ্বারাই বেশি প্রভাবিত হয়। তোমার কী মনে হয় এভাবে একটি মুসলমান মেয়েকে যন্ত্রণা এবং অবমাননার দিকে ঠেলে দেয়া ইনসাফপূর্ণ হবে?'

গ্রিক ব্যবসায়ীটি অসহায়ভাবে কাঁধ ঝাঁকাল। কিন্তু কোনো উত্তর দিতে পারল না।

আমি এই অশিক্ষিত গ্রাম্য ব্যক্তিটির মুখে এরকম যৌক্তিক উত্তর শুনে অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। ঠিক যেমনটা অবাক হয়ে গিয়েছিলাম বৃদ্ধ হাজি সাহেবের উত্তর শুনে। অবাক হয়ে ভাবলাম, কোন সেই জ্ঞান যা বিদ্যালয়-কলেজে না যাওয়া মুসলমানদের এমন কথা শেখাল। বুঝতে পারছিলাম, ধীরে ধীরে ইসলামের দরজা আমার কাছে খুলে যাচ্ছিল। ইসলাম সম্পর্কে জানার জন্য আমি ভেতরে ভেতরে আগ্রহী হয়ে উঠছিলাম।

জেরুজালেম আমার এত ভালো লেগে যায়, সেখান থেকে আর ইউরোপের জীবনে ফিরে যেতে ইচ্ছে করছিল না। এছাড়া দিন দিন প্রাচ্য এবং এর মানুষদের প্রতি আমার আগ্রহ আরও বাড়ছিল। তাই আমি একটা বুদ্ধি বের করি। আমি আমার পূর্বের পত্রিকার চাকরিটা ছেড়ে দিই। প্রাচ্য এবং আরবদের সম্পর্কে আর্টিকেল লিখে দিব, এই প্রস্তাব দিয়ে বিভিন্ন পত্রিকায় কাজ করার আগ্রহ ব্যক্ত করি। আশ্চর্যজনকভাবে একটি বিখ্যাত পত্রিকা এ বিষয়ে আগ্রহ দেখায়। তারা আমার লেখার বিনিময়ে পারিশ্রমিক দিবে বলে রাজি হয় এবং এ বিষয়ে একটি বই প্রকাশেরও আগ্রহ দেখায়। পারিশ্রমিক যদিও অনেক কম ছিল; কিন্তু আমি প্রাচ্যে থাকতে পারছি, এটাই আমাকে সবচেয়ে আনন্দিত করে তুলেছিল।

এর ফলে খুব কাছ থেকে আরবদের সাথে মেশার সুযোগ পাই। দেখতে পাই, মুসলিম সমাজের মধ্যে মন ও ইন্দ্রীয়ের এক সহজাত সম্পর্ক রয়েছে। তারা বিশ্বাস করে জীবনের সকল ভালো-মন্দ আল্লাহর কাছ থেকে এসেছে। নিয়তির প্রতি এই বিশ্বাস তাদের হৃদয়কে সবসময় সজীব রাখে। জীবনের দারিদ্রতা অপ্রাপ্তি থাকা সত্ত্বেও তারা সবসময় আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট। ইউরোপ যা অনেক আগেই হারিয়ে ফেলেছে।

www.pathagar.com

রাজনৈতিক দীনতা, অভাব, অপ্রতুল সুযোগ-সুবিধার মধ্যেও আরবরা কীভাবে এ ধরনের মানসিকতা ধারণ করে, তা আমাকে বিস্মিত করছিল। কী তাদের এই প্রশান্তির মূলে– এটা জানার জন্য আমি ইসলাম ও আরব ইতিহাস সম্পর্কে পড়া শুরু করি।

পত্রিকার কাজে আমাকে অনেক দিন কায়রোতে থাকতে হয়। সেখানে আমার অনেক মুসলিম বন্ধু আছে। ইসলামের বিষয়ে আগ্রহ দেখে বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিয়ে তারা আমাকে ইসলাম সম্পর্কে জানতে আরও সাহায্য করে। আমি আরবি শিখতে এক আরব ছাত্রের কাছে পড়া শুরু করলাম। আগে থেকেই আমার প্রচুর পড়ার অভ্যাস ছিল।

যদিও আমি আরবদের জীবনযাপনে আকৃষ্ট হয়ে ইসলাম এর প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠেছিলাম, কিন্তু ইসলাম সম্পর্কে যত বেশি পড়ছিলাম, তত আমি মুগ্ধ হচ্ছিলাম। ইউরোপের মানুষদের ধারণা আরব সমাজের যত অনগ্রসরতা বা কুসংস্কার রয়েছে, তার প্রধান কারণ, তারা ইসলামের মতো একটা গোঁড়া ধর্মের অনুসরণ করে। কিন্তু আমি উপলব্ধি করলাম, আরবদের ভালো দিকগুলোর ওপরে বহুদিন ধরে চলে আসা ইসলামের এক ঐতিহ্যময় সংস্কৃতির প্রভাব রয়েছে। ইসলামের নিয়মকানুন মানা তাদের অভ্যাসে পরিণত হয়েছিল। কিন্তু যা কুসংস্কার বা গোঁড়ামি তাদের মধ্যে রয়েছে, তার প্রধান কারণ হচ্ছে, তারা পরবর্তী সময়ে কুরআন সম্পর্কে তাদের গবেষণা অনেক কমিয়ে দিয়েছিল। এর ভেতরের মূল্যবোধ অনুধাবন করা থেকে তারা দিন দিন অনেক দূরে সরে যাচ্ছিল।

গভীরভাবে পড়াশোনা করে আমি যা জানতে পারলাম তা হচ্ছে, ইসলামে গোঁড়ামির কোনো সুযোগ নেই; বরং সবসময় জ্ঞান অর্জনে উৎসাহ দেয়া হয়েছে। ইসলামের প্রথম দিকে অর্থাৎ– প্রথম ৫০০ বছরে মুসলমানেরা জ্ঞান অর্জন এবং গবেষণাকে এক প্রকার ইবাদত হিসেবে দেখত। রাসূল ﷺ ঘোষণা করেছেন, 'জ্ঞানের অনুসন্ধান প্রত্যেক মুসলমান নর-নারীর জন্য পবিত্রতম কর্তব্য।' এ কারণে প্রথম দিকের মুসলমানরা বিশ্বাস করত, জ্ঞান অর্জন ছাড়া ইবাদত কখনোই পরিপূর্ণ হবে না।

'আল্লাহ এমন কোনো রোগ সৃষ্টি করেন না, যার কোনো ওষুধ নেই; রাসূল ﷺ-এর এই উক্তি দ্বারা মুসলমানরা চিকিৎসা সম্পর্কিত গবেষণায় অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। তারা অজ্ঞাত ওষুধের অনুসন্ধানকে ইবাদত হিসেবে দেখা শুরু করে।

'আমি প্রত্যেক প্রাণীকে সৃষ্টি করেছি পানি থেকে; কুরআনের এই বাণী থেকে তারা মানব সৃষ্টি সম্পর্কে গবেষণায় উৎসাহী হয়ে ওঠে। এভাবেই তারা গোড়াপত্তন করে জীব-বিজ্ঞানের।

www.pathagar.com

নক্ষত্রমালা এবং এর গতিবিধি সম্পর্কে কুরআনের যে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, সে বিষয়ে গবেষণা করতে গিয়ে মুসলমানরা জ্যোতির্বিজ্ঞান ও গণিত বিষয়ে আগ্রহী হয়ে ওঠে। অথচ সে সময় অন্য ধর্মের মানুষদের কাছে তা ছিল একটি পূজার বিষয় মাত্র। ইউরোপে মাত্র ষোড়শ শতাব্দীতে কোপার্নিকাস আবিষ্কার করে যে, পৃথিবী নিজ কক্ষ পথে আবর্তন করছে এবং সূর্যের চারিদিকে গ্রহাণুপুঞ্জ ঘুরছে। আর এর জন্য তাকে চার্চের আক্রোশের শিকার হতে হয়। অথচ তার ছয়শ বছর পূর্বেই অর্থাৎ নবম-দশম শতকে মুসলমানরা আবিষ্কার করেছিলেন, পৃথিবী গোলাকার এবং এর একটি নিজস্ব কক্ষপথ রয়েছে। তারা অক্ষরেখা ও দ্রাঘিমা রেখা আবিষ্কার করেন এবং অনেকে দাবি করেছিলেন, পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘুরে। কিন্তু এজন্য তাদেরকে কোনো ধর্মদ্রোহিতার অভিযোগে অভিযুক্ত হতে হয়নি। এভাবেই তারা পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, শরীরতত্ত্বসহ বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার প্রতি আগ্রহী হয়ে ওঠেন।

এ বিষয়ে আসলে তারা নবি ﷺ-এর দেখানো পথই অনুসরণ করেছে। 'কেউ যদি জ্ঞানের অনুসন্ধানে বেরিয়ে পড়েন, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতের রাস্তা সহজ করে দেন। 'নেক মানুষের উপর জ্ঞানীর মর্যাদা এ পরিমাণ, যেমন সকল নক্ষত্রের উপর রয়েছে চাঁদের মর্যাদা'- এই কথাগুলো সে সময় মুসলমানদের গবেষণা ও জ্ঞান অর্জনের চেষ্টা অনেক বাড়িয়ে দেয়।

ইসলামের প্রথম পাঁচশ বছর মুসলমানরা ইসলামের এই সৌন্দর্য অনুভব করেছিলেন। এজন্য তারা জ্ঞান-বিজ্ঞানে অনেক এগিয়ে গিয়েছিলেন। পূর্বে যখন কোনো মহামারি রোগ হতো, তখন ইউরোপের মানুষ তাকে ঈশ্বরের গজব মনে করে হাত গুটিয়ে বসে থাকত। সেখানে মুসলমানরা নবির নির্দেশ অনুসারে ব্যবস্থা নিতেন। নবির নির্দেশ অনুসারে মহামারিতে আক্রান্ত এলাকা ও শহরগুলোকে আলাদা করে ফেলা হতো। অথচ বর্তমানে মুসলমানরা ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞানের অভাবে যেকোনো বিপদকে আল্লাহর গজব বলে হাত গুটিয়ে রাখেন।

এমনকি যখন খ্রিষ্টান এলাকাগুলোতে গোসলকে বিলাসিতা বলে মনে করা হতো, তখন সাধারণ গরিব মুসলমানের ঘরেও একটা করে গোসলখানা থাকত। প্রতিটি মুসলমান নগরীতেই ছিল গোসলের ব্যবস্থা। উদাহরণস্বরূপ, নবম শতকে কর্ডোভাতেই ছিল এরকম তিনশ গোসলখানা। এর পেছনে ছিল ইসলামের একটি নির্দেশ, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ঈমানের অঙ্গ। মুসলমানদের ইবাদতের একটি প্রয়োজনীয় অনুষঙ্গ হচ্ছে অযু আর গোসল।

www.pathagar.com

যতই পড়ছিলাম, ইসলামের সৌন্দর্য আমাকে ততই মুগ্ধ করছিল। পড়া শুরু করে আমি বুঝতে পারি, আমার ভেতরের মনটি যা খুঁজছিল তা এই ইসলামেই আছে। মনে হচ্ছিল আমি যেন আমার কাঙ্খিত পথটি খুঁজে পেয়েছি। ইহুদি ধর্ম, আধুনিক ইউরোপীয় সভ্যতা এবং মার্ক্সবাদে আমি যে শান্তি খুঁজে পাইনি, তা আমি খুঁজে পেলাম ইসলামে। কুরআনের পাতায় পাতায় আমি জীবনের বিভিন্ন সমস্যার সমাধান খুঁজে পেলাম। ইসলামে আত্মা ও বাস্তব জীবনের সমন্বয় আমাকে মুগ্ধ করেছিল।

কিন্তু এত মুগ্ধতা সত্ত্বেও প্রথম দিকে ইসলামের নিয়ম-কানুন, আনুষ্ঠানিকতা পালনের তেমন আগ্রহ পেতাম না। একদিন আমি আমার এক মুসলমান বন্ধুকে জিজ্ঞেস করলাম, 'ইসলামের এত নিয়মকানুন মানার প্রয়োজন কেন? ভালো কাজের উৎসাহ তো অন্তর থেকে আসা উচিত, তাই না?'

বন্ধুটি বলল দেখুন, কিছু মানুষ ছাড়া বেশির ভাগ মানুষই ব্যক্তিস্বার্থ ও কামনা-বাসনার জালে বন্দি। সুতরাং সবাই যদি নিজের অন্তরের ইচ্ছা অনুসারে চলে, তবে বিশৃঙ্খলা দেখা দেবে। আচার-আচরণের কোন পন্থাটি ভালো, কোনটি খারাপ সে বিষয়েও কেউ একমত হতে পারবে না। এখন আপনি বলতে পারেন, কিছু মানুষ তো ধর্মীয় অনুশাসন ছাড়া এমনিতেই ভালো। এজন্য আপনি যদি ঐ গুটিকয়েক মানুষের জন্য সবাইকে নিজের ইচ্ছামতো চলতে দেন, তবে এর ফলাফল কি ভালো হবে?

এরপর আমি ধীরে ধীরে ইসলামের অনুশাসনগুলোর যৌক্তিকতা বুঝতে পারলাম। এভাবেই খণ্ড খণ্ড ঘটনা, কথাবার্তা, বই পড়া, কিংবা পর্যবেক্ষণের মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে আমি ইসলামকে ভালোবাসলাম এবং ইসলামে প্রবেশ করলাম।

১৯২৬ সালে আমি ইউরোপে ফিরে আসি এবং আমার স্ত্রীসহ ইসলাম গ্রহণ করি। আমার মুসলিম নাম রাখি মুহাম্মাদ আসাদ।

এরপর বাস শুরু করি মুসলিম সমাজে। আমার অনেক ইউরোপীয় আত্মীয় এবং বন্ধুরা দেখে অবাক হয় যে, কী করে আমি খুব সহজেই মুসলমানদের সাথে মিশে গিয়েছি। কারণ, তাদের বেশির ভাগ মানুষের ইসলাম সম্পর্কে কোনো জ্ঞান নেই। মুসলমান বলতেই তারা মনে করে এক অনুন্নত, অশিক্ষিত জাতি। আসলে এই জীবনটা কখনোই আমার কাছে কষ্টকর মনে হয়নি। বরং মনে হয়েছে, যে শান্তির খোঁজ আমি এত দিন করেছিলাম, তা আমি ইসলামেই খুঁজে পেয়েছি।

এরপর আমার স্ত্রীকে নিয়ে হজ্জ করতে যাই মক্কার পথে।

এটাই আমি মুহাম্মাদ আসাদের ইসলাম নামক শান্তির পথ খুঁজে পাবার ইতিহাস।

www.pathagar.com

পরিচিতি

মুহাম্মাদ আসাদ ছিলেন একাধারে সাংবাদিক, লেখক, গবেষক, ভাষাবিদ, রাজনৈতিক চিন্তাবিদ, ইসলামিক পণ্ডিত। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী এই মানুষটির জন্ম ১৯০০ সালে এক ইহুদি পরিবারে। ছোটবেলা থেকেই তাকে ইহুদি ধর্ম ও ধর্মীয় গ্রন্থের উপরে দীক্ষা দেয়া হয়। বড় হয়ে তিনি সাংবাদিকতাকে পেশা হিসেবে বেছে নেন। পেশাগত জীবনে তিনি আরব বিশ্ব ভ্রমণ করেন। আরবদের জীবন ও তাদের জীবনে ধর্মের প্রভাব দেখে তিনি মুগ্ধ হন এবং ইসলাম গ্রহণ করেন। তৎকালীন সময়ের সৌদি যুবরাজ ফয়সাল ও বাদশা আব্দুল আজীজের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠে। একটা সময় তিনি সৌদি রাজপরিবারের পক্ষ হয়ে দুতিয়ালির কাজও করেন।

২য় বিশ্বযুদ্ধের সময় আসাদের পিতা-মাতা ইহুদি হবার অপরাধে জার্মান বাহিনীর হাতে নিহত হয়। আসাদ নিজেও লন্ডনে গ্রেফতার হন। তিন বছর কারাভোগের পর তিনি মুক্তি পান। ১৯৪৭ সালের দেশভাগের পর তিনি পাকিস্তান চলে আসেন এবং পাকিস্তানের সংবিধান প্রণয়নসহ সরকারের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন। মুহাম্মাদ আসাদকে ধরা হয় ২০ শতকের অন্যতম প্রভাবশালী মুসলিম ব্যক্তিত্ব হিসেবে।

www.pathagar.com

এক পপস্টারের আত্মকাহিনি

ইউসুফ ইসলাম

আমি এমন একটা পরিবেশে বড় হয়েছি, যেখানে আধুনিক দুনিয়ার বিত্ত-বৈভব বিলাসবহুল সব উপকরণই বিদ্যমান ছিল। আমি একটা খ্রিষ্টান পরিবারে জন্মেছিলাম। যদিও আমরা এখন জানি, সব শিশু প্রাকৃতিক ধর্ম তথা ফিতরাতের উপর জন্ম নেয়। তার মা-বাবাই তাকে তাদের ধর্মে বদলে ফেলে। আমিও একজন খ্রিষ্টান হিসেবে বেড়ে উঠেছিলাম।

আমাকে শেখানো হয়েছিল ঈশ্বর আছেন; তবে তাঁর সাথে সরাসরি সম্পর্ক স্থাপনের কোনো উপায় নেই। আমাদেরকে যিশুখ্রিষ্টের মাধ্যমেই ঈশ্বরের সাথে সম্পর্ক গড়তে হবে। বলা যায় তিনি হলেন ঈশ্বরকে পাবার দরজা। আমি কমবেশি এই ধারণাকে মেনে নিয়েছিলাম। যদিও পুরোপুরি হজম করতে পারিনি।

আমি যিশুখ্রিষ্টের কিছু ভাস্কর্য খেয়াল করে দেখতাম। সেগুলো ছিল শুধুই পাথর। তাতে কোনো প্রাণের চিহ্ন ছিল না। যখন তারা বলত ঈশ্বর হলেন তিনজন, তখন আমি কিছুটা ধাঁধাঁয় পড়ে যেতাম। যদিও তা নিয়ে তর্ক করতে পারতাম না। সেই বয়সের একজন কিশোর যা করে, ঠিক তেমনি আমিও আমার বাবা-মায়ের বিশ্বাসের উপরে বিশ্বাস রেখেছিলাম।

বয়স হবার সাথে সাথে আমার ধর্মীয় অনুভূতি আস্তে আস্তে কমে এল। আমি গান গাওয়া শুরু করি। আমার অনেক স্বপ্ন ছিল, আমি একদিন অনেক বড় গায়ক হব। সিনেমা আর প্রচার মাধ্যমের চাকচিক্য আমাকে দারুণভাবে টানত। আমি ভাবতাম, আমাকে অনেক অনেক সম্পদ গড়তে হবে। হতে হবে অনেক টাকার মালিক। টাকাকেই ভাবতাম নিজের ঈশ্বর। কারণ, টাকা থাকলে যা খুশি তাই কেনা যায়, যেমন খুশি তেমন চলতে পারা যায়।

www.pathagar.com

আমার এক চাচার খুব সুন্দর একটা গাড়ি ছিল। আমি সে গাড়ি তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতাম আর ভাবতাম, চাচার অনেক টাকা আছে বলেই তো তিনি এত চমৎকার গাড়িটা কিনতে পেরেছেন। তাই টাকা উপার্জনের কোনো বিকল্প নেই। যে করেই হোক আমাকেও টাকা রোজগার করতে হবে।

আমার আশেপাশের মানুষগুলোও এভাবেই ভাবত। তারাই আমাকে এমন করে ভাবতে প্রেরণা যোগাত, উৎসাহ দিত। এই দুনিয়াটাই ছিল তাদের উপাস্য, তাদের খোদা।

আমি সিদ্ধান্তে পৌঁছলাম, দারুণ একটা জীবন গড়তে সম্পদের বিকল্প নেই। আমার আদর্শ ছিল বিখ্যাত পপ গায়কেরা। আমি গানের জগতে দারুণভাবে বিভোর হয়ে গেলাম। মনের গভীরে একটা ইচ্ছা ছিল, যদি কখনো আমার অঢেল টাকা হয়, আমি অভাবী মানুষের জন্য কিছু একটা করব। কিন্তু মানুষ কি সে ইচ্ছে সবসময় ধরে রাখতে পারে? (কুরআনে বলা হয়েছে, মানুষ অনেক কিছু করার ওয়াদা করে, কিন্তু যখন তার সামর্থ্য হয়, তখন সে পিছিয়ে যায় আর লোভী হয়ে পড়ে)

সময়ের ব্যবধানে আমি খুব বিখ্যাত হয়ে গেলাম। তখন মাত্রই সদ্য কৈশোর পেরুনো তরুণ। আমার নাম আর ছবি বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা এবং টিভিতে প্রচার হতে লাগল। এ জীবন ছিল আমার চাওয়া-পাওয়ার চেয়েও অনেক বেশি। তাই জীবনকে আরও উপভোগ করতে আমি মদ-মাদকের উন্মাতাল দুনিয়ায় ডুবে গেলাম।

এক বছরের বিপুল যশ, খ্যাতি, সাফল্য আর উন্নত জীবনযাত্রার পর আমি অসুস্থ হয়ে গেলাম। আমার যক্ষ্মা ধরা পড়ল। আমাকে ভর্তি হতে হলো হাসপাতালে।

এই সময়ে জীবন নিয়ে আমি নতুন করে ভাবতে শুরু করলাম। 'আমার কী হবে? আমি কি শুধুই দেহ সর্বস্ব একজন? আমার জীবনের লক্ষ্য কি শুধুই ভোগ করে যাওয়া, এই দেহের সুখ খুঁজে যাওয়া? কেন আমি এখানে? কেন আজ আমি এই হাসপাতালের বেডে এভাবে পড়ে আছি?'

এভাবে জীবন সম্পর্কে আমি নতুন করে ভাবতে শুরু করি।

এখন বুঝতে পারি, সেই অসুস্থতা ছিল আমার জন্য আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে রহমত। আল্লাহ এর মাধ্যমে আমার অন্তর্চক্ষু খুলে দিয়েছিলেন।

সে সময় প্রাচ্যের সুফিবাদি দর্শনের প্রতি আমার অনুরাগ জন্মেছিল। আমি এ নিয়ে গভীর অধ্যয়ন শুরু করলাম। প্রথমে যে জিনিসটি জানলাম, তা হলো–

www.pathagar.com

মানুষের মৃত্যু হয় কিন্তু আত্মার মৃত্যু নেই। এটা সচল থাকে। আমার মনে হচ্ছিল প্রশান্তির এক নতুন রাস্তা ধরে চলা শুরু করেছি। আমি ধ্যান করা শুরু করি। এমনকি নিরামিষভোজী হয়ে যাই। অনুভব করতে শুরু করি, আমার দেহটাই সব নয়।

একদিন বাইরে হাঁটার সময় দারুণ বৃষ্টি নামল। আমি কোথাও আশ্রয় নেয়ার জন্য দৌড়ে গেলাম। হঠাৎ-ই মনে হলো 'আচ্ছা, এই যে আমার শরীর বৃষ্টিতে ভিজছে। এই শরীরই তো আমাকে বলছে আমি যেন কোনো নিরাপদ আশ্রয়ে যাই। যাতে বৃষ্টিতে ভেজা থেকে শরীরটা রক্ষা পায়।'

আমার মনে হলো, আমাদের শরীর আসলে ভারবাহী গাধার মতো। গাধাকে যদি সঠিক দিকে না চালাই, তবে গাধাই আমাদেরকে তার নিজের পছন্দের দিকে নিয়ে যাবে।

তখন অনুভব করলাম ঈশ্বর প্রদত্ত আমার নিজস্ব একটা ইচ্ছা শক্তি আছে; যা ঈশ্বরের ইচ্ছাকে অনুসরণ করে থাকে। প্রাচ্যের ধর্মমতের বিভিন্ন চিন্তাধারা আমাকে দারুণভাবে আকৃষ্ট করত। তত দিনে খ্রিষ্ট ধর্মের উপর আমার বিরক্তি চলে এসেছিল।

আমি আবারও গান করা শুরু করলাম। এবার গানে আমার নিজস্ব চিন্তা দর্শন প্রতিফলিত হচ্ছিল। আমার একটা গানের কথা ছিল এরূপ 'যদি আমি জানতাম/কী দিয়ে তৈরি হয় স্বর্গ, কী দিয়ে হয় নরক/আমি কী এই আমাকে চিনি, যে শুয়ে আছে বিছানায় কিংবা ধুলোমলিন কক্ষে/যখন অন্যরা শুয়ে আছে বিরাট হোটেলে?' আমি আরেকটা গান লিখেছিলাম 'স্রষ্টাকে খুঁজে পাবার পথ'।

গানের জগতে আগের চেয়েও বিখ্যাত হয়ে গেলাম। ঐ সময়টা ছিল আমার জন্য খুব জটিল। একদিকে আমার নাম-যশ-খ্যাতি, অর্থ-বিত্ত বাড়ছিল, অন্যদিকে আমি সত্যকে খুঁজে ফিরছিলাম।

একটা সময় আমি অনুভব করলাম, বৌদ্ধ ধর্মটাই সঠিক। কিন্তু এই দুনিয়ার আরাম-আয়েশ ত্যাগ করতে প্রস্তুত ছিলাম না। এই দুনিয়ার সাথে এত বেশি জড়িয়ে পড়েছিলাম, সব ছেঁড়ে-ছুঁড়ে দিয়ে নির্জনবাসী সন্ন্যাসী হওয়া আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না।

জেন চিং, সংখ্যাতত্ত্ব, জ্যোর্তিষশাস্ত্র ইত্যাদি নিয়েও পড়াশোনা করেছিলাম। আমি বাইবেলে আবারও ফিরে যেতে চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু মনমতো কিছু পাইনি। এ সময়ে ইসলাম সম্পর্কে আমার কোনো ধারণা ছিল না। ঠিক তখনই এক অলৌকিক ঘটনা ঘটল।

www.pathagar.com

আমার ভাই জেরুজালেমের এক মসজিদে গিয়েছিলেন। সেখানকার শান্তিপূর্ণ প্রশান্তিময় পরিবেশ তাকে দারুণভাবে মুগ্ধ করেছিল। তার মনে হয়েছিল মসজিদে গেলে এত প্রশান্ত অনুভূতি হয়, যে অনুভূতি চার্চ কিংবা সিনাগগে' গেলেও হয় না।

লন্ডনে আসার সময় তিনি সাথে করে কুরআনের একটা কপি নিয়ে আসলেন। আমাকে তা পড়তে দিলেন। তিনি তখনো মুসলমান হননি। কিন্তু তার কাছে এই ধর্ম আকর্ষণীয় মনে হলো। তিনি ভাবলেন, আমিও হয়তো এর মধ্যে শান্তি খুঁজে পাব।

এই বইটা যখন পড়া শুরু করি, আমি তখন অনুভব করতে থাকি এটি আমাকে সঠিক পথ দেখাচ্ছে। বলে দিচ্ছে কে আমি, কী আমার পরিচয়, এই জীবনের উদ্দেশ্য কী। বলে দিচ্ছে, আমি কোথা থেকে এসেছি আর কোথায় যাব। আমি হৃদয় দিয়ে বুঝতে পারছিলাম এটাই সঠিক ধর্ম।

এটা না এমন কোনো ধর্ম, যা পশ্চিমারা ধর্ম বলতে বুঝে থাকে। আর না এমন ধর্ম, যা কেবলমাত্র বৃদ্ধ বয়সেই পালনীয়। পাশ্চাত্যের লোকেরা মনে করে, যারা সিরিয়াসলি কোনো ধর্ম মানে এবং সেটাকেই জীবনের লক্ষ্য উদ্দেশ্য বানায়, সে আসলে একটা বুদ্ধু, একটা পাগল।

আমি কোনো বুদ্ধু ছিলাম না। শুরুর দিকে আমি শরীর ও আত্মার সম্পর্ক নিয়ে দ্বন্দ্বে ছিলাম। এখন আমি বুঝতে পারলাম শরীর ও আত্মা কোনো আলাদা জিনিস নয়। ধার্মিক হতে গেলে আপনাকে পাহাড়ে যেতে হবে না। এই দুনিয়ায় থেকে দুনিয়ার জীবনে স্রষ্টার বিধি-নিষেধ মেনে চলাই যথেষ্ট। বুঝতে পারলাম আল্লাহই সবকিছুর মালিক। তিনি তন্দ্রাচ্ছন্ন হন না। তিনিই সবকিছু সৃষ্টি করেছেন।

এই পর্যায়ে ব্যক্তিগত অহংকার ত্যাগ করা শুরু করি। আগে ভাবতাম, নাম-যশ-খ্যাতি সব আমারই উপার্জন। কিন্তু সত্যিকারার্থে আমার নিজের সৃষ্টির পেছনেই তো আমার কোনো হাত নেই, নেই কৃতিত্ব।

আমাকে সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য হলো আমার ইচ্ছাশক্তিকে আল্লাহর দিকে সমর্পণ করা; যার আরেক নাম ইসলাম। এই পর্যায়ে আমি বিশ্বাসকে আবিষ্কার করি। অনুভব করতে পারছিলাম, আমি একজন মুসলিম।

কুরআন পড়ে জানতে পারি, সব নবির ধর্মই ছিল এক। তাহলে খ্রিষ্টান এবং ইহুদিদের মাঝে এত তফাত কেন? আমি জানতাম কীভাবে ইহুদিরা যিশুকে অস্বীকার করল, তার বাণীকে পাল্টে দিল। এমনকি খ্রিষ্টানরাও আল্লাহর বাণীর ভুল অর্থ করেছিল। তারা যিশুকে বলে আল্লাহর পুত্র।

www.pathagar.com

কুরআনের সবকিছুই যুক্তিসঙ্গত। এটাই কুরআনের সৌন্দর্য। কুরআন মানুষকে বলে গভীরভাবে ভাবতে, চন্দ্র সূর্য নয় বরং সবকিছুর যিনি স্রষ্টা, কেবল তারই ইবাদত করতে।

আমি যখন কুরআনের আরও গভীরে যাই, দেখি কুরআন নামাযের কথা বলে। বলে দান, দয়া ও সদাচরণের কথা। আমি তখনো মুসলিম হইনি। কিন্তু আমি অনুভব করতে পারছিলাম, কুরআনই হলো আমার সব জিজ্ঞাসার জবাব। স্রষ্টা আমার জন্যই এটা পাঠিয়েছেন।

এ পর্যায়ে আমি আমার মুসলিম ভাইদের সাথে দেখা করার প্রয়োজন অনুভব করলাম।

আমার ভাইয়ের মতোই আমি জেরুজালেম গেলাম। সেখানে এক মসজিদে গিয়ে হাজির হলাম একদিন।

এক ভাই এসে আমার পরিচয় জানতে চাইলেন। আমি নিজেকে একজন মুসলিম হিসেবে পরিচয় দিলাম। যখন নাম বললাম 'স্টিভেন্স', তিনি কিছুটা ধাঁধাঁয় পড়ে গেলেন। সবার সাথে একত্রে নামায পড়লাম, যদিও আমার নামায পড়ার তরিকা পুরোপুরি শুদ্ধ ছিল না।

লন্ডনে ফিরে নাফিসা নামে এক বোনের সাথে আমার দেখা হলো। তাকে জানালাম যে, আমি ইসলাম গ্রহণ করতে চাই। তিনি আমাকে নিউ রিজেন্ট মসজিদে যেতে বললেন।

বুঝতে পারছিলাম অহংকার, ইবলিসের প্ররোচণা থেকে মুক্ত হয়ে আমার অবশ্যই একমুখী হওয়া উচিত। ১৯৭৭ সালের এক শুক্রবারে জুমআর নামাযের পর আমি সম্মানিত ইমামের হাতে হাত রেখে কালেমা শাহাদাহ পড়লাম। প্রশান্ত হৃদয়ে উচ্চারণ করলাম- 'আশহাদু আন লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ, ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ।' এটা ছিল কুরআন হাতে পাওয়ার দেড় বছর পরের ঘটনা।

এত দিন আমার সামনে সেসব লোকেরাই ছিল আদর্শ, যাদের অনেক নাম-যশ-খ্যাতি ছিল। ছিল অর্থবিত্ত। কিন্তু আমি হিদায়াত থেকে বারবার পালিয়ে বেড়াচ্ছিলাম– যতক্ষণ না আমার হাতে পবিত্র কুরআনের কপি আসে। এখন আমি সরাসরি আল্লাহর সাথে যোগাযোগ স্থাপন করতে পারি, যা খ্রিষ্টান কিংবা অন্য কোনো ধর্মে হয় না।

এক হিন্দু মহিলা আমাকে বলেছিলেন, 'তুমি হিন্দুদের বুঝতে পারনি। আমরা এক ঈশ্বরেই বিশ্বাস করি। আমরা এই সব জিনিস (মূর্তি) কেবল আমাদের

www.pathagar.com

মনোযোগের জন্যই ব্যবহার করি।' তিনি আসলে যা বুঝাচ্ছিলেন, তা হলো ঈশ্বরের কাছে পৌঁছাতে চাইলে তার সাথে কোনো কিছুকে অংশীদার করা প্রয়োজন, যেমন : মূর্তি। কিন্তু ইসলাম এই সমস্ত বাধা দূর করে।

কাফির ও মুমিনকে যে বিষয়টা আলাদা করে, তা হলো সালাত। সালাত আল্লাহর সাথে বান্দার সরাসরি সম্পর্ক তৈরি করে। এর মাধ্যমেই শরীর মন-আত্মা বিশুদ্ধ হয়।

সব শেষে আমি বলতে চাই, আমি এখন যা করি সবই আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য। আমি দোয়া করি, আপনারাও যেন আমার এই পরিবর্তনের ঘটনা থেকে পথ নির্দেশ পেতে পারেন।

ইসলাম গ্রহণের আগে আমার কোনো মুসলিমকে জানার সুযোগ হয়নি। আমি প্রথমে কুরআন পড়ি এবং বুঝতে পারি, কোনো মানুষই পাপমুক্ত নিখুঁত নয়। ইসলামই একমাত্র নিখুঁত ও বিশুদ্ধ।

আর আমরা যদি পরিপূর্ণভাবে নবি ﷺ-এর অনুসরণ করতে পারি, তাহলেই আমরা জীবনে সফল হতে পারব।

আল্লাহ আমাদেরকে নবি ﷺ-এর আদর্শ অনুসরণ করার তাওফিক দিন। আমিন।

পরিচিতি

ইউসুফ ইসলামের পূর্ব নাম Cat Stevens। তিনি ছিলেন বিশ্ব সঙ্গীতের এক বিখ্যাত নাম। তার অসংখ্য গান ইউরোপ, অস্ট্রেলিয়া, আমেরিকার টপ চার্টে স্থান করে নিয়েছিল। কিছু গান একাধিক সপ্তাহ জুড়ে ছিল টপ চার্টের শীর্ষে ।

নাম-যশ-খ্যাতির শীর্ষে থাকা অবস্থায় তিনি প্রচণ্ড হতাশা ও অবসাদে ডুবে যান। শান্তির খোঁজে নানা ধর্মমত ও মতবাদ নিয়ে পড়াশুনা করেন। ১৯৭৭ সালে এসে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন।

৬৯ বছর বয়সী ইউসুফের জন্ম ইংল্যান্ডের লন্ডনে। তিনি বর্তমানে সেখানেই বসবাস করছেন।

www.pathagar.com

MTV থেকে মক্কা

ক্রিস্টিন বেকার

ডানা মেলা প্রজাপতি

জার্মানির হামবুর্গ শহর।

এই শহরের এক বাড়িতে আমার জন্ম। আমাদের বাড়িটা ছিল সবুজে ঘেরা। সামনে বিশাল উঠোন। তার এক পাশ দিয়ে শান্ত নিরিবিলি এক রাস্তা। আমি আমার রুমের বারান্দায় দাঁড়িয়ে রাতের খোলা আকাশ দেখতাম। রাতের আকাশে তারাগুলো ঝিকমিক করত।

কল্পনায় আমার এক খেলার সাথি ছিল। দেখতে অনেকটা শিম্পাঞ্জির মতো। তার নাম ডিডি। কল্পনায় তার সাথে আমার অনেক কথা হতো। দুজন একসাথে কত যে সময় কাটাতাম! আমার ছোট বোনটার জন্মের পর একদিন ডিডি অনেক দূরে হারিয়ে গেল। আর খুঁজেই পেলাম না। ডিডির জায়গা দখল করল ছোট বোন 'সুসান'।

বোনটা আমার চেয়ে চার বছরের ছোট। দুজন একসাথে অনেক সময় কাটাতাম। কত গল্প, আলোচনা, খেলা। ঠিক যেন দুই বান্ধবী। অবশ্য ওর সাথে আমার চরিত্রের মিল ছিল খুব কমই। আমি ছিলাম চঞ্চল টাইপের। যেখানেই যেতাম ছোট-খাটো একটা হুলস্থুল বাঁধিয়ে ফেলতাম। সে তুলনায় সুসান ছিল শান্ত সুবোধ লক্ষ্মী টাইপ একটা মেয়ে।

সাগরের ধারে আমাদের একটা ফ্ল্যাট কেনা ছিল। সময়ে সময়ে আমরা সেখানে ছুটি কাটাতে যেতাম। আমাদের ফ্ল্যাটটা ছিল ২০ তলায়। নিজের রুমে বসে নীল সাগরের সাথে নীল আকাশের মাখামাখি কী চমৎকারই না দেখা যেত।

www.pathagar.com

কখনো সাগরের পাড় ঘেঁষে হাঁটতাম। একদিকে সাগরের ঢেউ মুহুর্মুহু গর্জন তুলে আছড়ে পড়ছে তীরে। অন্যদিকে, বিশুদ্ধ নির্মল বাতাস শরীর ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছে। কখনো সূর্যের মিষ্টি রোদে শুয়ে দেখতাম, আকাশ কী করে দিগন্তে নীল সাগরের সাথে গিয়ে মিশেছে।

আমার শৈশব ছিল মমতা আর আদর মাখানো। আমরা দুবোন আমাদের বাবা-মায়ের কাছ থেকে সবই পেয়েছিলাম। আমার মায়ের মনটা ছিল বিশাল। আশেপাশের সবাই মায়ের খুব প্রশংসা করতেন। তিনি যেখানেই যেতেন, আনন্দ যেন তার সব ডালি খুলে হাজির হতো। আমাদের জন্মের পর মা তার চাকরি ছেড়ে দিয়েছিলেন। ঘরের কাজ, রান্না-বান্না, হাতে তৈরি জিনিস...মা আমাদের জন্য সবই করতেন।

বাবা ছিলেন লম্বা ও সুদর্শন একজন মানুষ। ঘুরে বেড়ানো, এডভেঞ্চার, মঞ্চ নাটক...বাবা খুব পছন্দ করতেন। তার বন্ধু-বান্ধবের সংখ্যা ছিল অনেক। কিন্তু মানুষ হিসেবে বাবা খুব পরিশ্রমীও ছিলেন। আমাদের একটা পুরোনো টেক্সটাইল ব্যবসা ছিল। বাবা তাতে সময় দিতেন।

সবকিছুর মধ্যে ইতিবাচক দিক খুঁজে বের করা, সব পরিস্থিতিতে নিজেকে মানিয়ে নেয়া; এই গুণগুলো আমি পারিবারিক ভাবেই পেয়েছিলাম। মা-বাবা আমার মনের মধ্যে আস্থা, বিশ্বাস, শক্তি-সাহস আর স্বাধীন মনোভাবের বীজ রোপণ করে দিয়েছিলেন। তারা শিখিয়েছিলেন নিজের শক্তি, সাহস, সদিচ্ছা আর প্রচেষ্টা থাকলে যেকোনো কিছুই অর্জন করা সম্ভব।

যখন কৈশোর ছেড়ে তারুণ্যে পা রাখি, তখন বাবা-মায়ের শেখানো অনেক বিধি-নিষেধই আমার ভালো লাগত না। নিজের মতো করে একটা জীবন গড়তে চাইতাম। শুধু মনে হতো, জীবনে এত বাধা-নিষেধ কেন থাকবে। অনেক কিছু নিয়েই বাবা-মায়ের সাথে তর্ক হতো। কখনো জিততাম, কখনো হারতাম।

১৬ বছর বয়সে আমি চাইলাম একটা স্কুটার কিনতে। মনে হতো, একটা স্কুটার থাকলে কত্ত সুবিধে। স্কুলে যাওয়া আসা করা যাবে। আবার স্কুল শেষে ঘুরতেও বেরিয়ে যাওয়া যাবে। স্কুটার থাকার একশো একটি কারণ সম্বলিত এক বিরাট চিঠিও লিখেছিলাম। অনেক তর্ক-বিতর্ক হলো, কিন্তু লাভের লাভ কিছুই হয়নি। তারা তাদের সিদ্ধান্তেই অনড় থাকলেন। আমার স্কুটার পাওয়া হলো না।

সে বয়সের আরেক নিয়ম ছিল, সন্ধ্যা হলেই বাড়ি ফিরতে হবে। বিশেষ কোনো কারণ থাকলে সর্বোচ্চ রাত দশটা। আমার বন্ধুরা অনায়াসেই মাঝরাতের পর বাড়ি ফিরে।

www.pathagar.com

অথচ আমি? এ নিয়েও তাদের সাথে বচসা হতো। বাইরে যাওয়া কিংবা পার্টিতে যাওয়া পছন্দ করলেও পড়ালেখায় আমার রেজাল্ট ভালো ছিল ।

আমাদের পরিবারে ধর্মের বিশেষ কোনো ভূমিকা ছিল না। আমার মা-বাবা ঈশ্বরে বিশ্বাস করতেন। মাঝে মাঝে আমাদের চার্চেও নিয়ে যেতেন। এর বাইরে ধর্ম পালন করতে তেমন একটা দেখিনি। বাসার বুক সেলফে আর দশটা বইয়ের ফাঁকে এক খন্ড বাইবেলও ছিল।

ধর্ম ক্লাসে যিশুর জীবন সম্পর্কে শিক্ষা দেয়া হতো। বাইবেলের অন্যান্য নবি নুহ, মুসা এদের সম্পর্কেও কিছু কিছু জানতে পারি। কিন্তু ধর্ম আমায় কখনোই খুব একটা টানেনি। আমার এক ঘনিষ্ঠ বান্ধবী ছিল ক্লডিয়া। বিরক্তি কাটাতে দুজন মিলে ধর্ম ক্লাসের পেছনে বসে জামা বুনতাম।

আমি ছিলাম এডভেঞ্চার প্রিয়। নতুন নতুন পরিবেশ, নতুন নতুন অভিজ্ঞতা আমাকে খুব টানত। সে সময় শিক্ষা বিনিময় প্রোগ্রামের আওতায় এক দেশের ছাত্র-ছাত্রীরা অন্য দেশে গিয়ে কিছুদিন পড়ার সুযোগ পেত। আমি তখন খুব করে আমেরিকায় গিয়ে ইংরেজি ভাষার উপরে এক বছর পড়তে চাইছিলাম। স্কুলের আবেদন ফরমে আমি এও উল্লেখ করেছিলাম, আমি সাগর আর প্রকৃতি খুব ভালোবাসি। আশা ছিল হয়তো আমাকে ক্যালিফোর্নিয়াতে পাঠানো হবে। শেষ পর্যন্ত ঠাঁই মিলল প্রশান্ত মহাসাগরের তীরের এক শহর পোর্টল্যান্ডে। এটি আমেরিকার অন্যতম প্রদেশ অরেগনে অবস্থিত।

আমি যে পরিবারের সাথে থাকতাম, সে পরিবারের সদস্য সংখ্যা তিনজন। পরিবার প্রধান ছিলেন স্কুল শিক্ষক। ইতিহাস আর দর্শনে তার বিশেষ আগ্রহ ছিল। ঠোঁটে সব সময় পাইপ গুজে রাখতেন। স্কুল শিক্ষিকা স্ত্রী আর ছোট মেয়ে জুডিথ, এই নিয়ে তার সংসার। এ পরিবারে আমি অনেকটা নিজের পরিবারের মতো করেই ছিলাম।

বছর শেষ হবার আগেই আমি একটা বিপদে পড়ি। একবার নাইটক্লাবে আমাদের এক পার্টিতে পুলিশ হানা দেয়। হাতকড়া পরিয়ে আমিসহ আমার অন্যান্য বন্ধু-বান্ধবীদের থানায় ধরে নিয়ে যায়। আমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ, আমরা সবাই অপ্রাপ্ত বয়স্ক।

বাপরে বাপ, জেলখানার যা পরিবেশ! কোনো কয়েদী তার মা-বাবাকে খুন করে এসেছেন, কেউ আবার মাদক ব্যবসার সাথে জড়িত। সত্যি বলছি, এই সব মানুষদের সাথে থাকা, এই নতুন এডভেঞ্চার আমার একটুও ভালো লাগেনি।

আমার পালক বাবা, স্কুল শিক্ষক পাইপ টানা ভদ্রলোক আমাকে ছাড়িয়ে আনেন। আমি মনে মনে খুব বিব্রতবোধ করছিলাম। তিনি আমাকে একটি কথাও বলেননি।

www.pathagar.com

এই পরিবারের সাথে কাটানো সময়গুলো আমার আসলেই দারুণ কেটেছিল। আমি আর জুডিথ মিলে অনেক মজা করতাম। আমি তাদের কাছ থেকে অনেক কিছু শিখেছিলাম। স্কুলে আমার ফলাফলও ভালো হচ্ছিল। ছয় মাসেই এত চমৎকার ইংরেজি বলতে পারতাম, কেউ বুঝতে পারত না আমি জার্মান।

সে সময় ধর্ম নিয়ে আমার কিছু বিচিত্র অভিজ্ঞতা হয়েছিল। অরেগনের এক পাহাড়ে এক 'ভগবান' এর আশ্রম ছিল। আমার এক বান্ধবীর সাথে একদিন সেখানে গেলাম। গিয়ে দেখি, উপস্থিত সবাই লাল কিংবা কমলা রঙয়ের কাপড় পরেছেন। মহিলাদের কারও পরনে একই রঙয়ের বিকিনি, কারও পরনে শাড়ি। সমলিঙ্গের বেশ কিছু জুটিকেও দেখলাম। এক সুদর্শনা সুন্দরী মহিলার সাথে আমার কথা হলো। তিনি বললেন, তিনি একটা বিজ্ঞাপনী সংস্থাতে কাজ করেন। একসময় নিজের জীবন নিয়ে তিনি বেশ হতাশাগ্রস্ত ছিলেন। এই আশ্রমে আসার পর থেকে তার সে সমস্যা দূর হয়েছে। শুধু তিনি একাই নন, অনেক নামকরা ব্যবসায়ী, শিল্পপতি, মিডিয়া জগতের মানুষও মানসিক শান্তির জন্য এখানে আসেন। সবাই মিলে শ্রদ্ধাবোধ ও ভালোবাসা থেকে সেই 'ভগবান' কে অনেক টাকা পয়সাও দেন।

দুপুরে খাবারের আয়োজন ছিল নিরামিষ। আমি আর আমার বান্ধবী পেট-পুরে তৃপ্তি সহকারে খেলাম। সেই 'ভগবানের' শিক্ষা সম্পর্কিত একটা বইও কিনলাম। দু-এক পৃষ্ঠা উল্টে-পাল্টে রেখে দিতে হলো। আমার ভালো লাগেনি। যৌনতা নিয়ে অনেক খোলামেলা কথাবার্তা আছে। এর মাধ্যমে নাকি আধ্যাত্মিক আলোক লাভ হয়।

বিকেল বেলা ভক্ত পরিবেষ্টিত হয়ে সে 'ভগবান' আমাদের সামনে দিয়ে গেলেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত দামি গাড়ি 'রোলস রয়েসে' বসা। তার হাতে 'রোলেক্স' ব্যান্ডের দামি ঘড়ি। আমার মনে হলো, একজন আধ্যাত্মিক নেতার এত টাকা পয়সা হয় কী করে। বিশেষ করে এত এত দামি জিনিসের পেছনে টাকা খরচ না করে, সে টাকা দরিদ্রদের জন্য খরচ করলে ভালো হতো না!

আমেরিকায় আমার জীবন দারুণ কাটছিল। ডানা মেলা উড়ন্ত স্বাধীন জীবন। বিভিন্ন পার্টিতে যেতাম, হই-হুল্লোড় করতাম। সেই সব পার্টিতে বিয়ার খাবার ধুম পড়ত। প্রতিযোগিতা হতো, কে কয় পেগ হজম করতে পারে। আমি অবশ্য খুব একটা খেতে পারতাম না।

একসময় আমেরিকায় আমার পড়াশোনার জীবন শেষ হয়ে এল। বাড়ি ফিরে যেতে ইচ্ছে করছিল না। বাড়ি গেলেই তো আবার সেই বিধি-নিষেধ, আবার সেই বাচ্চাদের মতো জীবনযাপন! এত দিনে আমি স্বাধীন ও নতুন জীবনে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি। তবুও হামবুর্গে ফিরতে হলো। ক্লাব-পার্টিতে যাতায়াত করতে থাকলাম।

www.pathagar.com

আমি তো আর ছোটটি নেই। সতেরো হলো আমার! আমি আর আমার বান্ধবী নোরা ব্রিজিত হামবুর্গের নামকরা সব ক্লাবে যেতাম। রাতভর উন্মাতাল নাচ আর গানে মত্ত থাকতাম।

একদিন আমি বাড়ি ফিরছিলাম। এক লোক আমার পথ রোধ করে দাঁড়াল। নিজেকে পরিচয় দিল একজন ফটোগ্রাফার হিসেবে। সে আমাকে বলল, কোনো এক পত্রিকায় নাকি সে কাজ করে। পত্রিকার উদ্যোগে একটা 'মডেলিং' প্রতিযোগিতা চলছে। তাই আমি অনুমতি দিলে আমার ছবি তুলতে চায়। বুঝতে পারছিলাম না এই লোককে বিশ্বাস করা উচিত কিনা। সে আমাকে তার 'আইডি কার্ড' দেখাল। এমনকি আমার বাবা-মাকেও ফোন করে বলল। শেষে ছবি তুলতে রাজি হলাম।

একটা লেকের ধারে আমার ছবি তোলা হলো। টি-শার্ট আর কালো-চামড়ার স্কার্ট পরে ছবির জন্য 'পোজ' দিলাম। মুখে কোনো প্রসাধনী ছিল না। আমাকে অবাক করে দিয়ে সেই পত্রিকা আমাকে 'হামবুর্গের সেরা সুন্দরী' নির্বাচন করল। দিন কয়েক পরে এক মডেলিং এজেন্সি আমার সাথে যোগাযোগ করল। তারা আমার কিছু টেস্ট নিল। আমাকে বিভিন্ন 'মুডে' দাঁড়াতে বলা হলো। এমন অনেক আবেদনময়ী ভঙ্গিমায় ছবির জন্য 'পোজ' দিতে হলো, যেগুলো আমার ভালো লাগেনি। আমি বুঝতে পেরেছিলাম 'মডেলিং' আমার জন্য নয়।

মজার বিষয় হলো, আমি এক সুন্দরী প্রতিযোগিতায় জিতে গেলাম। পুরস্কার হিসেবে পেলাম সানফ্রানসিসকো আর মাওইতে ফাইভ স্টার হোটেল, প্লেন ভ্রমণ আর দুই দিনের জন্য সার্বক্ষণিক গাড়ি। আমি মনে মনে বেশ রোমাঞ্চ অনুভব করছিলাম। মা ব্যাপারটা একদমই পছন্দ করলেন না। তিনি ভাবছিলেন, এসবই পত্রিকাওয়ালাদের বাড়াবাড়ি। মেয়ের বয়স এখনো আঠারোই হয়নি, এখনই গাড়ি দিচ্ছে সাথে। তিনি ঠেকানোর চেষ্টাও করেছিলেন। লাভ হয়নি।

আমার বান্ধবী ব্রিজিতকে সাথে নিয়ে সময়টা দুর্দান্ত কেটেছিল। মা-বাবা বেশ দুশ্চিন্তায় ছিল। এর মধ্যেই ১১ বার ট্রাফিক আইন ভঙ্গ করেছি, তার জরিমানা চেয়ে আমেরিকান পুলিশ ডিপার্টমেন্ট থেকে তারা চিঠি পেলেন।।

এই সময় ক্যারিয়ার নিয়ে আমি চিন্তিত হয়ে পড়লাম। দু-একটা মডেলিং এজেন্সির সাথে কাজ করার চেষ্টাও করেছিলাম। তারা নারীদেরকে যে ভঙ্গিমায় উপস্থাপনার চেষ্টা করে, সে ধরন আমার ভালো লাগেনি। তাই মডেলিং করার চিন্তার সেখানেই ইতি। কিছু দিন পরে 'রেডিও হামবুর্গ' এ একটা চাকরির বিজ্ঞাপন চোখে পড়ে। দুবছরের জন্য শিক্ষানবিশ প্রতিবেদক নিয়োগ দেয়া হবে। আমি নিজেকে কল্পনায় দেখতাম, মাইক্রোফোন হাতে বিখ্যাত সব ব্যক্তিদের সাক্ষাৎকার নিচ্ছি।

www.pathagar.com

সত্য খুঁজে পেতে ছুটে বেড়াচ্ছি, নানা সামাজিক, রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে কথা বলছি। ভাবতেই রোমাঞ্চ অনুভব করছিলাম। আমি চাকরিটার জন্য আবেদন করি আর পেয়েও যাই।

হামবুর্গ রেডিওর সব বিভাগেই আমি কাজ করি। রাজনীতি, শিল্প-সাহিত্য, শিক্ষা, গান...সব। আস্তে আস্তে অফিসে আমার পরিচিতি বাড়তে থাকে। আমার 'বস' যিনি ছিলেন, তিনি আমাকে বাইরেও বিভিন্ন রিপোর্টিং-এর কাজে পাঠাতে থাকেন। আমি সে সময় বেশ কয়েকজন নামকরা বিখ্যাত ব্যক্তি, গায়ক, গায়িকার সাক্ষাৎকার নিই। তাদের অনুষ্ঠান কাভার করি। দিনে দিনে আমার আত্মবিশ্বাস বাড়তে থাকে।

যদিও সময়টা আমার ভালোই কাটছিল, কিন্তু ছোট শহরের এক কোণে নিজেকে আটকে রাখতে মন চাইছিল না। আমার মন চাইছিল আগের মতো আবার বড় পরিসরে যাই, পৃথিবীব্যাপী ঘুরে বেড়াই। ইতোমধ্যে আমি দু-দুবার লন্ডন ঘুরে আসি। মনে হচ্ছিল, সেখানে কিছু একটা করতে পারলে মন্দ হতো না।

আমার মনে আছে, আমি আর ব্রিজিত একবার লন্ডনের ওয়েম্বলি স্টেডিয়ামে গিয়েছিলাম। সেখানে নেলসন ম্যান্ডেলার[১] স্মরণে বিরাট কনসার্ট হয়েছিল। কম করে হলেও আশি হাজার মানুষ এসেছিলেন। নেলসন ম্যান্ডেলা তখন দক্ষিণ আফ্রিকার কারাগারে বন্দি। তাঁর মুক্তি চেয়ে বিখ্যাত ব্যান্ড ও গায়ক Bryan Aadams, Simple Minds সহ আরও অনেকেই গেয়েছিলেন। কনসার্টের সে অনুভূতি, সে পরিবেশ ছিল সত্যিই অসাধারণ।

আমি লন্ডনের একটা রেডিও স্টেশনে চাকরির জন্য আবেদন করি। হামবুর্গ থেকে লন্ডনের বাস যাত্রা ছিল খুবই কষ্টকর। কনসার্টে যাওয়া-আসার সে অভিজ্ঞতার কথা মনে করে, ইন্টারভিউতে অংশগ্রহণ করতে আমি এবার প্লেনে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিই। যে প্লেনে যাই, ওটা ছিল লন্ডন-হামবুর্গ-লন্ডনের একমাত্র প্লেন। সমস্যা হলো ওই প্লেন প্রতিদিন যাওয়া-আসা করত না। আমি নির্দিষ্ট দিনের একদিন আগেই লন্ডন পৌঁছাই। সেই রেডিও স্টেশনে গেলে সেখানকার নিয়োগকর্তা আমার সাথে দেখা করেননি। ইন্টারভিউ দিতে নির্দিষ্ট দিনের আগেই এসে হাজির... দেখা না করারই কথা।

তখন একটা কাকতালীয় ঘটনা ঘটে। আমার এক বন্ধু আমাকে একটা বিজ্ঞাপন দেখায়। বিজ্ঞাপনে বলা ছিল, MTV Europe একদম তরতাজা নতুন মুখ খুঁজছে। টিভি চ্যানেলটি তখনো জার্মানিতে অতটা পরিচিতি পায়নি। আমেরিকাতে ১৯৮১ সাল থেকে MTV খুব জনপ্রিয়। সফলতার ধারা বজায় রেখে ইউরোপে তাদের চ্যানেল জনপ্রিয় করে তুলতে চেয়েছিল। এর জন্য চাই চটপটে তরুণ উপস্থাপক।

সে সময় গানের মিউজিক ভিডিও জার্মানিতে মানুষ খুব একটা চিনত না। এর ধরণ ছিল সম্পূর্ণ নতুন। ইন্টারেস্টিং বিষয় হলো, যে উপস্থাপক হিসেবে নিয়োগ পাবে, তাকে লন্ডনে থাকতে হবে। কাজ করতে হবে সেখানেই। লন্ডন! আহা, আমি যে খুব করে তাই চাইছিলাম। এ যেন মেঘ না চাইতেই বৃষ্টি! উপস্থাপককে ইংরেজিতে দক্ষ হতে হবে। আমার জন্য এটা মোটেও কোনো সমস্যা ছিল না।

আমি আমার পুরাতন টাইপ রাইটারে চটজলদি আবেদন টাইপ করে ফেলি। সাথে মাইকেল জ্যাকসনের অনুকরণে একটা ভিডিও পাঠাই। মনে মনে খুব প্রার্থনা করছিলাম, 'ওহ গড! আমি যেন নিয়োগ পাই।'

এক মাস চলে গেল, কোনো খবর নেই। কাজের ব্যস্ততায় আমিও ভুলে গেলাম। একদিন হঠাৎ করেই বাসায় টেলিগ্রাম এল। আমাকে বলা হলো, আমি যেন বার্লিনে গিয়ে ইন্টারভিউ দিই টিভি উপস্থাপিকা (VJ) হিসেবে। টেলিগ্রাম হাতে পেয়ে আমার হৃদপিণ্ড উত্তেজনায় লাফাচ্ছিল।

উত্তেজনা কমে এলে আমার মনে পড়ল, আমার তো ওই দিন বিখ্যাত গায়ক Prince-এর কনসার্ট এ যাওয়ার কথা। আমার রেডিও থেকে আমাকেই এই কনসার্ট প্রোগ্রামের প্রতিবেদন তৈরির দায়িত্ব দেয়া ছিল। আমি ওখানে গেলে ইন্টারভিউ দিব কী করে?

MTV কর্তৃপক্ষকে সে কথা জানালাম। তারা আমাকে বললেন, দুই দিন পরে আসতে। দুই দিন পরে গিয়ে আমি ইন্টারভিউ দিয়ে আসলাম। আবার কয়েক মাস কেটে গেল। তারা কিছুই জানাননি। হঠাৎ আবার একদিন আমাকে জানালেন, আমি নাকি প্রথমবারের অডিশনে নির্বাচিত হয়েছি। দ্বিতীয় বারের মতো অডিশন দিতে, আমাকে লন্ডন আসতে হবে।

লন্ডন গিয়ে টিভি স্টেশনের অনেকের সাথেই কথা হলো। তাদের ব্যবহার ছিল বেশ আন্তরিক। তারা জানালেন, প্রথম দিকের কথা। ১৯৮১ সালে আমেরিকায় প্রথম এই চ্যানেলটি প্রতিষ্ঠা হয়। শুরুর দিকে মিউজিক ভিডিও অতটা ছিল না। মাত্র ছয়টি গান নিয়ে টিভির যাত্রা শুরু হয়। সারাদিন ধরেই ঐ ছয়টি গান ঘুরেফিরে বাজানো হতো। পরে যখন Madonna, Michael Jackson -এর মতো তারকারা নিজস্ব স্টাইল দিয়ে জনপ্রিয় হলেন, এরপরে আর পেছন ফিরে তাকাতে হয়নি।

আবারও কয়েক মাস কেটে গেল। একদিন MTV থেকে জানানো হলো, আমি নির্বাচিত হয়েছি। আমার আনন্দ দেখে কে!

আমি MTV-তে কাজ শুরু করলাম। MTV-তে আমার দিনগুলো ছিল সত্যিই চমৎকার। অসাধারণ সব অভিজ্ঞতা আর পরিবেশের মধ্যে থাকার সৌভাগ্য হয়।

www.pathagar.com

দেশ-বিদেশের অনেক অনেক মানুষের সাথে পরিচয় ঘটে। গায়ক-গায়িকা, নায়ক-নায়িকা, বিভিন্ন জগতের বিখ্যাত সব ব্যক্তিবর্গ... অনেকেরই আমি সাক্ষাৎকার নিই। অনেকের সাথে বিভিন্ন পার্টিতে যোগ দিই। দিনে দিনে ইউরোপের ঘরে ঘরে আমি হয়ে যাই পরিচিত মুখ। সে সময়ের প্রেক্ষাপটে টিভি উপস্থাপকেরা নিজেরাও একজন সেলিব্রেটির চেয়ে কোনো অংশে কম ছিলেন না।

আমার ব্যস্ততার কমতি ছিল না। প্রথম দিকে টিভি উপস্থাপনার নানা কলাকৌশল শিখি। এর পরে নানা অনুষ্ঠান আর গান নিয়ে মানুষের সামনে হাজির হই। কখনো আগ থেকে রেকর্ড করা, কখনো লাইভ। কাজের চাপে মাঝে মাঝে নিজেকে বিধ্বস্ত মনে হতো। কিন্তু ক্যামেরার সামনে কখনো তা প্রকাশ পেত না। ভেতরে ভেতরে আমার যা-ই হোক না কেন, ক্যামেরার সামনে আমি হাসিখুশি, প্রাণবন্ত। প্রথম দিকে খুব কষ্ট হলেও, ধীরে ধীরে এই অবস্থার সাথে নিজেকে মানিয়ে নিই।

আমাদের দর্শকরা ছিল মূলত তরুণ। তাদের উদ্দেশ্য করেই অনুষ্ঠানগুলো তৈরি করা হতো। উপস্থাপিকা হিসেবে আমাদের হাল আমলের নানা আকর্ষণীয় পোশাক পরতে হতো। এ সময় অনেক নামকরা ফ্যাশন ডিজাইনারের সাথেও আন্তরিক সম্পর্ক গড়ে উঠে।

লন্ডনের রিজেন্ট পার্কের পাশে আমি যে বাসায় ছিলাম, তার পাশেই ছিল লন্ডনের কেন্দ্রীয় মসজিদ। শুক্রবারে দেখতাম, দলে দলে লোক মসজিদের দিকে যাচ্ছেন। মহিলারা বোরকায় ঢাকা, পুরুষদের পরনে লম্বা পাঞ্জাবী। ঠিক তার উল্টো দিকে ছিল বিখ্যাত 'লর্ডস ক্রিকেট স্টেডিয়াম'। আমার মনে হতো, এক পাশে মসজিদ, আরেক পাশে স্টেডিয়াম। আহা! কী চমৎকার সম্মিলন।

শুরুর দিকে টিভিতে গানই প্রচার করা হতো শুধু। কয়দিন পরে শুরু হলো, টপ চার্টের গান নিয়ে অনুষ্ঠান। এমনও হতো জনপ্রিয় কোনো গান কয়েক মাস ধরে চালানো হচ্ছে। বিরক্তি আর একঘেঁয়েমি কাটাতে আমরা নানান রকম রমরমা খবর দেয়া শুরু করি। এই যেমন, কোন তারকা কোন ধরনের মোজা পরেছেন, কার নামে বাজারে কোন ধরনের গুজব চলছে...এই সব।

একটা সময় আমারও মনে হতো, এ আমরা কী করছি?

মনের কোণে শূন্যতা

একবার আমার মা-বাবা প্রস্তাব দিলেন, 'চল এবারের ছুটিতে আমরা মরক্কো যাই। সেখানকার পরিবেশ পুরোপুরিই আলাদা। যে ব্যস্ততায় দিন কাটছে, একটুখানি ভিন্নতা, একটুখানি অবসর তোমার জন্য খুব ভালো হবে। জানো তো, সেখানকার মহিলারা রাস্তায় পুরো শরীর ঢাকা বোরকা পরে চলাফেরা করে।'

www.pathagar.com

'ধুর! কী আর এমন ভিন্ন পরিবেশ'। আমি কিছুটা বিরক্তি সহকারে বললাম, 'ও রকম গণ্ডা গণ্ডা মহিলা আমার জানালা দিয়েও দেখা যায়।'

তবে মনে হলো, আমার আসলেই একটু বিশ্রাম নেয়া দরকার। বিনোদন জগতের এত ঠাঁট-বাট, জাঁক-জঁমকের মধ্যে থাকতে থাকতে আমি আসলেই হাঁপিয়ে উঠেছি। মা-বাবা আমার বোনসহ আগেই মরক্কো চলে গিয়েছিলেন। একদিন আমিও তাদের সাথে গিয়ে যোগ দিলাম।

মা এয়ারপোর্টে এলেন আমাকে রিসিভ করে নিতে। আমার পরনে ছিল, লম্বা কালো মোজা, সামনের দিকে বড় আকারে A অক্ষর লেখা একটা কালো গেঞ্জি। দুচোখ কালো সানগ্লাসের আড়ালে ঢাকা। মা আমার পোশাক-পরিচ্ছদ দেখে বড়ই বিব্রত হলেন। তিনি আমাকে বারবার করে বলে দিয়েছিলেন, যেন ঢিলেঢালা লম্বা জামা পরে আসি। আমার ধারণা ছিল আমার পোশাক ঠিকই আছে। মা বললেন, দেখো সবাই তোমার দিকে তাকিয়ে আছে।

ভাগ্য ভালো, কিছু লম্বা জামা আর পায়জামাও সাথে এনেছিলাম। মাকে সেগুলো দেখাতেই মা হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন।

আমার মা-বাবা MTV-তে আমার কাজ-কারবারে খুব একটা খুশি ছিলেন না। তাদের মনে হতো, এ কাজের কোনো ভালো ভবিষ্যৎ নেই। এর চেয়ে অন্য কোনো স্থিতিশীল পেশা বেছে নিলেই ভালো হতো। মজার ব্যাপার হলো, মরক্কোতে আমরা যে কটেজে ছিলাম, তাতে আমার সাথে কাজ করা MTV-র আরেক সহকর্মীও ছিল। তার বাবা-মায়েরও মনোভাব একই রকম। দুজনের বাবা-মায়েরা মিলে-মিশে তাদের সেই দুঃখের কথা একে অন্যের সাথে শেয়ার করতেন।

অনেক দিন পরে পরিবারের সাথে সময় কাটাতে এসে খুব ভালো লাগছিল। মনে হচ্ছিল, আমি সেই ছোট্ট ক্রিস্টিন আবার বাবা-মায়ের কাছে ফিরে এসেছি। মনে হচ্ছিল, আমি আর MTV-র উপস্থাপিকা ক্রিস্টিন নই। আমি একজন বোন, একজন কন্যা।

আমি আর সুসান মিলে পরিকল্পনা করছিলাম, মরক্কোর সুপ্রাচীন শহর ফেজ, মাররাকেস ইত্যাদি ঘুরে বেড়াবো। মানুষ কী ভাবে আর কী হয়! হঠাৎ করেই সুসান মারাত্মক অসুস্থ হয়ে পড়ল। এপেন্ডিসাইটিসের ব্যথায় বেচারি এতটাই কাতর হয়ে পড়ল, তাকে আর জার্মানিতে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার উপায় ছিল না। মরক্কোতেই অপারেশন করাতে হলো। হাসপাতালের বিছানায় তার রোগা পাণ্ডুর মুখ দেখে আমার খুব কষ্ট হয়েছিল।

www.pathagar.com

আমি আর মা জার্মানি ফিরে এলাম। বাবা রয়ে গেলেন সুসানের পাশে। অপারেশনের পরে সুসানের নতুন করে ইনফেকশন ধরা পড়ল। পরিস্থিতি নাজুক হওয়ায় এয়ার এম্বুলেন্সে তাকে দ্রুত নিয়ে আসা হলো হামবুর্গে। আমি এসবের কিছুই জানতাম না।

লন্ডনে এক রাতে আমি আমার রুমে বসেছিলাম। দেয়ালে সুসানের ছবিটা টাঙানো ছিল। হঠাৎ কেন জানি সুসানের ছবিটা দেয়াল থেকে পড়ে ভেঙে গেল। অজানা আশংকায় আমার বুকের ভেতরটা ধক করে উঠল। কয়েক মিনিট পরেই মা আমাকে খারাপ খবরটা দিলেন। সুসানের অবস্থা খারাপ। তাকে দ্রুত জার্মানিতে আনা হচ্ছে।

মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল। নিজেকে খুব অপরাধী মনে হচ্ছিল। বোনের এই দুঃসময়ে আমি তার পাশে দাঁড়াতেও পারছিলাম না। MTV-তে তখন প্রচণ্ড কাজের চাপ। হাসি হাসি মুখ করে আমাকে একের পর এক অনুষ্ঠান করে যেতে হচ্ছিল। বের করে নেয়ার মতো সময় একদমই ছিল না হাতে।

ভাগ্যক্রমে আরও দু-দুটো অপারেশনের পর সুসান সুস্থ হয়ে উঠে। দিন কয়েক পরে আমি সুসানকে হামবুর্গে দেখতে যাই। মৃত্যুর খুব কাছ থেকে ফিরে সুসানের মনোজগতে অনেক পরিবর্তন আসে। সুসান সক্রিয়ভাবে জড়িয়ে পড়ে সমাজসেবামূলক স্বাস্থ্যসেবায়।

আমার মন থেকে অপরাধবোধ কিছুতেই মুছে ফেলতে পারছিলাম না। এ কেমন জীবন আমার? নিজের ব্যক্তিগত জীবন বলে কিছু নেই। আপনজনের সুখে-দুঃখে পাশে দাঁড়াব, তারও উপায় নেই। কাজের স্বার্থে সব বিসর্জন দিতে হচ্ছে। প্রতি সন্ধ্যায় আমাকে বলা হয়, পরের দিন কোন অনুষ্ঠান টিভিতে প্রচার হবে, কোনটা রেকর্ড করতে হবে। আমি হয় রেকর্ডিং-এ সময় দিচ্ছি, নয়তো ক্যামেরার কাজ করছি। মিডিয়ায় যারা কাজ করেন না, তারা এ অবস্থা কিছুতেই বুঝতে পারবেন না।

MTV ছিল অরাজনৈতিক চ্যানেল। সে সময় বিশ্বব্যাপী নানা ঘটনা সংঘটিত হচ্ছিল। ১৯৮৯ সালে জার্মানিতে বার্লিন ওয়াল[২] ভেঙে গেল। ১৯৯১ সালে শুরু হলো উপসাগরীয় যুদ্ধ।[৩] এর এক বছর পরে বসনিয়াতে যুদ্ধ[৪] বেঁধে গেল। [illegible]

www.pathagar.com

আমরা চাইলেই তো আমাদের চ্যানেল ব্যবহার করে বিশ্বব্যাপী চলা সংঘাতের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তুলতে পারতাম। শান্তি, পারস্পরিক সম্মান, বোঝাপড়ার কথা বলতে পারতাম।

আমার একজন বন্ধু ও পরামর্শদাতা ছিলেন স্টিভ। আমি সময়ে সময়ে তার সাথে আমার মনের অনুভূতির কথা শেয়ার করতাম। তিনি আমাকে বলতেন, 'ক্রিস্টিন, তুমি যদি কোনো কিছু বদলাতে চাও, তবে তোমাকেই আগে বড় কিছু হতে হবে। এখন তুমি কিছু বলতে গেলে লোকে তোমার কথা শুনবে কেন? যখন নিজে বিখ্যাত কেউ হবে, তখনই দেখবে মানুষ তোমার কথা শুনছে। আর তোমার নিজের কাজটাও তো কোনো অংশে ছোট নয়। তুমি মানুষকে বিনোদন দিচ্ছ, তাদেরকে খুশি রাখছ। মানুষ শত দুঃখ-কষ্টের মধ্যে বিনোদন খুঁজে। বিনোদনের দুনিয়ায় ডুবে গিয়ে নিজের দুঃখগুলো ভুলতে চায়। হোক না সেটা খানিকক্ষণের জন্য।'

একদিন তিনি আমাকে তার বন্ধুর কাছ থেকে শোনা এক গল্প বললেন। তার বন্ধুটি ছিল বসনিয়াতে যুদ্ধ কাভার করা এক রিপোর্টার। সেখানে নাকি এমনও হয়েছে, আমার অনুষ্ঠান টিভিতে আসা মাত্রই কিছুক্ষণের জন্য বিরুদ্ধ পক্ষ তাদের অস্ত্র নামিয়ে রেখেছিল।

জানি না, এই ঘটনা সত্যি কিনা। যদি সত্যি হয়ে থাকে, তবে এটা আমার জন্য বিরাট পাওনা।

আমি আমার ভক্তদের কাছে কৃতজ্ঞ। তারা তাদের ভালোবাসা দিয়ে আমার দুঃখবোধ ভুলিয়ে রাখত। অনেকেই আমাকে চিঠি লিখতেন, উপহার পাঠাতেন। কেউ কেউ কবিতা লিখতেন। একজন আমাকে একটা টেডি বিয়ার পাঠিয়েছিল। আমি মজা করে এটি টিভিতে দেখিয়ে তাকে ধন্যবাদ জানিয়েছিলাম। দিন কয়েক পরে, আমার স্টুডিও ছোট-খাটো চিড়িয়াখানা হয়ে গিয়েছিল। এত এত খেলনা পশু-পাখি উপহার পেয়েছিলাম! আমি সব ছোট ছোট গরীব বাচ্চাদের বিলিয়ে দিয়েছিলাম। আরেকজন পাঠিয়েছিলেন দামি হীরের আংটি।

এত কিছুর পরেও আমার ভেতরে কীসের যেন এক শূন্যতা! এই গান ভিডিওর জগত ছেড়ে খুব স্বাভাবিক কোনো জীবনে ফিরে যেতে মনটা কাঁদত। কাজে আসা মানে নিজের মাথাটাকে বাসায় রেখে আসা। মাস্তি-ফুর্তির জগতে ডুবে যাওয়া। বুদ্ধিবৃত্তিক জগতটাকে আমি খুব মিস করছিলাম। অবসর সময়ে তাই চলচ্চিত্র, ইউরোপীয় শিল্প-সাহিত্য, ইটালিয়ান ভাষা...ইত্যাদি নিয়ে নানা ধরনের কোর্স করতে লাগলাম।

www.pathagar.com

এ সময় 'Cocacola Report' নামে নতুন একটা অনুষ্ঠান সঞ্চালনার দায়িত্ব পড়ে আমার উপর। এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বিভিন্ন দেশে যেতাম, সেখানকার খাবার, দর্শনীয় স্থান ইত্যাদি নিয়ে রিপোর্ট করতাম। অনুষ্ঠানটা মজাই লাগছিল। দেশ থেকে দেশে ঘুরে বেড়াতাম। আজ স্পেন তো কাল ইস্তাম্বুল। বিভিন্ন বিখ্যাত ব্যক্তিদের সাক্ষাৎকার নিতাম।

এই অনুষ্ঠানের প্রচারণার অংশ হিসেবে আমি অলিম্পিক মশাল[৫] নিয়েও দৌড়েছিলাম। সে মশাল, স্মৃতি স্মারক হিসেবে আমি আমার কাছে রেখে দিয়েছি।

এত কিছুর পরেও আমি বুঝতে পারছিলাম, এই জগতের পেছনের গল্পগুলো অতটা স্বস্তিদায়ক নয়। কত গায়কের সাথে কত মিউজিক কোম্পানির মারামারি, ঝগড়াঝাঁটি হতে দেখেছি। কতজনের সাথে কতজনের সম্পর্ক ভেঙেছে। একদিকে শিল্প, অন্যদিকে বাণিজ্য। এ দুয়ের মাঝে তাল রাখাটা মুশকিল হয়ে পড়ছিল।

আমার মনে হচ্ছিল, আমি এক ধরনের বুদবুদের মধ্যে ডুবে আছি। যেকোনো সময় বুদবুদটা মিলিয়ে যাবে। আমি পড়ে যাব ধপাস করে।

১৯৯১ সালে অবশেষে যা হবার, তাই হলো। আমি প্রচণ্ড মানসিক অবসাদে ডুবে গেলাম। মনে হচ্ছিল, আমার শরীরে কোনো শক্তি অবশিষ্ট নেই। দিনের পর দিন আমি কাজ করে যাচ্ছি। কিন্তু জানি না কেন করছি, কী লাভ এতে। আমার ক্যারিয়ারের মধ্যগগনে এসেও মনে হচ্ছিল, আমি একটা চক্রের মধ্যে পড়ে গেছি। এ থেকে বের হবার উপায় নেই। একটাই আমার কাজ... পরের অনুষ্ঠান করে যাওয়া।

উপস্থাপক হিসেবে আমাকে প্রচণ্ড চাপের মধ্যে থাকতে হয়। কখনো দেখা গেল, অনুষ্ঠান শুরু হয়ে গেছে, স্ক্রিপ্ট হাতে এসে পৌঁছায়নি। একটা লাইভ অনুষ্ঠান হবার কথা, শেষ মুহূর্তে জানা গেল আমন্ত্রিত ব্যান্ড দল আসছেন না। কখনো 'সাউন্ড সিস্টেম' এর পুরোটাই এলোমেলো। কখনো আমার 'মেক আপ' ম্যান এসেছেন স্টেজে উঠার ঠিক আগ মুহূর্তে।

এ সবকিছু আমাকে মুখে হাসি ধরে রেখে সামলাতে হয়। প্রচণ্ড চাপের মধ্যে থেকে একেক সময় মনে হয়, আমি পুরো পাগল হয়ে যাব। রাতের পর রাত দুঃস্বপ্ন দেখতাম। দেখতাম, লোকজন সবাই স্টেজের সামনে অপেক্ষা করে বসে আছেন। আমাকে দ্রুত স্টেজে উঠতে হবে। অথচ আমি কোনোভাবেই সঠিক পোশাক কিংবা স্ক্রিপ্ট খুঁজে পাচ্ছি না।

তার উপরে এই চাকরির কোনো নিশ্চয়তা ছিল না। চুক্তিগুলো হতো খুব অল্প সময়ের জন্য। যেকোনো মুহূর্তে স্বল্প সময়ের নোটিশে যে কাউকে ছাঁটাই করা হতো। আমি জানতাম, যেকোনো সময় আমাকেও বাদ দেয়া হতে পরে।

www.pathagar.com

তাছাড়া সে বছরই আমাকে বলা হয়েছিল, আমার চাকরির অবস্থা খুব বেশি সুবিধের নয়। এ খবর শুনে আমার মাথায় যেন বাজ পড়ল! MTV-এর ভেতরে থাকা এক বন্ধুর বিশেষ হস্তক্ষেপে সে যাত্রায় আমার চাকরিটা টিকে গিয়েছিল।

নিজেকে খুশি রাখতে আমি চমৎকার সব পোশাক কিনতাম, নতুন নতুন জুতো কিনতাম। সাময়িকভাবে মনটা ভালো থাকলেও সে অনুভূতি খুব বেশিক্ষণ টিকত না। আবার নতুন কিছু কিনতাম, কিছুক্ষণের জন্য খুশি থাকা, আবার হতাশায় ডুবে যাওয়া। মনে হতো, আমার একজন সঙ্গী দরকার। যার সাথে মন-প্রাণ খুলে মনের কথা বলতে পারব, যার সাথে সুখ-দুঃখগুলো ভাগাভাগি করে নিতে পারব।

হতাশা যত গভীর হচ্ছিল, বুঝতে পারছিলাম আলো তত নিকটে।

কিন্তু কোথায় পাব তারে? কে সে?

স্বপ্নের সারথি

সময়গুলো প্রচণ্ড ব্যস্ততায় কাটছিল, কিন্তু হতাশা আমার কাটছিল না কিছুতেই।

এক সন্ধ্যায় বান্ধবী ব্রিজিত আমাকে তার জন্মদিনের অনুষ্ঠানে দাওয়াত দিল। আমি প্রথমে কিছুটা ইতস্তত বোধ করছিলাম। শেষে রাজি হলাম। মজা করে বললাম, যেতে পারি, তবে এক শর্তে। আমাকে বসাতে হবে সুদর্শন কোনো পুরুষের পাশে।

'হুম! বুঝতে পেরেছি। এখানে একজন পুরুষও এমন আছেন যিনি বলেছেন, তাকে কোনো সুন্দরীর পাশে বসার সুযোগ দিতে হবে' ব্রিজিত হাসতে হাসতে বলল।

ব্রিজিতের পার্টিতেই আমার ইমরান খানের সাথে পরিচয় হলো। যার সাথে সাক্ষাৎ আমার জীবনটাই বদলে দিয়েছিল। ইমরান দেখতে লম্বা, সুদর্শন। তবে প্রথম দেখায় তাকে কিছুটা বুড়ো বুড়ো মনে হচ্ছিল। আমাকে বলা হলো, ইনি পাকিস্তানের বিশ্বকাপ জয়ী অধিনায়ক। অবশ্য আমি আমার বিনোদন জগতের বাইরে খুব বেশি কাউকে চিনতাম না। এও জানতাম না, ইমরান পাকিস্তানের জাতীয় বীর। মেয়েরা তার জন্য পাগল। জার্মানিতে ক্রিকেট খেলা তেমন একটা পরিচিত ছিল না। ইমরানকে আমার তাই না চেনারই কথা।

আমি স্বীকার করে নিলাম, ইমরানের নাম আমি এই প্রথম শুনেছি। ইমরানও আমাকে বলল, সেও সংগীত অঙ্গনের মানুষদের খুব বেশি চিনে না। আমি MTV-এর একজন জনপ্রিয় উপস্থাপিকা এই তথ্যও তার জানা ছিল না। দুজন ভিন্ন দুই জগত থেকে আসার কারণে ভালোই হলো। অল্পক্ষণেই আমরা বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলাপে মেতে উঠলাম।

www.pathagar.com

ইমরান খানের জন্ম লাহোরে এক পাঠান পরিবারে। পাঠানেরা মূলত যোদ্ধা জাতি হিসেবে খ্যাত। আফগানিস্তান ও আফগান সীমান্তবর্তী পাকিস্তানের বেশ কিছু এলাকায় পাঠানরা বাস করে। খেলাকে পেশা হিসেবে নেয়ার আগে ইমরান অক্সফোর্ডে এসেছিল, রাজনীতি ও অর্থনীতি নিয়ে পড়াশোনা করার জন্য। পাকিস্তান জাতীয় দলে খেলার পাশাপাশি ইমরান কাউন্টিতে সাসেক্স দলের পক্ষ হয়েও খেলত। দীর্ঘদিন ইংল্যান্ডে কাটানোয় ইংল্যান্ড তার কাছে ছিল দ্বিতীয় ঘর।

বিশ্বকাপ জয়ের কিছুদিন পরই তার সাথে আমার দেখা হয়। ইমরান তত দিনে খেলা ছেড়ে দিয়ে মায়ের নামে একটা দাতব্য হাসপাতাল খোলার কাজে ব্যস্ত। তার মা ক্যান্সারে মারা গিয়েছিলেন। খুব কাছ থেকে ইমরান দেখতে পেয়েছিল, ক্যান্সারের কী কষ্ট। মায়ের মৃত্যুর পর তার স্বপ্ন ছিল একটা ক্যান্সার হাসপাতাল খোলা, যাতে দরিদ্র মানুষেরা স্বল্পমূল্যে/বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা নিতে পারে। তার সেই স্বপ্নের ক্যান্সার হাসপাতাল খুলতে অনেক টাকা প্রয়োজন। তহবিল সংগ্রহের একটা কাজেই ইমরানের লন্ডনে আসা। লন্ডনে স্বাভাবিকভাবে তার ভক্ত, অনুরাগী, বন্ধু-বান্ধব অনেক।

ইমরান আমাকে বলল, সর্বশক্তিমান আল্লাহর ইচ্ছায় তার বিশ্বকাপ জয় ও এতদূর আসা। আমি তাকে আমার MTV-র অভিজ্ঞতা শুনালাম। আর দশজনের মতো তাকে ততটা উৎসাহিত মনে হয়নি।

আমি তাকে জিজ্ঞাস করলাম, 'ক্যারিয়ারের এই সময়ে এসে তুমি খেলা ছেড়ে দিলে শুধুমাত্র দাতব্য কাজ করতে?'

ইমরান উত্তর দিল, 'খেলা তো অনেক হয়েছে। এখন বরং মানুষের জন্য কিছু করতে চাই। এটা আমার বিশ্বাসের সাথে সম্পর্কিত। ইসলামের মৌলিক শিক্ষা হলো, আল্লাহর উপর বিশ্বাস রাখা এবং ভালো কাজ করে যাওয়া।'

কিছুদিন পরে অফিস থেকে বাড়ি ফেরার পরে আমি ইমরানের একটা মেসেজ পাই। ইমরান আমাকে তার কিছু বন্ধু-বান্ধবের সাথে রাতের খাবারের জন্য নিমন্ত্রণ জানায়। সে দাওয়াতে সাড়া দেবার পর আরেকটি অনুষ্ঠানেও ইমরান আমাকে ডাকে।

কথা ছিল দুজন একসাথে যাব। আমি তার ফ্ল্যাটের দরজায় দাঁড়িয়ে বেল টিপ দিই। আমার পরনের পোশাক ছিল পশ্চিমা ঢঙয়ে কিছুটা খোলামেলা। ইমরান দরজা খুলে বেরিয়ে আসে। আমার পোশাক দেখে কিছুটা সংকুচিত হয়ে বলে, 'তুমি কি তোমার লম্বা কোটটা পুরো সন্ধ্যা পরে থাকতে পারবে?'

'কেন?' আমি কিছুটা অবাক।

www.pathagar.com

'দেখ আমাদের পাকিস্তানি সংস্কৃতিতে মেয়েরা তাদের শরীর ঢেকে রাখে', সে ব্যাখ্যা করল 'তারা মার্জিত পোশাক পরে। পুরুষরাও তাই। আজ সেখানে অনেক মানুষ থাকবে। তুমি যেহেতু আমার সাথে যাচ্ছ...তাই ভালো হয় তোমার কোট দিয়ে নিজেকে ঢেকে রাখলে।'

আমি সারা সন্ধ্যা কোট গায়ে দিয়ে ছিলাম।

একদিন সে আমাকে বলল, সে মেয়েদের বাইরে যেতে অতি সাজ-সজ্জা পছন্দ করে না। তার মতে মেয়েদের সাজ-সজ্জা ও সৌন্দর্যের প্রদর্শন কেবল তার ঘরের মধ্যেই হওয়া উচিত।

কিছুটা অদ্ভুত চিন্তা-ভাবনা নিঃসন্দেহে। পাশ্চাত্যের পুরুষদের চিন্তাধারা তো পুরোই আলাদা। পুরুষেরা চায় বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তাদের স্ত্রীরা সেজেগুজে থাকুক, নিজেদের আকর্ষণীয় করে রাখুক। আমি নিজেও তো অনুষ্ঠান করার সময় মেকআপ করে নিজেকে সাজাই। অথচ বাসায় থাকি একেবারে সাদামাটা, সাধারণভাবে।

ধীরে ধীরে ইমরানের সাথে আমার ঘনিষ্ঠতা বাড়তে থাকে। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে সে তার পরিচিত লোকদের সাথে আমাকে পরিচয় করিয়ে দেয়। আমি দেখলাম, তার পরিচিত গণ্ডির মানুষগুলো MTV-র সেলিব্রেটিদের চেয়েও অনেক বেশি আকর্ষণীয়। কে নেই তাদের মাঝে? বলিউড অভিনেতা, লেখক, সাহিত্যিক, খেলোয়াড়, ব্যবসায়ী... একেকজন একেক দেশের। কেউ পাকিস্তানের, কেউ ভারতের আবার কেউবা ইংল্যান্ডের। এই সব বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষদের সাথে পরিচিত হতে পেরে আমার ভালো লাগত। সময়গুলো আমি দারুণভাবে উপভোগ করতাম।

ইমরান পাকিস্তান, লন্ডন দু-জায়গাতেই সময় কাটাত। ইংল্যান্ডে চেলসিতে তার একটা ফ্ল্যাট ছিল। সাধারণত জুন-জুলাই তার এখানেই কাটত। এর পাশে তার ক্যান্সারে হাসপাতালের জন্য তহবিল সংগ্রহের একটা অফিসও ছিল। ইমরান ছিল প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের একটা সংমিশ্রণ। যেখানেই যেত, খুব সহজেই মানুষের মনোযোগ আকর্ষণ করে নিতে পারত। বিশেষ করে তরুণীদের। প্রথম দিকে ব্যাপারটা খুব অস্বস্তিকর ঠেকত। শেষের দিকে আমি এতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিলাম।

মায়ের মৃত্যুর পর ইমরান ধর্ম নিয়ে মনোযোগী হয়ে উঠে। পড়াশোনা করতে করতে সে তার নিজের ধর্ম, নিজের বিশ্বাসকে নতুন করে আবিষ্কার করে।

একদিন কথায় কথায় আমি বলছিলাম, 'আমি ইসলাম সম্পর্কে তেমন কিছুই জানি না। কখনো এটা নিয়ে খুব সিরিয়াসলি ভাবিনি। আমি একবার মালয়েশিয়া, আরেকবার মরক্কো গিয়েছিলাম। আমার ধারণা, মুসলিম নারীদের স্বাধীনতা বলে কিছু নেই।

www.pathagar.com

তারা অনেকটা পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার অধীনে নির্যাতিত। কুরআন খুব কঠোর নিয়ম-কানুনে ভরপুর। অবশ্য আমি খুব ভালো করে জানি না। তবে আমি জানতে চাই।'

'কুরআন আসলে কোনো মানুষের রচনা নয়। এটা সর্বশক্তিমান আল্লাহর বাণী। 'ইমরান ব্যাখ্যা করল 'আল্লাহর উপর বিশ্বাসই ইসলামের মূল বিষয়।'

'আচ্ছা, তা না হয় বুঝলাম। আমি নিজেও ঈশ্বরে বিশ্বাস করি। কিন্তু কুরআন কী করে ঈশ্বরের বাণী হলো?'

'কুরআন দীর্ঘ সময় ধরে সর্বশেষ নবি মুহাম্মাদ ﷺ-এর উপর নাযিল হয়েছিল। ফেরেশতা জিবরাঈল আল্লাহ পক্ষ থেকে কুরআনের বাণী নিয়ে আসতেন।'

আমি বুঝতে পারছিলাম না। আমার মনে হলো, ইমরান আল্লাহ নামক আলাদা কোনো সত্ত্বাতে বিশ্বাস করে। ঈশ্বরে নয়।

ইমরান মুচকি হাসল, 'আল্লাহকেই ইংরেজিতে God বলে। আল্লাহ মূলত সেই একই সত্ত্বা, যাকে তোমরা God বলে জানো। ইসলাম মানে আল্লাহর সামনে নিজের ইচ্ছাকে সমর্পণ করা। অবশ্য ইসলামের আরও একটা মানে আছে। এর অর্থ হলো, শান্তি। সোজা কথায় নিজের ইচ্ছাকে আল্লাহর উদ্দেশ্যে সমর্পণ করে শান্তি অর্জন করাই হলো ইসলাম।'

আমার নিজের জীবনে কোনো ঈশ্বরের অস্তিত্ব ছিল না, ছিল না কোনো শান্তি। ঈশ্বর বলতে মনে হতো সেই ছোটবেলার হারিয়ে যাওয়া কোনো নাম। ধর্মের সাথে আমার কোনো সম্পর্ক ছিল না। ততদিনে আমার বাবা-মায়ের বিচ্ছেদ হয়ে গেছে। নিজের পরিচয় নিয়ে আমি সংকটে ভুগছিলাম। শেষ কবে আমার মনে শান্তি ছিল, সত্যি কথা বলতে আমি তা ভুলেই গিয়েছি। একজন মানুষ এই বয়সে যতটা খ্যাতি সাফল্য পেতে পারে, তার সবই আমার ছিল। কিন্তু মনের গভীরে আমি নিঃস্ব, রিক্ত এবং একা।

ইমরান আমার ভেতরে ঘুমিয়ে থাকা নতুন এক চেতনা জাগিয়ে তুলল। জীবনের আরও একটি দিক আছে, আছে বিশেষ অর্থ। এমন দিক যাকে আমি হন্যি হয়ে খুঁজছি। অথচ যাকে নিয়ে ভাবার মতো দুদণ্ড সময় আমার নেই।

ইমরান আমাকে বলত, 'এই বস্তুগত জীবনই আসলে সবকিছু নয়। মানুষের ধরাছোঁয়ার বাইরেও আরেকটি জীবন আছে। প্রাচ্যের মানুষ সেই জগতকে উপলব্ধি করে। আর পাশ্চাত্য কবেই তাকে কবর দিয়ে রেখেছে।'

www.pathagar.com

পরেরবার দেখা হবার পর ইমরান আমাকে একটা বই দিয়েছিল। ইরানি লেখক আলী শরীয়াতির[৬] লেখা 'Man and Islam'। শরীয়াতি ১৯৭৭ সালে ইংল্যান্ডে মারা যান। তিনি তেহরান বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করতেন। রেজা শাহ পাহলভির[৭] আমলে তাঁর মতাদর্শের কারণে তাকে দিনের পর দিন জেলে থাকতে হয়েছিল।

শরীয়াতি আধুনিক সমাজব্যবস্থার কঠোর সমালোচনা করেছেন। তিনি তার লিখায় বলেছেন, 'এটা কী করে উন্নত ও সভ্য সমাজের নমুনা হতে পারে, যেখানে একদিকে বস্তুবাদ[৮] এবং পুঁজিবাদের[৯] বিস্তার ঘটছে, অন্যদিকে মানুষের দরিদ্র অপরিবর্তিত থাকছে। পরিবেশ ও সমাজের অবক্ষয় চলছে। দিন দিন মানুষের মাঝে বাড়ছে হতাশা ও অবসাদ।' তিনি পাশ্চাত্যের এই সমস্যার পেছনে প্রধানতম দায়ী করেছেন, এক আল্লাহর উপর পরিপূর্ণ বিশ্বাস ও আস্থাহীনতাকে।

তিনি লিখেছেন, 'মানুষ বিজ্ঞানের দ্বারা নিজেকে প্রকৃতি ও ইতিহাসের কারাগার থেকে মুক্তি দিতে পারে। সমাজতত্ত্বের দ্বারা সামাজিক সমস্যা থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতে পারে। কিন্তু নিজের আমিত্বের খাঁচা থেকে মুক্তি পেতে প্রয়োজন...ধর্ম ও ভালোবাসা।'

কথাগুলো আমার মনের ভেতর অনুরণন তুলল। হতে পারে তার কথাই সত্য। হতে পারে আমার হৃদয়ের গহীনে এমন কিছু একটা লুকায়িত ছিল, যা আমি এত দিন বুঝতে পারিনি।

আমি ইমরানের সাথে এই বই নিয়ে আমার অনুভূতি শেয়ার করলাম। এরপর আলোচনা শুরু হলো তার আর আমার প্রাচ্য[১০] আর পাশ্চাত্যের[১১] পার্থক্য নিয়ে। আমরা আলোচনা করলাম, কী করে বিশ্বায়ন[১২], পশ্চিমা সংস্কৃতি, ভোগবাদ, ধর্মহীনতাকে দেশে দেশে রপ্তানি করছে। আমরা কথা বললাম, ফ্যাশন জগতের নিষ্ঠুরতা নিয়ে। ইমরান যুক্তি দিল, মুসলিম মহিলারা এমন পোশাক পরে যাতে তাদের শরীর আবৃত থাকে। মার্জিত পোশাক তাদের ব্যক্তিত্বকে উজ্জ্বল করে।

মাঝে মাঝে আমাদের মধ্যে উত্তপ্ত তর্ক-বিতর্ক হতো। আমার জন্য এ আলোচনা ছিল নিজের অন্তরাত্মার জেগে উঠা। যদিও কখনো কখনো আমার কাছে ইমরানের মতামত বড় বেশি কট্টর মনে হতো। কিন্তু যখন সে পাশ্চাত্যের মহিলাদের উপস্থাপন নিয়ে কথা বলত, তার বিরুদ্ধে খুব বেশি যুক্তি খুঁজে পেতাম না।

রাস্তার ধার দিয়ে যখন গাড়ি চালিয়ে যেতাম, ইমরান আমাকে বিলবোর্ড, প্ল্যাকার্ডগুলো দেখাত। গাড়ির টায়ার থেকে নিয়ে পুরুষের সুগন্ধি...সবকিছুর সাথেই স্বল্প পোশাক পরা নারীর ছবি। ইমরান বলত, এভাবে শরীর উন্মুক্ত করা নারীর জন্য অবমাননাকর। এ জন্যই ইসলাম বলে নারীদের মার্জিত পোশাক পরতে, যাতে একজন মানুষ হিসেবে তার মর্যাদা রক্ষা পায়।

www.pathagar.com

মাঝে মাঝে আমি ইমরানকে 'মোল্লা' বলে ফোঁড়ন কাটতাম। কিন্তু বিনোদন জগতের লোক হিসেবে আমি অনুভব করতাম, নারীদের উপস্থাপনা আসলে পণ্যের চেয়ে বেশি কিছু নয়। নারীদেরকে মিডিয়ার কভারেজ পেতে অনেক বেশি খোলামেলা ও উত্তেজক পোশাক পরতে হয়। শতকরা নব্বই ভাগের বেশি ক্ষেত্রে বিভিন্ন বিজ্ঞাপনে নারীদের বুদ্ধিমত্তাকে উপস্থাপন করা হয় না। এখানে শরীরটাই মূখ্য। ইমরানের যুক্তি অনুযায়ী আমি দেখতে পেলাম, পশ্চিমা সমাজ যতই বলুক মুসলিম দেশগুলোতে নারীরা নির্যাতিত, পাশ্চাত্যের নারীদের উপস্থাপনা নিঃসন্দেহে নারীদের জন্য অবমাননাকর। বিনোদন জগতে থেকেও এমন অনেক

www.pathagar.com

আরেক পৃথিবীর সন্ধানে

ইমরানের সাথে দেখা হবার ৩ মাস পর ১৯৯২ সালের আগস্ট মাসে আমার বান্ধবী ব্রিজিতকে সাথে নিয়ে আমরা পাকিস্তান যাই। প্রথমে যাই লাহোরে, ইমরানের বাবার বাসায়। আমি খেয়াল করলাম, ইমরান তার বাবাকে স্যার বলে সম্বোধন করছে। ঘরের মধ্যে এরূপ সম্বোধন! আমি কিছুটা অবাক হয়েছি। আমাকে বলা হলো, এই সম্বোধন এসেছে ইসলামিক অনুভূতি থেকে। ইসলামে বলা হয়েছে, বাবা-মায়ের সাথে সর্বোচ্চ সুন্দর আচরণ করতে। আমি ভাবছিলাম, বাবাকে এভাবে সম্বোধন করা বাবা-মায়ের সাথে সন্তানদের এক ধরনের দূরত্ব তৈরি করছে কিনা।

আমি দেখলাম, পাকিস্তানের প্রায় বাচ্চারা তাদের বাবা-মায়ের সাথে খুবই নরম ভাষায় কথা বলছে। তাদের আচার-আচরণ আমাদের সম্পূর্ণ বিপরীত।

www.pathagar.com

তার স্বপ্নের হাসপাতাল গড়ার জন্য। ইমরান আবেগঘন ভাষায় বলত, 'এই কাজে সচ্ছল লোকদের চেয়ে দরিদ্রদের আন্তরিক সহায়তাই পেয়েছি বেশি।'

আমরা মানুষের আন্তরিক আতিথেয়তা পেয়েছি। উপরের দিকে এমন একটা জায়গায় পৌঁছলাম, জায়গাটার নাম হানজা। বলতে গেলে সভ্যতা থেকে অনেক দূরে। এ এলাকার মানুষ বিশ্বাসের দিক দিয়ে সমৃদ্ধ, কিন্তু সম্পদে দরিদ্র।

www.pathagar.com

সত্যি কথা বলতে, এ নিয়ে আমি কখনোই গভীরে গিয়ে ভাবিনি। আমি MTV-তে আমার কাজ নিয়ে খুশি ছিলাম। ভাবতাম, আমি আমার মতো করে এই পৃথিবীকে একটুখানি সুন্দর করতে ভূমিকা রাখছি। সব সময় দৌড়ের উপর থাকতে হয়। স্থির হয়ে ভাবার সময় কই।

আমার জবাব শুনে ইমরানকে সন্তুষ্ট বলে মনে হলো না। সে বলে চলল, 'একজন মুসলিম হিসেবে উন্নততর লক্ষ্য হচ্ছে স্রষ্টাকে জানা। প্রতিটি কাজে তার স্মরণ করা, তার ইবাদাত করা। এটাই মানব জীবনের আসল উদ্দেশ্য। আমরা মানুষেরা দুনিয়াতে আল্লাহর প্রতিনিধি। আমাদেরকে এই দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করতে হবে। এ জীবনটা পরীক্ষা ক্ষেত্র মাত্র। এখানে আমরা অনন্ত সে জীবনের জন্য বীজ রোপণ করে চলেছি।'

ইমরান সুযোগ পেলেই তার বিশ্বাস নিয়ে কথা বলত। সে সবখানেই ঈশ্বরের মহিমা দেখতে পেত। আমরা যখন ক্লান্ত হয়ে বসে পড়তাম, সে আকাশ ছোঁয়া নয়নাভিরাম পর্বত দেখিয়ে বলত, 'দেখ, আল্লাহর সৃষ্টি কত চমৎকার!'

দিনে দিনে আমি বুঝতে পারলাম, ইসলাম ইমরানের জীবনে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। হিমালয়ের এই পর্বতশ্রেণির মধ্য দিয়ে চলতে গিয়ে ইমরান আমাকে বলল, তার রাজনীতিতে আগ্রহের কথা। তার হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা হয়ে গেলে, মানুষের আস্থা অর্জন করতে পারলে, সে সক্রিয় রাজনীতিতে নামবে। তার মতে, তার দেশের সম্ভাবনা অনেক। কিন্তু দেশের রাজনীতিবিদেরা দুর্নীতিবাজ। দেশের সম্পদের সঠিক ব্যবহার ও ব্যবস্থাপনা করা গেলে এই দেশ একদিন আরও অনেক দূর এগিয়ে যাবে।

ইসলামাবাদ ফিরে আসার পথে আমি আবারও উপলব্ধি করলাম, আল্লাহর উপর বিশ্বাসের শক্তি কতখানি। এই বিশ্বাস কী করে মানুষকে অকুতোভয় করে তুলে।

ফেরার পথে জায়গায় জায়গায় বরফ গলে রাস্তা ডুবে আছে। কোথাও কোথাও উপড়ে পড়া গাছ রাস্তা আটকে পড়ে আছে। নাইম নিজ হাতে গাছ সরাত। আমি আর ব্রিজিত ভয়ে গাড়ির মধ্যে গুটিসুঁটি মেরে থাকতাম। সামনের রাস্তা পানিতে ডুবে আছে। একটুখানি পিছলে গেলে আর দেখতে হবে না। পড়তে হবে একেবারে হাজার মিটার নিচে খাদে।

নাইম বিড়বিড় করে কী সব দোয়া পড়ে যেত, শেষে বিসমিল্লাহ বলে সে পানির উপর দিয়ে গাড়ি চালিয়ে দিত। আমরা অবিশ্বাস্য চোখে তার কাজ কারবার দেখতাম। জায়গাটুকু পেরিয়ে এসে আবার কী সব দোয়া পড়ত। মনে হয় ঈশ্বরের শুকরিয়া আদায় করত।

www.pathagar.com

এরপরে আমরা এলাম লাহোরে। লাহোর পাঞ্জাব প্রদেশের কেন্দ্রবিন্দু। মুঘল স্থাপত্যের এক অপূর্ব নিদর্শন। চমৎকার নির্মাণশৈলী, অপরূপ কারুকাজ সম্বলিত

www.pathagar.com

আল্লামা ইকবাল পড়াশোনা করেছিলেন ক্যামব্রিজে।[১৭] স্নাতক ডিগ্রি নিয়েছেন জার্মানির ইউনিভার্সিটি অফ হেইডেলবার্গ থেকে। তিনি দীর্ঘদিন জার্মান দার্শনিক ও কবি 'গ্যেটে'র জীবন ও আদর্শ নিয়ে পড়াশোনা করেছিলেন। ইকবাল নিজে কেবল একজন কবি আর দার্শনিকই ছিলেন না। তিনি ইসলামিক ঐতিহ্য ও সভ্যতার পুনর্জীবনে বিরাট ভূমিকা রেখেছিলেন। তিনি ধর্মকে উপজীব্য করে রাষ্ট্র

www.pathagar.com

চেতনায়, অনুভবে...

পাকিস্তান থেকে ফিরে আমার মনোজগতে কিছু পরিবর্তন এল। বিনোদন জগতের সবকিছু আমার কাছে মনে হচ্ছিল কেমন মেকি মেকি। নানা উদ্ভট পোশাকের আড়ালে নিজেকে অতি স্মার্ট সাজার চেষ্টা আমার কাছে হাস্যকর লাগছিল। পাকিস্তান থেকে ফিরে বহুদিন পরে আমি শ্যাম্পেনে মুখ দিলাম। প্রথমটায় কেমন মাথা ধরে গেল। পরের দিন সকালে মাথা তোলাই কঠিন হয়ে পড়ল।

যাহোক, আশেপাশের মানুষদের সাথে বিভিন্ন উৎসব, অনুষ্ঠান আর কর্মব্যস্ততায় আমার জীবন কেটে যাচ্ছিল তর তর করে।

ইমরান লন্ডনে ফিরে আসার পর আমাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে কথা বলা শুরু করল। সে অবশ্য আনুষ্ঠানিকভাবে আমাকে প্রেমের প্রস্তাব দেয়নি। কিন্তু কথায় কথায় বলত, আমাদের মনে হয় বিয়ে করা উচিত। ইমরান আমাকে খুব সুন্দর একটা সোনার লকেট দিয়েছিল। লকেটে বড় করে লেখা 'আল্লাহ'। আমার হৃদয়টা আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল 'সুখ সুখ' এক অনুভূতিতে। আমি প্রায় সারাক্ষণই লকেটটা গলায় পরে থাকতাম।

বিয়ের কথা বললেও, ইমরানের জন্য বিয়ে অতটা সহজ ছিল না। বছরের পর বছর ধরে পাকিস্তানে জল্পনা-কল্পনা চলছিল ইমরান খান কবে বিয়ে করে? কাকে? সে কি পাকিস্তানি নাকি ভিন দেশী কেউ। পাকিস্তানের ট্যাবলয়েড পত্রিকাগুলো ছিল এ নিয়ে জল্পনা-কল্পনা গুজবে ভরপুর। তবে সবার আশা ছিল, ইমরানের বউ হবে পাকিস্তানি কেউ।

স্বাভাবিকভাবেই ইমরান খুব সতর্কতার সাথে আমাদের সম্পর্কটাকে গোপন রাখতে চাইছিল। আমি তার সংস্কৃতিকে সম্মান জানাতে তাই করে যাচ্ছিলাম। কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে মন থেকে মেনে নিতে কষ্ট হচ্ছিল। এমন একজনকে আমি পছন্দ করি, তাকে আমি বিয়ে করতে চাই...অথচ জনসম্মুখে সে আমাকে বাগদত্তা হিসেবে পরিচয় করিয়ে দিতে নারাজ! আমাকে পরিচয় করিয়ে দিতে তার মনে দ্বিধা, সংকোচ, লজ্জা!

আমি চাইনি তার হাসপাতালের কার্যক্রম ক্ষতিগ্রস্ত হোক। আজ যদি মিডিয়ায় চাউর হয়, ইমরান একজন পশ্চিমা নারীকে বিয়ে করতে যাচ্ছে, নিঃসন্দেহে তার তহবিল সংগ্রহের উদ্যোগ ক্ষতিগ্রস্ত হবে। সে আমাকে বলত, আমার হাসপাতালটা আগে হয়ে যাক। তারপরেই আমরা বিয়ে করব।

www.pathagar.com

যেকোনো পার্টি অনুষ্ঠানে আমরা আলাদা যেতাম। নিজেদের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা বোঝায় এমন যেকোনো কিছু আমরা সযত্নে এড়িয়ে চলতাম। এরপরও একদিন পত্রিকায় দুজনের একসাথে এক পার্টিতে থাকার ছবি প্রকাশ পায়। ইমরান আতংকে নীল হয়ে যায়, না জানি কী প্রতিক্রিয়া শুরু হয় চারিদিকে। ভাগ্য ভালো, তেমন কিছু হয়নি। হাসপাতালের কাজ ভালোই চলতে লাগল।

ইমরান পেশাদার ক্রিকেট খেলা ছেড়ে দিলেও, বিভিন্ন দাতব্য টুর্নামেন্টে খেলতে যেত। আমিও তার সঙ্গী হতাম। খেলাটা কখনোই আমার তেমন একটা বুঝে আসেনি। তবে শেষের দিকে খেলা নিয়ে দর্শকের টানটান উত্তেজনা, উৎসাহ খুব উপভোগ করতাম।

ইমরানের বন্ধু ও পরিচিত মহল ছিল অনেক বড়। কে নেই সেখানে? হাসপাতালের জন্য টাকা সংগ্রহের জন্য সে একটা ডিনার পার্টির আয়োজন করে। সেখানে ছিল বলিউড কিং অমিতাভ বচ্চন, পাকিস্তানি সংগীতের কিংবদন্তি নুসরাত ফতেহ আলী খানসহ আরও অনেকে। ডিনারের ফাঁকে ফাঁকে ইমরান ক্যান্সার হাসপাতালের প্রয়োজনীয়তা, পাকিস্তানের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার দুর্দশা নিয়ে আবেগঘন ভাষায় বক্তৃতা করল। তারপর অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথিদেরকে পাকিস্তানের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা নিয়ে ভিডিও দেখানো হলো। ইমরান সবার প্রতি উদাত্ত আহবান জানাল, যাতে সবাই সাধ্যমতো সর্বোচ্চ অর্থ সাহায্য করেন।

ইমরানের এত পরিশ্রম বৃথা যায়নি। তার মা শওকত খানমের নামে ক্যান্সার হাসপাতাল ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান একসময় একটা নামকরা প্রতিষ্ঠানে রূপ নেয়। স্বচ্ছল রোগীরা টাকা দিয়ে চিকিৎসা নিত। অন্যদিকে, দরিদ্র রোগীদের প্রায় ৭৫ ভাগ কম খরচে চিকিৎসা দেয়া হতো। কারও কারও ক্ষেত্রে চিকিৎসা করা হতো একদম ফ্রিতে। খরচ যোগাতে ইমরান প্রতি বছর অন্তত ২ কোটি মার্কিন ডলার যোগাড় করতে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিল। করাচিতে এই হাসপাতালের আরেকটি শাখা ছিল পরিকল্পনাধীন।

আমি ইমরানের এই প্রচেষ্টাকে মনভরে উপভোগ করতাম। এ ছিল আমার জগত থেকে আলাদা। বিনোদন জগতের আনন্দ হলো, রাত হলে মদ-মাদকে ডুবে যাওয়া, নাচ গান করা, কথা বলা। কিন্তু মানুষের জন্য কিছু করার আনন্দ এই কৃত্রিম আনন্দের চেয়ে হাজারগুনে সেরা।

ইমরান বলত, মানুষের জন্য কিছু করার এই উৎসাহ, এই প্রেরণা তার ধর্মীয় বিশ্বাস থেকেই আসা। ইমরান আমার সাথে ইসলাম নিয়ে কেবল কথাই বলত না। নিজেও পালন করত। আমি তাকে দেখতাম জায়নামায বিছিয়ে নিয়মিত নামায পড়তে।

www.pathagar.com

রমযানে সে রোযা রাখত। ইসলাম নিয়ে প্রচুর পড়াশোনা করত। রিজেন্ট পার্কের পাশে একটা ইসলামিক বইয়ের দোকান ছিল। সেখান থেকে ইসলামি বই কিনত।

ইমরানের কাছ থেকে আমি কুরআন বোঝার চেষ্টা করেছিলাম। প্রথমটায় এর ভাষা আমার কাছে এতটাই দুর্বোধ্য মনে হয়েছিল, আমি কিছুই ঠাহর করে উঠতে পারিনি। আমার এত দিনকার পড়া বই পুস্তকের চেয়ে এর ধরণ ছিল পুরোই আলাদা। কিন্তু কুরআনের বাণীর শক্তিশালী আবেদন আমি অনুভব করতে পারছিলাম। দেখে অবাক হলাম, ইসলাম, খ্রিষ্ট ও ইহুদির ধর্মের এত মিল। আমি জানতাম, তিন ধর্মের মানুষই আল্লাহকে বিশ্বাস করে। কিন্তু বাইবেলের চরিত্র ইব্রাহিম, মুসা, ঈসা যে মুসলমানদের ও সম্মানিত নবি...এই তথ্য আমার জানা ছিল না।

'আল্লাহ যুগে যুগে নবিদের মাধ্যমে মানুষের কাছে তার বার্তা পাঠিয়েছেন'। ইমরান আমাকে ব্যাখ্যা করে বলল, 'মুহাম্মাদ ﷺ ছিলেন সর্বশেষ নবি, খাতামুন নাবিয়্যিন। তিনি আল্লাহর বাণীকে পূর্ণতা দিয়েছিলেন।'

এত দিন জেনে আসা খ্রিষ্ট ধর্মের তিন খোদা কিংবা আদী পাপের[২০] ধারণা ইসলাম ধর্মে অনুপস্থিত। ইসলাম বলে মানুষ তার ফিতরাতের উপর নিষ্পাপ হয়েই জন্মায়।

> প্রত্যেকেই তার নিজের কর্মফলের জন্য দায়ী হবে। কেউ কারও পাপ বহন করবে না। সূরা আনআম : ১৬৪

আমার কাছে এসবই যৌক্তিক মনে হলো। বিশেষ করে একের পাপ অন্যের বহন না করা কথা।

আমার মনে পড়ল, যখন আমি আমেরিকাতে পড়তে গিয়েছিলাম, তখন বয়স্ক ইহুদিরা আমার সাথে কথা বলেননি। কারণ, আমি জার্মান, যারা হলোকাস্টের[২১] জন্য দায়ী। আমি তাদের আবেগ বুঝতে পেরেছিলাম। জার্মান ইতিহাসের এই অন্ধকার অধ্যায় আমার নিজের জন্যও ছিল কষ্টদায়ক। কিন্তু তাই বলে এমন কোনো কিছুর জন্য আমি দায়ী হতে পারি না, যা আমার জন্মের অনেক আগে ঘটে গেছে। যার পেছনে আমার কোনো হাত নেই।

ইসলাম নিয়ে পড়তে গিয়ে আমি বুঝতে পারলাম, জাতিগত কোনো অপরাধের জন্য সেই জাতির সবাইকে দোষী ভাবা ও শাস্তি দেয়া কখনো সুবিচার হতে পারে না। পাশাপাশি ইসলাম বলে, অতীত থেকে আমাদের শিক্ষা নিতে। যাতে আমরা আজকের পৃথিবীতে অবিচার ও নিষ্ঠুরতা প্রতিরোধে কাজ করতে পারি।

www.pathagar.com

পরবর্তী দুবছর ধরেই আমি কয়েক মাসের জন্য পাকিস্তান যাওয়া-আসা করতে লাগলাম, যাতে দেশটাকে আরও ভালো করে বুঝতে পারি। আরও কাছ থেকে মানুষগুলোকে জানতে পারি। পাশাপাশি এ ছিল আমার চিরচেনা পরিবেশ থেকে বেরিয়ে আসা, একটু ভিন্নতার স্বাদ নেয়া। সুগন্ধীযুক্ত মসলাদার সব খাবার, ভিন্ন রূপ-রঙ-গন্ধ, পথের পাশে পানিতে কৃষ্ণ বর্ণের মায়াবী মহিষের গোসল, প্রকৃতির অবারিত উদার সৌন্দর্য... এসবই আমি মুগ্ধ হয়ে উপভোগ করতাম।

চলন্ত গাড়ির জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আমি দেখতাম। আর এই অপরিচিত পরিবেশ যা দিনে দিনে আমার অনেক কাছের, অনেক আপন হয়ে উঠেছে, তার মাঝে নিজেকে একাত্ম করে নিতাম।

একবারের সফরে আমরা কাশ্মীর গিয়েছিলাম। কাশ্মীর পাকিস্তানের অন্যতম সুন্দর জায়গা। এখানে আছে বরফে ঢাকা শুভ্র পাহাড়, কলকল বয়ে চলা শান্ত শীতল ঝরনা, ফুলে ফুলে ঢাকা বিশাল বন্য ঝোঁপ। আমরা পাকিস্তানের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের গোত্রগুলোতেও গিয়েছিলাম। সেখানকার মানুষগুলোর আন্তরিকতা আসলেই মুগ্ধ হবার মতো। অনেক পুরুষের চেহারা ভয় জাগানিয়া। একেকজন বিশাল, লম্বা, সুঠাম দেহের। ঘন ভ্রুয়ের নিচে তাদের চোখ গাঢ় সবুজ। কিছু কিছু নারী-পুরুষের চেহারা অত্যন্ত সুন্দর। প্রথম দেখায় চোখের পলক ফেলা কঠিন। কিছু কিছু পুরুষের আছে ঘন মোটা গোঁফ, কারও মুখে লম্বা দাড়ি।

প্রত্যেকের পরনে লম্বা কুর্তা, পাজামা। মাথায় বাঁধা রঙ-বেরঙয়ের বাহারি পাগড়ি। তাদের কারও কারও কাঁধে শোভা পাচ্ছে কালাশনিকভ রাইফেল। রাইফেলের নল সূর্যের আলোয় ঝিলিক দিয়ে উঠছে। কোমরে গোঁজা বন্দুকের গুলি।

রাস্তায় মহিলা খুব কমই দেখেছিলাম। সামান্য যে কয়েকজনকে দেখলাম, তারা মাঠে কাজ করছেন।

চলার পথের রাস্তা ছিল পাথুরে, সংকীর্ণ। বাড়িগুলো দেখতে নিশ্ছিদ্র দূর্গের মতো। জানালাগুলো এতটাই সরু, কেবল একটা বন্দুকের নলই বাইরে বেরুতে পারবে।

জায়গাটা যদিও পাকিস্তানের অংশ, কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের আইন-কানুন এখানে চলে না। এই অঞ্চল নিয়ন্ত্রণ হয় গোত্রগুলোর নিজস্ব আইন-কানুন দ্বারা। গোত্রপতিরা তাদের নিজস্ব পঞ্চায়েতে মিলিত হয় যার নাম 'জিরগা'। এখানেই আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। পাঠানরা তাদের নিজস্ব আইন ও বিধি-বিধান নিয়ে গর্ব করে। এটি 'পাখতুনওয়ালী' নামে পরিচিত। সাম্প্রতিক সময়ে তালেবানের আনাগোনা এ অঞ্চলে অনেক বেশি বেড়ে গেছে। বেশ কিছু বোমা হামলার ঘটনাও ঘটেছে।

www.pathagar.com

এরপর থেকে সেনাবাহিনীর অনুমতি ছাড়া সেখানে যাওয়া নিষেধ। ইমরান নিজে পাঠান বংশোদ্ভুত হওয়ায় সুবিধে হয়েছে। ইমরানের কল্যাণে আমরা এসব এলাকায় সহজে যেতে পেরেছি।

আমরা পেশোয়ারেও যাই। আমি দেখতে পাই, মহিলারা বোরকা পরে চলাফেরা করছে। অনেকটা আফগান মহিলাদের মতো দেখতে। আপাদমস্তক পুরোটাই মোটা ধূসর নীল রঙয়ের কাপড়ে ঢাকা। বাইরে থেকে কিছু দেখা যায় না। আমি নিজে একবার এরকম একটা পরার চেষ্টা করেছিলাম। বাপরে বাপ! গরমে আমার দম বন্ধ হয়ে যাবার মতো অবস্থা। আমি দ্রুত খুলে রাখলাম। এ জিনিস আমার জন্য নয়।

বাজারের মধ্যে দিয়ে হেঁটে যেতে আমার মজা লাগত। কোলাহল মুখর, জমজমাট। বাজারের মধ্যে কিছু লোক দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওষুধ বিক্রি করত। তাদের বলা হয় হাকিম। সাপের বিষ, বাঘের শরীরের অংশ...নানা কিছু ওষুধ হিসেবে বিক্রি করা হতো। আমার বুঝে আসত না, বাঘ জিনিসটাই তো বিলুপ্ত প্রায়। এত সহজে বাজারে দাঁড়িয়ে এরা বাঘের অংশ পায় কী করে!

পাকিস্তানে প্রাকৃতিক ওষুধ হিসেবে সবচেয়ে জনপ্রিয় কালোজিরা। রাসূলের হাদিস আছে, 'মৃত্যু ছাড়া কালোজিরা আর সব রোগের উপশমকারী'।

পাকিস্তানে এক জমিদারের সাথে আমাদের দেখা হলো। আমরা তার প্রাসাদে ছিলাম এক রাত। মুঘল স্টাইলে তৈরি তার প্রাসাদ ছিল বিশাল। রাতের খাবারের সময় তিনি আমাদের উটের দুধের তৈরি একটা খাবার খেতে দিলেন। এটি ছিল খুব ঘন, স্বাদটা বেশ কড়া। আমি খুব বেশি খেতে পারিনি। তার বাড়িটি ছিল অনেক চাকর-বাকরে ভরা। তার ওখানে আরও একটা জিনিস দেখলাম– যা আমার জন্য হজম করতে কষ্ট হয়েছিল। মনে হলো আমি যেন আধুনিক যুগ থেকে সেই পুরোনো মধ্য যুগে ফিরে গেছি।

তার জমিগুলোতে যারা চাষাবাদ করতেন, তারা ছিল তার প্রজার মতো। প্রতিদিন সকালে তার ওখানে বিচার বসত। শতাধিক লোক আসত বিভিন্ন বিচার-আচার নিয়ে। তিনি সবার মাঝে মীমাংসা করে দিতেন। আধুনিক জগতের গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান, সামাজিক ন্যায়বিচার, মানবাধিকারের ধারণা এখানে পুরোই অনুপস্থিত।

তবে একটা জিনিস আমার খুব ভালো লাগল, পরিবার প্রথা। পুরো পাকিস্তান সমাজ পরিবার প্রথার উপর নির্ভরশীল। পরিবারের সদস্যরা একে অন্যের সাথে

www.pathagar.com

মিলেমিশে থাকে, সুখে দুঃখে একে অন্যের পাশে থাকে। একে অন্যের প্রতি এই শর্তহীন বন্ধন আমার হৃদয় ছুঁয়ে দিল। আজ পাশ্চাত্যের সমাজে এ যা দূরতম কল্পনা।

পাকিস্তানে এসে বুঝতে পারলাম ইমরান এখানে ঠিক কতটা জনপ্রিয়। দেশের প্রতি তার টান, দেশের মানুষের ভালোবাসা তাকে প্রতিনিয়ত দেশের জন্য কিছু একটা করতে উদ্বুদ্ধ করে। ইমরান পাকিস্তানের মেধাবী মানুষদের বিদেশে স্থায়ী হওয়ার ঘোরবিরোধী।

সন্ধ্যার আগে আগে আমরা হাঁটতে যেতাম। কৃষকদের গরু-ছাগল নিয়ে মাঠে ফেরার দৃশ্য তার খুব ভালো লাগত। ইমরান পশুদের সাথে মানুষের এই নিবিড় সম্পর্কের খুব গুণগান গাইত। বলত, আমাদের ধর্মে বলা হয়েছে, আমরা যেন পশু-পাখিসহ সব প্রাণীদের সাথে সুন্দর আচরণ করি, ভালো ব্যবহার করি। যেন প্রাকৃতিক পরিবেশ সংরক্ষণে ভূমিকা রাখি। এমন কী যাতে এক ফোঁটা পানিরও অপচয় না হয়। সূরা আনআমের ১৪১ নং আয়াতে বলা হয়েছে– আল্লাহ অপচয়কারীদের ভালোবাসেন না। এ জন্য ইমরান গণহারে বনভূমি উজাড় করণের তীব্র বিরোধিতা করে। পাকিস্তানের অনেক অংশেই তাই চলছিল। ইমরান বলছিল, কখনো রাজনীতিতে এলে সে এর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ গড়ে তুলবে।

ইমরান ব্যাখ্যা করল, স্থানীয় কৃষকেরা ততটুকু ফসলই নেয় যতটুকু প্রয়োজন। অতিরিক্ত উৎপাদিত ফসল তারা গরীবদের মাঝে বিলিয়ে দেয়। কারণ, ইসলাম বলে, একজন মুসলিম হিসেবে যতটুকু প্রয়োজন, ততটুকুই নাও। উদ্বৃত্তটুকু অভাবীদের মাঝে বিলিয়ে দাও। মজুদদারী ইসলামে নিষিদ্ধ। এক জীবনে আমাদের যত সম্পদই থাকুক না কেন, পরবর্তী জীবনে তা আসলে কোনোই কাজে আসে না।

জীবন ক্ষণস্থায়ী। ইমরান রাসূলের বাণী উদ্ধৃত করত, 'এই দুনিয়া মুসাফিরখানা মাত্র'। তার মানে হলো আমাদের এই দুনিয়ার জীবনের সম্পদ নিয়ে অতি ব্যতিব্যস্ত থাকা উচিত নয়। আমরা যখন আল্লাহর সামনে দাঁড়াই, কিংবা যখন আমাদেরকে কবরে শুইয়ে দেয়া হয়, তখন সম্পদ কোনো কাজে আসে না। একমাত্র নেক আমলই আমাদের সম্বল।'

ইমরান বাদ দিয়ে অন্য কেউ আমাকে এসব কথা বললে, আমি বলতাম 'ব্যাটা! ভাবের কথা বলছে'। কিন্তু ইমরানের কথাগুলো শুনলে বুঝতে পারি, সে আসলেই তা মনে প্রাণে বিশ্বাস করে।

www.pathagar.com

পাকিস্তানের জীবনযাত্রা আমাকে যতই মুগ্ধ করুক না কেন, একদিন সব ছেড়েছুঁড়ে পাকিস্তানে এসেই ঘর বাঁধতে হবে- এই চিন্তা আমাকে ঠিক স্বস্তি দিত না। একদিন এক ঝরনার ধারে পিকনিকের সময় ইমরান আমাকে বলল, 'তোমার বাচ্চারা হবে মুসলিম'। তার ইঙ্গিত আমার হৃদয় ছুঁয়ে গিয়েছিল। আমি যে সত্যিই তাকে স্বামী হিসেবে পেতে চাইতাম, তার সাথে ঘর বাঁধতে চাইতাম। কিন্তু পাকিস্তানে এসে স্থায়ী হবার ভাবনায় মনের কোথায় যেন খচখচ করত। পশ্চিমা সমাজে আমার জীবন যাত্রা একরকম। কিন্তু এখানে নারীদের জীবনযাত্রা পুরোই ভিন্ন। আমার পক্ষে কী সম্ভব সে জীবন ছেড়ে এ জীবনের সাথে নিজেকে মানিয়ে নেয়া?

এ কথা সত্য, আমি যেখানেই গিয়েছি সবার কাছ থেকে শ্রদ্ধা আর ভালোবাসা পেয়েছি। কোনো পুরুষই আমার সাথে অসৌজন্যমূলক আচরণ করেনি। শহর থেকে দূরে প্রত্যন্ত অঞ্চলের পুরুষেরা আমার দিকে চোখ তুলেই তাকাত না। অনেকে আমাকে পুরো এড়িয়ে চলত। ইমরান আমাকে বলেছিল, নারীদের প্রতি সম্মানবোধ থেকেই তারা এমন করে। একটু ভিন্ন ধারণার সাথে মানিয়ে নিতে একটু সময় লাগে বৈকি। প্রথম প্রথম অন্যরকম লাগলেও শেষের দিকে আমিও আর কিছু মনে করতাম না। আবার অনেক পুরুষ এসে আমাকে 'বোন' বলে সম্বোধন করতেন।

এর বাইরেও পাকিস্তানি কিছু সংস্কৃতি আমার মনঃপুত হতো না। আমি এ নিয়ে প্রশ্ন তুলতাম। মহিলাদের মসজিদে যাওয়ার অনুমতি নেই। শহুরে কিছু অভিজাত শ্রেণি ছাড়া আর প্রায় সব জায়গায় পুরুষ মহিলার একে অন্যের সাথে মেলামেশা করার, কথা বলার নিয়ম নেই।

সিন্ধু প্রদেশে আমরা আরেক জমিদারের বাড়িতে গিয়েছিলাম। তার স্ত্রী সব সময় কঠিন পর্দা মেনে চলতেন। কখনো পুরুষদের সামনে আসতেন না। আমি তার সাথে দেখা করতে বাড়ির ভেতরের অন্দরমহলে যাই। সেখানে তিনি চাকর-বাকরসহ তার ছেলে মেয়ে পরিজন নিয়ে থাকেন। বাড়ির সে অংশটা হাসি আনন্দ উচ্ছাসে সরগরম। কাপড় ধুতে ধুতে কিংবা কাপড় বুনতে বুনতে মহিলারা একে অন্যের সাথে ঠাট্টা-মশকরা করে যাচ্ছিলেন। ছোট বাচ্চারা সামনের উঠোনে খেলাধুলা করছিল।

এই মহিলা বাইরে গেলে আপাদমস্তক কালো বোরকায় ঢেকে বের হতেন। গ্রামবাসী সম্মান দেখিয়ে তাকে জায়গা করে দিত, চোখ নামিয়ে নিত। ফেরার সময় সে জমিদার আমাকে খুব চমৎকার এক জোড়া কানের দুল দিয়েছিলেন।

www.pathagar.com

আমি অনেক দিন সেগুলো পরেছিলাম। একসময় কোথায় হারিয়ে যায়। অনেক খুঁজেও আর পাইনি।

আমি খেয়াল করলাম, পাকিস্তানে ঘরের দেয়ালে নারীদের কোনো ছবি নেই। পুরুষদের কিছু কিছু ছবি টানানো আছে। ইমরান আমাকে বলল, এর উদ্দেশ্য হলো নারীদেরকে মূল্যবান জহরতের মতো আগলে রাখা। যাতে অন্য কোনো পরপুরুষের চোখে না পড়ে। আমার নিজের এত দিনকার তোলা ছবিগুলোর কথা মনে পড়ে গেল। বিশেষ করে মডেলিং এর জন্য সেই সব ছবির কথা। এই 'আগলে রাখার' ধারণাটা কিছুটা অবাক করল আমায়।

গ্রামে গ্রামে আমি দারিদ্রের নিদারুণ ছাপ দেখেছি। অধিকাংশ পরিবারগুলোতে বাচ্চা-কাচ্চা অনেক। দেখেছি ছোট ছোট বাচ্চারা অল্প বয়সে রুজি রোজগারে নেমে পড়েছে। ইমরান দাবি করল, এ অবস্থা ভারতের মতো অত খারাপ নয়। ভারতে অনেক মানুষ ফুটপাতে ঘুমায়, ফুটপাতেই মারা যায়।

'গরীব লোকেরা চেষ্টা করে যত বেশি পারা যায় তত সন্তান নিতে। এটা তাদের বৃদ্ধ বয়সে এক ধরনের নিরাপত্তা বিমা হিসেবে কাজ করে' ইমরান আমাকে ব্যাখ্যা করল।

ঐতিহ্যগতভাবে, স্ত্রী-সন্তান, পিতা-মাতার প্রতিপালনের দায়িত্ব পুরুষদের উপরেই থাকে। তাই নারী শিক্ষার চেয়ে পুরুষদের শিক্ষার উপর বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়। নারীদের সাধারণত অল্প বয়সেই বিয়ে হয়ে যায়। তাদের জীবনের সাথে নিজের জীবনকে মিলিয়ে নিজেকে খুব ভাগ্যবান মনে হচ্ছিল।

মোটের উপর পাকিস্তান নিয়ে আমার অনুভূতি মিশ্র। আমি কোনোভাবেই পুরুষ মহিলার আলাদা আলাদা থাকার বিষয়টা মেনে নিতে পারছিলাম না। শুধু মহিলাদের সাথে আলাপ করে আমি ক্লান্ত বোধ করতাম। বিশেষ করে যখন এই সব মহিলারা বাইরের পৃথিবী সম্পর্কে তেমন কিছুই জানে না। ইমরান আমাকে অভয় দিত, এই ব্যবস্থা নারীদের সুরক্ষা ও বিয়ে ব্যবস্থা অক্ষুণ্ন রাখার স্বার্থেই করা। পাশাপাশি গ্রামেগঞ্জে এই নিয়ম যতটা কঠোরভাবে মানা হয়, শহরে অতটা নয়।

সে জোর দিয়ে বলত, এই ব্যবস্থা কোনো ভাবেই নারীদের দমিয়ে রাখার জন্য নয়। মুসলিম পুরুষেরা নারীদের মর্যাদার দৃষ্টিতে দেখেন। এটি কেবল কুরআনের নির্দেশই নয়, রাসূলের জীবনও এর উৎকৃষ্ট আদর্শ। তিনি নারীদের সাথে অত্যন্ত সম্মান ও মর্যাদাপূর্ণ ব্যবহার করতেন।

www.pathagar.com

রাসূলুল্লাহ ﷺ একথাও বলেছেন, 'তোমাদের মধ্যে সে-ই সবার মধ্যে সেরা, যে তার নিজের স্ত্রীর কাছে সেরা।' রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজে স্ত্রীদের সাথে সুন্দর ব্যবহার করতেন। তাদের সাথে হাসি-ঠাট্টা করতেন, তাদেরকে ঘরের কাজে সাহায্য করতেন। বিভিন্ন সময় তাদের সাথে পরামর্শ করতেন। সফরে গেলে স্ত্রীরা উনার সঙ্গী হতেন। তিনি তাঁর স্ত্রী আয়েশা (রা.)-কে অত্যন্ত ভালোবাসতেন। আয়েশা (রা.) গ্লাসের যে অংশে মুখ দিয়ে পানি খেতেন, সে অংশে তিনিও ঠোঁট লাগিয়ে পানি খেতেন।

শুনতে শুনতে আমি মুগ্ধ হচ্ছিলাম।

'আচ্ছা, তাই নাকি? তাহলে মশাই তুমিও আমাকে ঘরের কাজে সাহায্য করবে'। আমি ফোঁড়ন কাটতাম।

ইমরান রাসূলের কথা বলতে গিয়ে আবেগ আপ্লুত হয়ে পড়ত। সে অনেক কষ্ট নিয়ে বলত, পশ্চিমারা নবিজীর জীবনী ভালো করে না জেনেই তাঁর সম্পর্কে আজেবাজে কথা বলে।

আমরা Martin Lings-এর লিখা রাসূলের জীবনী পড়েছিলাম। রাসূলের ﷺ মৃত্যুর অংশ পড়তে গিয়ে ইমরান শিশুর মতো কেঁদেছিল। নবি ﷺ-এর প্রতি ভালোবাসা ছিল তার হৃদয়ের গহীনে। অবশ্য ইমরান ব্যতিক্রম কিছু নয়। নবি ﷺ-এর প্রতি সব মুসলিমের অনুভূতিই প্রায় একই রকম।

'যে-ই রাসূলের নাম লিখে তার সাথে যোগ করে সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সালাম; অর্থাৎ তার প্রতি দরুদ ও সালাম।' ইমরান আমাকে বলল, 'আমরা মুসলিমরা যখন অন্য কোনো নবির নাম নেই, তখনো বলি আলাইহিস সালাম। আমি বুঝতে পারলাম, নবির বিরুদ্ধে কিছু বলা হলে মুসলিমরা কেন এতটা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেন। নবির প্রতি প্রেম, নবির প্রতি ভালোবাসা প্রতিটি মুসলিমই হৃদয়ের গভীরে ধারণ করেন।

Martin Lings-এর সেই জীবনীতে নবিজীর জীবনের আরও অনেক দিক নিয়ে বলা আছে। একজন প্রেমময় স্বামী, স্নেহময় পিতা, বিশ্বস্ত সঙ্গী, বিজ্ঞ শিক্ষক, সৎ ব্যবসায়ী, বিচারক এবং সর্বোপরি আল্লাহর রাসূল যিনি মানুষকে মুক্তির পথ দেখান; সব দিক দিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ ছিলেন মানুষের জন্য অনুপম আদর্শ। কুরআনে আছে–

> রাসূলকে পাঠানো হয়েছে সমগ্র মানবজাতি, সৃষ্টিকূলের জন্য রহমতস্বরূপ। সূরা আম্বিয়া : ১০৭

www.pathagar.com

এত দিন আমি মুসলিমদের সম্পর্কে যা জেনে এসেছিলাম, পড়তে পড়তে বুঝলাম তা সঠিক নয়। ইমরানের সাথে ধর্ম নিয়ে আমার অনেক কথা হতো। আমার মনের ক্ষুধা দিনে দিনে বেড়ে যাচ্ছিল। আমি আরও বেশি ইসলাম সম্পর্কে জানতে চাইছিলাম, আরও বেশি ইসলামের গভীরে ডুবে যাচ্ছিলাম।

নবিজী ছিলেন প্রাণীদের প্রতি দয়ার সাগর। একবার এক সফরে তার কিছু সঙ্গী এক মা পাখির বাচ্চা নিয়ে যায়। মা পাখিটা ব্যাকুল হয়ে ডানা ঝাপটাতে থাকে। রাসূল ﷺ এসে জানতে চান বাচ্চাগুলোকে নিয়ে গেল। তিনি আবার বাচ্চাগুলোকে মা পাখিটার কাছে ফিরিয়ে দেন।

নবিজী ﷺ তাঁর সাহাবিদের কাছে এক মহিলার গল্প বলেন। বনী ইসরাইলের সে মহিলা ছিলেন দুশ্চরিত্রা ও পাপী। একবার একটি কুকুর পিপাসায় হাঁপাচ্ছিল। কুকুরটিকে দেখে মহিলাটির মায়া হলো। সে মহিলা পায়ের মোজা খুলে একটা কূপের কাছে গেলেন। তারপর মোজায় করে পানি ভরে এনে কুকুরটিকে খাওয়ালেন। মহান আল্লাহ এই উসিলায় এই মহিলাটির সকল পাপ ক্ষমা করে দিলেন।

মুহাম্মাদ ﷺ সব সময় বলেছেন, যেন পশুদের সাথে সদয় আচরণ করা হয়। যেন ক্ষুধায়, যন্ত্রনায় কিংবা সাধ্যাতিরিক্ত বোঝা চাপিয়ে তাদের কষ্ট দেয়া না হয়।

এই চমৎকার শিক্ষাগুলোর সাথে বাস্তবের সব সময় মিল খুঁজে পাওয়া যেত না। আমি দেখতাম, পাকিস্তানে গাধা কিংবা অন্য প্রাণীগুলো যন্ত্রণায় চিৎকার করে কাঁদছে। কোনোটা ধর্মের শিক্ষা আর কোনোটা স্থানীয় মানুষের রেওয়াজ প্রথা...মনে হলো, সতর্কতার সাথে এ দুয়ের মাঝে আমার পার্থক্য করা উচিত। একটাকে অন্যটার সাথে যেন গুলিয়ে না ফেলি।

ইউসুফের বাড়িতে থাকার সময়, বুকসেলফে আমি বেশ কিছু বই পাই। এরকমই দু-একটা বই পড়তে গিয়ে আমি একটা মজার তথ্য পাই। বাহ্যিকভাবে ইসলামই একমাত্র ধর্ম যেটি ধাপে ধাপে দাস প্রথা বিলুপ্তির কথা বলে। ইমরান আর ইউসুফের কাছে সে কথা উল্লেখ করতেই তাদের চোখ মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তারা আমাকে জানাল, কেউ কোনো পাপ করলে পাপ মোচনের জন্য রাসূল ﷺ দাস মুক্ত করতে উৎসাহ দিয়েছেন। শুধু তাই নয়, তিনি সক্রিয়ভাবে চেষ্টা চালিয়েছেন, যাতে মুক্ত হওয়া দাসেরা সমাজের মূল স্রোতে মিশে যেতে পারে। মিষ্টি স্বরের বেলাল নিজে ছিলেন একজন হাবশী কৃতদাস। তিনি ছিলেন ইসলামের প্রথম মুয়াজ্জিন।

www.pathagar.com

কিন্তু ইমরান ও ইউসুফ দুজনেই স্বীকার করতে বাধ্য হলো, পাকিস্তানের কিছু কিছু অঞ্চলে এখনো দাসপ্রথার কাছাকাছি প্রথা বিদ্যমান। তারা এ জন্য রাজনীতিবীদদের দায়ী করলেন।

সকালবেলা নাস্তা হিসেবে আমাদেরকে দেয়া হলো আলু, পেঁয়াজ মরিচ, টমেটো আর ধনিয়া দিয়ে ভাজা ডিমের ওমলেট, রুটি, দুধ আর চা। বাইরে রোদ ঝলমলে দিন। আবহাওয়া উষ্ণ। পার্শ্ববর্তী ঝরনা আর পাহাড় ছুঁয়ে আসা বাতাস কিছুটা ঠান্ডা। বাইরে বসে আমরা রোদ পোহাচ্ছিলাম। আমার পড়া বইয়ের কথা ইমরান আর ইউসুফকে জানালাম। কুরআনে এমন অনেক বৈজ্ঞানিক তথ্য আছে যেগুলো তৎকালীন মানুষের জানা ছিল না। এমন অনেক কিছু যেগুলো এই কিছুকাল আগের বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেছেন। এই যেমন কুরআনে আছে গ্রহগুলো সূর্যের চারদিকে ঘুরছে।

'কথা সত্যি' ইমরান গর্বভরে বলল। 'তোমাদের জার্মান বিজ্ঞানী জন কেপলার[২৩] সতের শতকে এসে আবিষ্কার করেছেন গ্রহগুলো সূর্যকে কেন্দ্র করে ঘুরছে।'

ইউসুফ যোগ করল, 'কুরআন আরও বলেছে কী করে পাহাড়গুলোকে জমিনের মধ্যে গেঁথে দেয়া হয়েছে। যার মাটির নিচের গভীরতা মাটির উপরের অংশের চেয়ে কম নয়।'

ইমরান দারুণ উৎসাহের সাথে বলল, 'আজ পর্যন্ত এমন কোনো প্রতিষ্ঠিত বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার নেই, যা কুরআনের সাথে সাংঘর্ষিক। পরিষ্কারভাবে এটা কুরআনের অলৌকিকতা।'

পাকিস্তানের যেখানেই আমি গিয়েছি, মানুষ আগ্রহ নিয়ে ধর্ম নিয়ে আলোচনা করেছে। মানুষেরা আমাকে ব্যাখ্যা করত, ইসলাম অত্যন্ত সহজ একটি ধর্ম। এর অনুসরণ খুবই সহজ। পাকিস্তানের মুসলিমদের মতো করে ধর্মের প্রতি এতটা ভালোবাসা আমি আর কারও মধ্যে অনুভব করিনি। লন্ডনে যাদের সাথে দেখা হতো, তারা সচেতনভাবে ধর্মীয় আলোচনা এড়িয়ে যেত। যেন পার্টিতে, খাবার টেবিলে এ নিয়ে আলোচনা করতে যাওয়াই অনুচিত। এ আলোচনা যেন পরিবেশ নষ্ট করে। সবাই ভাবে, এ আলোচনা অন্য সময়ের জন্য তোলা থাক।

কুরআন ও বাইবেলের আরেকটা বড় পার্থক্য সম্পর্কে আমি জানলাম। যখন আল্লাহর পক্ষ থেকে রাসূলের ﷺ উপর কুরআন নাযিল হয়, সাহাবিরা সাথে সাথে বিভিন্ন জিনিসে তা লিখে রাখতেন। সেই থেকে আজ পর্যন্ত কুরআনের কোনো বাণীর পরিবর্তন হয়নি। মুসলিমদের কাছে কুরআন পুরোটাই আল্লাহর বাণী।

www.pathagar.com

অন্যদিকে বাইবেল অনেক পরে লিখা কিছু ঘটনা আর বর্ণনার সংকলন। এর লেখকও অনেক। লন্ডন ফিরে আমি এবার মনোযোগ দিয়ে বাইবেলের পাতা উল্টাই। মনে হলো এর ভেতরে ভুল-ভ্রান্তি থাকা অস্বাভাবিক নয়। বাইবেলে আছে, এক নবি মাতাল হয়ে তার মেয়ের সাথে শারীরিক সংসর্গ করেছেন।[২৪] আমি অবাক হলাম।

একজন নবি কী করে এমন কাজ করতে পারেন?

পূর্ব-পশ্চিমের দ্বন্দ্ব

দিনে দিনে ইমরানের ব্যস্ততা আরও অনেক বেড়ে গেল। হাসপাতাল নিয়ে জটিলতা দেখা দিল। নতুন নতুন সমস্যা, নতুন নতুন চ্যালেঞ্জ। হাসপাতালের উদ্বোধনও গেল পিছিয়ে। লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ইমরান আরো বেশি দৌড়ঝাপ করতে লাগল। আগের চেয়ে সামাজিক পার্টিতে যাওয়া অনেক কমিয়ে দিল। খুব ঘনিষ্ঠ এবং পরিচিত কেউ না হলে সাধারণত যোগ দিতে চাইত না।

এমনই একটা পার্টিতে আমিও গেলাম। বাইরে পত্র-পত্রিকা আর চ্যানেলের রিপোর্টাররা হাজির। পাপারাজ্জিরাও আছে। আমরা দুজন খুব সতর্কতার সাথে আলাদা আলাদা গেলাম। দরজা দিয়ে ঢোকার মুখে একজনকে ফিসফিস করতে শুনলাম, 'হ্যাঁ, এসে গেছে। সেও নিশ্চয় আগ থেকেই ভেতরে আছে।'

ইমরান দিনে দিনে রাতভর চলা এই সব পার্টির উপর আগ্রহ হারিয়ে ফেলল। এই সব পার্টিতে রাত বাড়লেই শুরু হয়, মদ খাওয়া, মাদক নেয়া, একে অন্যকে গালিগালাজ, বকাবকি। এর চেয়ে ইমরান পাকিস্তানে থাকাটাই বেশি পছন্দ করত। তার মনে হতো তার দেশের তাকে প্রয়োজন। সে লন্ডনেও আগের চেয়ে অনেক কম থাকত। তার সময় কাটত ভারতসহ মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে ঘুরে ঘুরে। হাসপাতালের প্রচারণা চালিয়ে।

আমি ইমরানকে খুব মিস করতাম। কিন্তু কিছু বলতাম না। বরং একটা আদর্শিক ও মহৎ কাজের পেছনে তার এই উদ্যম, তার এই ছোটাছুটি নিয়ে আমার গর্বই হতো।

আমিও আমার কাজ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। MTV-র পাশাপাশি আমি Bravo TV তেও অনুষ্ঠান করছিলাম। এ সময় আমার জীবনে গুরুত্বপূর্ণ কিছু ঘটনা ঘটে। সে সময় বিখ্যাত দুটো অ্যাওয়ার্ড দেয়া হয় আমাকে।

www.pathagar.com

সেটা শুনে ইমরান আমাকে অভিনন্দন জানাল। যদিও আমি জানতাম আমার কাজকে ইমরান খুব একটা পছন্দ করে না। কখনও কখনও সে আমাকে বলত, MTV-তে যে গানগুলো প্রচার হয়, সেগুলো যুব সমাজকে ধ্বংস করে দিচ্ছে, সমাজকে করছে দূষিত। এমন কী পাকিস্তানের মতো রক্ষণশীল সমাজেও ভাঙন ধরাচ্ছে।

পাকিস্তানেও ততদিনে চ্যানেলটি জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। একবার পাকিস্তান এয়ারপোর্টে নামার পর বেশ কয়েকজন আমার অটোগ্রাফ নিতে আমার দিকে এগিয়ে এলেন। আমি তো অবাক! এরাও আমাকে চিনে?

একবার সিন্ধু প্রদেশের প্রায় মরু এক এলাকায় গিয়েছিলাম। আমরা এক তাঁবুর ভেতরে বসেছিলাম চা খেতে। গিয়ে দেখি, কয়েকজন লোকের হাত পা পিছ মোড়া করে বাঁধা। চোখ দুটো কালো কাপড়ে ঢাকা। আমি জানতে চাইলাম, এরা কারা? ইমরান আমাকে বলল, এরা ডাকাত। ধরা পড়েছে। কিছুক্ষণ পরে এদের মেরে ফেলা হবে। এ অঞ্চলে সরকারের আইন চলে না। জনসাধারণ নিজেরাই বিচার করে। মানুষ মনে করে, দেশের আইন-কানুন বলে কিছু নেই। আইনের শরণাপন্ন হলে কখনোই এদের বিচার হবে না। দুদিন পরে ছাড়া পেয়ে এরা বেরিয়ে আসবে।

ভয়ে আমার গা শিউরে উঠল! এ কোনো জগতে এলাম আমি! চা বিস্কুট খেতে খেতে দেখি দোকানদার টিভি ছেড়ে দিয়েছে। আমি অবাক হয়ে গেলাম, এই প্রত্যন্ত মরু অঞ্চলেও MTV পৌঁছে গেছে। টিভির অনুষ্ঠান দেখে আমার নিজেরই লজ্জা লাগছিল। এই রক্ষণশীল পরিবেশের মধ্যে টিভিতে মেয়েরা স্বল্প পোশাকে আবেদনময়ী নাচ নাচছে। আর বাইরে বেঁধে রাখা ডাকাতেরা মৃত্যুর প্রহর গুনছে।

বাস্তবতা হলো, চ্যানেলের অনুষ্ঠানে যৌনতা আর মানুষের সে বোধ উস্কে দেয়ার মতো অঙ্গভঙ্গি প্রচার করা হয়। ইমরান বলত, এটা হলো সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদ[২৫]। এভাবেই এই অনুষ্ঠানগুলো মানুষের ঘরে ঘরে ঢুকে সামাজিক মূল্যবোধ ধ্বংস করে দিচ্ছে।

'কেন, তোমরা তরুণদের দায়িত্ববোধ, সম্মান, বিনয় আর মার্জিত বোধ চ্যানেলের মাধ্যমে শেখাতে পার না?' ইমরান প্রায় আমাকে এই প্রশ্ন করত।

ইমরানের পরিবেশ আমার থেকে ভিন্ন। তাই তার দেখার দৃষ্টিও আমার থেকে আলাদা।

www.pathagar.com

'MTV হলো বিনোদনের দুনিয়া। তুমি এটাকে এত সিরিয়াসলি নিতে পার না। তাছাড়া এর কিছু কিছু ভিডিও আসলেই শৈল্পিক মান সম্পন্ন' আমি ইমরানকে বললাম।

আমি নিজেও চ্যানেলের অনুষ্ঠানগুলোকে সমালোচকের দৃষ্টিতে দেখা শুরু করলাম। বিশেষ করে হিপ হপ ভিডিও, গানের ভাষায় আজেবাজে শব্দের ব্যবহার আমাকে ভাবিয়ে তুলল। আমার মনে হলো, 'তাই তো, আমাদের অনুষ্ঠান দেশ- বিদেশের লাখো তরুণ দেখে। আমরা আসলে তাদের কী শেখাচ্ছি?'

আমি আমাদের অনুষ্ঠান বিভাগের প্রধানকে দু-একটা অনুষ্ঠান নিয়ে প্রশ্নও করেছিলাম। তিনি জবাব দিয়েছিলেন, 'এই অনুষ্ঠানগুলো মানুষের কাছে খুবই জনপ্রিয়।'

অর্থাৎ, বাজারে জনপ্রিয় করে তোলাই মূল কাজ। কী শিখলাম আর কী পেলাম, সেটা মোটেও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়।

পশ্চিমা সংবাদ মাধ্যম নিয়েও ইমরান কথা বলত।

'ফিলিস্তিনের মুক্তিকামী জনগণকে বলা হয় সন্ত্রাসী। আর ইসরাইলী বাহিনী, যারা ফিলিস্তিনিদের জমি জবর দখল করে রেখেছে, তাদেরকে মিডিয়া উপস্থাপন করে সৈনিক হিসেবে।' বসনিয়াতে জাতিসংঘের ভূমিকা নিয়ে সে ক্ষোভে ফেটে পড়েছিল। মুসলিমদের উপর একের পর এক গণহত্যা চলছে, পুরো সারায়েভো দখল করে ধ্বংসযজ্ঞ চালানো হচ্ছে। অথচ আন্তর্জাতিক সমাজ আছে নীরব দর্শকের ভূমিকায়।

তার কাছ থেকে শোনার পরে আমি পৃথিবীকে একটি ভিন্ন আঙ্গিকে দেখেতে শিখলাম।

ইমরান মনোযোগ দিয়ে কুরআন পড়ছিল। সে চাইত যা শিখছে তাই অন্যদের সাথে শেয়ার করতে, বিশেষ করে আমার সাথে। আমিও আগ্রহ নিয়ে শুনতাম। আমাদের অনেক বিষয় নিয়ে তর্ক হতো। আলোচনা যাই নিয়ে হোক না কেন, ইমরান ঘুরে ফিরে ধর্মের দিকে নিয়ে যেত। তার কাছে ব্যক্তিগত মতামত বলে কিছু নেই। আল্লাহর বাণী, ইসলামের শিক্ষাই আসল।

আমি নিজে কুরআন পড়া শুরু করলাম, যেন ইমরান আমাকে কুরআনের কথা বলে তর্কে হারাতে না পারে। আমি আবিষ্কার করলাম, ইসলামের কিছু কিছু বাণী আমার জীবনের জন্য কত প্রাসঙ্গিক। বিশেষ করে সূরা ইখলাস।

www.pathagar.com

আল্লাহর পরিচয়, তিনি এক অদ্বিতীয়। তার শুরু নেই, শেষ নেই। তিনি সর্বজ্ঞানী, সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা। তার সমকক্ষ কেউ নেই। ইসলামের এই বিশ্বাস হলো তাওহীদ। এই বিশ্বাস ইসলামের সকল শিক্ষার মূল।

যে তাওহীদকে মনে প্রাণে বিশ্বাস করে, আল্লাহর সামনে আনুগত্যের মস্তক নত করে, সে কোনো কিছুর পরোয়া করে না। শক্তি, সামাজিক মর্যাদা, অর্থ-বিত্ত, ফ্যাশন, নাম-যশ-খ্যাতি... কোন কিছুর সামনে সে নত হয় না। সকল কাজে তার চাওয়া পাওয়া থাকে আল্লাহর সন্তুষ্টি। সকল কাজে সে আল্লাহর উপরই ভরসা করে। গভীরভাবে ভেবে দেখলে, এই তো মানুষের সত্যিকারের মুক্তি।

যে আল্লাহ ছাড়া আর অন্য কোনো কিছুর উপাসনা করে, অন্য কিছুর আরাধনা করে, অন্য কোনো কিছুর উপর সুগভীর বিশ্বাস স্থাপন করে, দিন শেষে তাকে তার জন্য অনেক কষ্ট পেতে হয়। কারণ, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো কিছুই নিখুঁত নয়, নয় কিছু শক্তিমান।

আমি লাইভ গানের অনুষ্ঠান করতে গিয়ে আজকের সমাজব্যবস্থা নিয়ে ভাবি। তরুণীদের অনেকেরই তাদের প্রিয় গায়ককে স্টেজে দেখতে পেয়ে উত্তেজনায় মরে যাবার দশা হয়। এটা কি এক ধরনের ব্যক্তি পূজা নয়? আমি নিজেও কি সেটি উস্কে দিচ্ছি না?

বিনোদন দুনিয়ার অনেকেই নিজের তারুণ্য ধরে রাখতে কী না করে। অনেকে প্লাস্টিক সার্জারি করে, নিজেকে সঁপে দেয় চিকিৎসকের কাঁচির নিচে। অনেকে নিজের ঠোঁট বদলায়। অনেকে নিজের দেহের আকর্ষণীয় অংশগুলো আরও আকর্ষণীয় করতে কৃত্রিম জিনিসের সাহায্য নেয়। কেউ নেয় ইনজেকশন। সবাই চায় 'নিজেকে এমন করে ফুটিয়ে তুলতে, যাতে মিডিয়া সুন্দরী, আকর্ষণীয় বলে মাথায় তুলে রাখে।

কিন্তু আপনি যতই চেষ্টা চালিয়ে যান না কেন, কোনো ডাক্তার, ওষুধ আপনার যৌবন সৌন্দর্য ধরে রাখতে পারবে না। সময়ের সাথে সাথে একসময় শরীর ফুরিয়ে যাবে। টিকে থাকবে আত্মা। আত্মা অমর। একমাত্র জান্নাতেই মানুষ হবে চির যৌবনা। তাই বুদ্ধিমানের কাজ হলো আত্মার উন্নতির জন্য কাজ করে যাওয়া।

আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো 'ফ্যাশন'। ইমরান বলত, লম্বা সালোয়ার কামিজ যেটি পাকিস্তানের মহিলারা পরে থাকেন, সত্যিকারার্থে নারীর জন্য মর্যাদাকর ও নিরাপদ। পাশ্চাত্যের আঁটসাঁট, শরীর উন্মুক্তকারী পোশাক নারীর মর্যাদা বাড়ায় না।

www.pathagar.com

পাকিস্তানি নারীরা পাশ্চাত্যের নারীদের চেয়ে শরীর নিয়ে কম হীনমন্যতায় ভোগে। পাশ্চাত্যের নারীরা নিয়মিত খাবার নিয়ন্ত্রণ করে নিজেদের 'স্লিম ফিগার' ধরে রাখতে চায়। এই নিয়েই তাদের রাজ্যের টেনশন।

'ইসলাম নারীদের বাহ্যিক সৌন্দর্য নয়, বরং চারিত্রিক সৌন্দর্য, ভেতরের গুণ আর তাদের বিশ্বাসকেই মূল্যায়ন করে বেশি' ইমরান যোগ করত।

ইমরানের কথাগুলো আমার ভেতরের সত্ত্বাকে নতুন করে ভাবিয়ে তুলত। এত দিন ধরে আমি নিজের বাহ্যিক রূপ সুন্দর করার দিকেই মনোযোগ দিয়ে এসেছি। একজন উপস্থাপিকা হিসেবে আমাকে তাই করতে হয়। আমি নতুন করে ভাবা শুরু করলাম, শুধু বাহ্যিক দিক দিয়ে নয়, সার্বিক দিক দিয়ে কী করে নিজেকে একজন ভালো মানুষ হিসেবে গড়া যায়।

আমার পোশাক-আশাক কিছুটা বদলে গেল। নিচের অংশে আগের চেয়ে লম্বা, কামিজ আগের চেয়ে মার্জিত। MTV-তে আমার সহকর্মীরা শুরুর দিকটায় তেমন কিছু খেয়াল করেনি। সেই সময়ে লম্বা পোশাকের ফ্যাশন চলছিল। 'ফ্যাশন' চলে গেলেও আমি আমার আগের পোশাক চালিয়ে গেলাম। কে চায় শুধু শুধু রাস্তা ঘাটে টিজিং-এর স্বীকার হতে?

আমার কিছু বান্ধবী অবশ্য বলত, তোমার পা দুটো কত সুন্দর ছিল। কিন্তু আজকাল তুমি এমন পোশাক পরো, এত সুন্দর পাগুলো আর দেখাই যায় না। কী লজ্জার কথা! তুমি যে কী করে এখনো এসব সেকেলে পোশাক পরে চল?

আমার সামাজিক জীবনেও পরিবর্তন এল। আগের মতো আর পার্টি কিংবা ক্লাবে যেতে উৎসাহ পেতাম না। তার চেয়ে বাড়ি ফিরে বই পড়া অনেক ভালো। কখনো বান্ধবীদের সাথে গেলেও মজা পেতাম না। লোকজন সেখানে কোনো আলাপ-আলোচনা করতে যায় না। লোকজনের কাজ হলো মদ খেয়ে মাতলামো করা, নয়তো কারও সাথে শুয়ে পড়া। কেউ কেউ নিজেকে উদ্দীপ্ত করতে নানা পিল খেত। তারপরে হঠাৎ আবেগ আপ্লুত হয়ে পাগলের মতো প্রলাপ বকতো। আবার কেউবা হিংস্র হয়ে ঝগড়া-ঝাটি মারামারি বাঁধিয়ে দিত।

নিজের কাছে এই পরিবেশ কেমন জানি লাগত। কারও সাথে খুব গভীর আলাপে জড়াতেও ইচ্ছে হতো না। আমি জানতাম, এই লোকগুলো সকালে ঘুম থেকে উঠেই রাতে কী কথা হয়েছিল সব ভুলে যাবে। তবুও মাঝে মাঝে এসব পার্টিতে গিয়ে নিজেকে সুখী ভাবার চেষ্টা করতাম, কিন্তু পারতাম না।

www.pathagar.com

মনে হতো মুখের উপর মেকি এক মুখোশ পরে আছি। মাঝে মাঝে অনেকের সাথে তাল দিয়ে আমি অনেকখানেই যেতাম। শেষে আমার আফসোসের সীমা থাকত না।

'আরে জানো, ক্রিস্টিন তো পাকিস্তান ক্রিকেট টিমে যোগ দিয়েছে!' আমার বস একদিন MTV-র একটা পার্টিতে ঘোষণা দিল। সবাই অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল। কিন্তু কেউ আমার ইসলামের প্রতি আগ্রহের বিষয়টা জানতে চাইল না, বুঝতে চাইল না।

আমি ইমরানকে আমার সার্বিক অনুভূতির কথা বললাম। ইমরান আমাকে ফার্সি কবি রুমির[২৬] একটা লাইন পড়ে শোনাল–

'নরক পাবে মাস্তি মজায়, রূপের ছায়াতলে
স্বর্গ আছে দুঃখ জ্বালা, কষ্ট মাখা পথে'।

ভেবে দেখলাম, আমার নিজের অবস্থার সাথে অনেকটাই মিলে। যদিও তাকে নরক বলা যায় না। তবে মৌজ মাস্তি মনোহর তো বটেই।

ইমরানের সাথে আমার এখন বিয়ে নিয়ে কথা হয়। হাসপাতালের উদ্বোধনের তারিখ দিনদিন পিছিয়ে যাচ্ছিল। 'আমাদের ভাগ্যের উপর আমাদের কোনো হাত নেই। আমরা আমাদের পক্ষে যা করার তা করতে পারি। কিন্তু কোনো কিছু হওয়া না হওয়া সবই আল্লাহর হাতে। তিনিই উত্তম পরিকল্পনাকারী' ইমরান আমাকে সান্ত্বনা দিত।

দেরি হওয়ায় আমার এক দিক দিয়ে ভালোই হয়েছিল। বড় কোনো সিদ্ধান্ত নেয়ার আগে আমি ইসলাম নিয়ে আরও পড়াশোনা করতে পারব। আমি ভালো করেই জানতাম, ইমরান একজন মুসলিম মহিলাকেই বিয়ে করতে চায়। এটা ঠিক ইসলামে ইহুদি কিংবা খ্রিষ্ট ধর্মের মেয়েদের বিয়ে করার অনুমতি আছে। আমার জন্য মুসলিম হওয়াটা খুব কঠিন কিছু ছিল না। আমি খ্রিষ্ট ধর্মের সিরিয়াস কোনো অনুসারি ছিলাম না।

প্রশ্ন হলো, আমার পক্ষে একজন পশ্চিমা নারী হিসেবে ইসলামিক জীবনযাপন করা সম্ভব কিনা। আমি আমার কাজ চালিয়ে যেতে চাইছিলাম। যদিও আমি জানি, আমার মনের সন্তুষ্টি যেখানে মিলবে, MTV আমাকে সেখানে নিয়ে যেতে পারবে না। এই নতুন ধর্মের মূল্যবোধ আমাকে টানে, এই ধর্ম আমাকে আমার আশেপাশের গণ্ডি পেরিয়েও ভাবতে উদ্বুদ্ধ করে। আমাকে একটি অর্থবহ জীবন গড়তে পথ দেখায়।

কিন্তু পরিপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে আমার আরও সময়ের প্রয়োজন।

www.pathagar.com

ইমরানের সাথে পাকিস্তান গিয়ে জীবনযাপন করা, এই চিন্তায় আমি ঠিক স্বস্তি পাচ্ছিলাম না। এমন যদি হয়, সে সারাজীবন তার হাসপাতাল আর অন্যান্য কাজের পেছনে দৌড়াচ্ছে। হাসপাতাল পুরোদমে চালু হয়ে যাবার পর তার রাজনীতিতে নামার ইচ্ছা আছে। সে চায় একটা দুর্নীতিমুক্ত সমাজ গড়তে। তার ইচ্ছার প্রতি আমার শ্রদ্ধা আছে। কিন্তু সে যত ব্যস্ত হবে, আমি তত একা হয়ে পড়ব। পাকিস্তানের মতো সমাজ যেখানে পুরুষ মহিলা আলাদা আলাদা থাকে, সেখানে আমি আমার নিজেকে ঠিক কল্পনা করতে পারছিলাম না।

আমি জানি না, ইমরান আমার প্রতি অতটা মনোযোগ দিতে পারবে কিনা। এও জানি না, অত দূরে থেকে আমার বাবা-মায়ের সাথেও নিয়মিত দেখা হবে কিনা। ইমরান অবশ্য আমাকে বলত, স্ত্রী হিসেবে আমাকে তাঁর সাথে সাথেই রাখবে। যাতে আমি তার কাজে-কর্মে সাথি হতে পারি। সে তার বোনদের মতোই নারীদের পড়াশোনা ও আলাদা কর্মজীবনে প্রবেশে উৎসাহ দেয়। পাশাপাশি সে এও বলত, ইসলামে পারিবারিক দিক-নির্দেশনা খুবই সুস্পষ্ট। সন্তান হবার পর নারীদের প্রধান দায়িত্ব তাদেরকে সঠিকভাবে গড়ে তোলা। তথাকথিত 'ডে কেয়ার'-এ বাচ্চাদের দিয়ে রাখা নয়। কারণ, বাচ্চারা আমাদের ভবিষ্যৎ। সঠিকভাবে মায়ের সাহচর্য পেলে বাচ্চারা মানসিকভাবেও বিকশিত হয়।

পাশ্চাত্যে আজ পরিবার প্রথা অনেকাংশেই ভেঙে পড়েছে। এ নিয়ে সে কঠোর সমালোচনা করত। 'পাকিস্তানে পরিবারই হলো সমাজের প্রাণ। এখানে কোনো বীমা কিংবা ইনস্যুরেন্স সিস্টেম নেই। প্রজন্মের পর প্রজন্ম একই ছাদের নিচে তারা বাস করে। প্রয়োজনের সময় কেউ না কেউ এগিয়ে আসে। কোনো বাচ্চার মা না থাকলে কোনো খালা কিংবা ফুফু তাঁর দায়িত্ব নেয়। এভাবেই বর্তমান প্রজন্ম তার আগের প্রজন্মের দেখাশোনা করে।'

পাকিস্তানের পারিবারিক প্রথা আমার ভালো লাগত। আমি তো দেখেছি পাশ্চাত্যে পরিবারগুলোর কী অবস্থা। অনেক বাবা-মা-ই চান, সন্তান বড় হলে নিজ থেকেই যেন বাসা ছেড়ে চলে যায়। থাকতে হলে, ঘর ভাড়া দিয়ে থাকতে হবে। পাকিস্তানের অভিজ্ঞতা আর কুরআনের শিক্ষা থেকে আমার মনে হলো, পরিবার আসলেই গুরুত্বপূর্ণ। আমি যেখানে যে অবস্থায় থাকি না কেন, একটা সুন্দর পরিবার গঠনের চেষ্টা করে যাব, এই ছিল আমার ইচ্ছা।

মুসলিম সমাজের নারী পুরুষের ভূমিকা নিয়ে আমার দ্বিধা ছিল। মনে হতো নারীদের সব ক্ষেত্রেই অনেক বেশি ছাড় দিতে হয়। ইমরান আমাকে বুঝাল, 'মুসলিম সমাজে সন্তান লালনপালন কোনো বোঝা নয়, সম্মানের।

www.pathagar.com

আমাদের নবি ﷺ বলেছেন, জান্নাত মায়ের পায়ের নিচে অবস্থিত। কিন্তু পাশ্চাত্যে? সেখানে সন্তান লালনপালন আর গৃহিণীর কাজকে ছোট আর অবজ্ঞা করে দেখা হয়। একজন নারীর শুধুই মা আর গৃহিণী হওয়াটা পাশ্চাত্যের চোখে নিতান্তই মূল্যহীন কাজ।'

তার কথায় কিছুটা হলেও সত্যতা আছে। আমি দেখেছি অনেক মহিলারা ঘরের কাজে উদয় অস্ত পরিশ্রম করে। কিন্তু তার স্বীকৃতি পায় না। সমাজ তাকে মূল্যায়ন করে না। আমার তবুও সন্দেহ হচ্ছিল, সারাদিন ঘরে বসে রান্না করা আর বাচ্চা লালন-পালন ঠিক সেভাবে যথাযথ কিনা, অন্তত ইমরান যেমনটা বলছে। আর যদি হয়ও, তার জন্য স্বামীদের খুবই শক্ত সহযোগিতা দরকার।

তবে তার কথাগুলো আমার মনে বাজছিল। হাজার হোক সে আর আমি দুজনেই পারিবারিক ভালোবাসার মধ্য দিয়ে বড় হয়েছি। আমার শুনতে ভালো লেগেছে যে, ইসলাম নারীদের ভূমিকাকে কতখানি গুরুত্ব দেয়। উপার্জনের মূল দায়িত্ব পুরুষদের। অথচ পাশ্চাত্যে নারীদের একদিকে চাকুরি করতে হয়, সংসার সামলাতে হয়, অন্যদিকে ঘরের সব কাজও করতে হয়। ঘরে-বাইরে দুজায়গায় কাজ করতে করতে বিধ্বস্ত হবার মতো অবস্থা।

ইমরান আমার সাথে ইউসুফ ইসলামের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়। ইউসুফ ইসলাম একসময় Cat Stevens নামে গানের জগতে খুব বিখ্যাত ছিল। তিনি তার এক বন্ধুসহ আমাদের সাথে দেখা করতে আসেন। দুজনের মুখেই বিশাল দাড়ি, গায়ে লম্বা জুব্বা। দুজনের কেউই আমার সাথে হাত মিলাননি। আমি অবশ্য পাকিস্তানে থেকে এই প্র্যাকটিসের সাথে মানিয়ে নিয়েছিলাম। ইসলাম নিয়ে তারা কথা বলা শুরু করলেন। আমার খুব ইচ্ছে হচ্ছিল, ইউসুফের সাথে গান নিয়ে কথা বলি। জানতে চাই, তিনি কী করে ইসলামের পথে এলেন।

আবার ভাবলাম, থাক-না জানি কী মনে করেন। আমি তাকে কুরআনের সে আয়াত নিয়ে প্রশ্ন করলাম, যা আমার কাছে অস্বস্তিকর বলে মনে হচ্ছিল (৪ঃ৩৪) 'যদি তুমি তাদের কাছ থেকে অবাধ্যতার আশংকা কর, তবে তাদের সতর্ক কর, বিছানা আলাদা করে দাও, এরপরে প্রহার কর' এ যেন মুসলিম পুরুষদের স্ত্রীদের মারার ফ্রি লাইসেন্স দিয়ে দিয়েছে।

ইউসুফের সঙ্গী আমাকে বললেন, 'খুব ভয়ংকর কোনো অপরাধ যেমন কুফরী করা ইত্যাদির ক্ষেত্রে এ আয়াত প্রযোজ্য। এর মানে এই নয় প্রতিদিন ছোটখাটো কোনো মতপার্থক্য হলেই স্বামী-স্ত্রীকে মারা শুরু করবে।

www.pathagar.com

মূলত স্বামী-স্ত্রী মিলে মিশে থাকার জন্য তাদের সর্বোচ্চ চেষ্টা করবে। যদি কোনোভাবেই মতের মিল না হয়, আর স্ত্রী যদি বিরুদ্ধে চলে যায়, তাহলে স্বামী-স্ত্রীকে মারতে পারবে। তাও যেনতেন ভাবে নয়। এই যেমন ধরুন, প্রতীকীভাবে খবরের কাগজ কিংবা টুথব্রাশ দিয়ে। তাকে ব্যথা পাবার মতো আঘাত করা যাবে না। আর চেহারায় তো অবশ্যই নয়।'

এই উত্তর আমাকে পুরোপুরি সন্তুষ্ট করতে পারেনি। ইমরান আমাকে বলল, 'দেখ! কুরআনের আয়াতকে তার পূর্বাপর প্রসঙ্গ ছাড়া বুঝতে যেয়ো না। যদি কোনো আয়াতের অর্থ বুঝতে তোমার কষ্ট হয়, তবে আপাততঃ সেটি রেখে দাও। মনে রেখ, নারী-পুরুষ দুটোই আল্লাহর সৃষ্টি। আল্লাহর কাছে উভয়েই সমান। শুধু দুনিয়াতে তাদের কর্মক্ষেত্র আলাদা।'

পরবর্তী সময়ে আরেক আধুনিক মুসলিম মহিলা রুবির সাথে আমার কথা হয়। তাঁর সাথেই কথা বলে আমার মনের ভেতরের অস্বস্তি দূর হয়ে যায়।

সুখের ঘরে তুষের আগুন

আমি যেন দুই পৃথিবীতে দু ধরনের জীবনযাপন করে চলছিলাম।

একদিকে আমার সঙ্গীত, গান, লাখো তরুণের কাছে আমি বিশেষ আইকন। গানের রেকর্ডিং করছি, বিভিন্ন অনুষ্ঠানে উপস্থাপনা করে যাচ্ছি, দেশ-বিদেশ ঘুরে বেড়াচ্ছি। যেখানেই যাচ্ছি লোকজন আমাকে দেখে এগিয়ে আসছে, সম্মান জানাচ্ছে।

আর অন্য দুনিয়ায় ইসলাম আর ইমরান। লন্ডনে ইমরানের বন্ধু-বান্ধব আর পাকিস্তানে যাওয়া-আসার মধ্য দিয়ে ইসলামকে আরও গভীরভাবে জানা। আমিও যেন দিনে দিনে ভিন্ন এক জগত আবিষ্কার করে চলেছি।

যদিও আমি আমার কাজকে আগের চেয়ে অনেক বেশি সমালোচকের দৃষ্টিতে দেখতাম। কিন্তু আমার কাজকে উপভোগ করে যাচ্ছিলাম। পাশাপাশি ইসলাম নিয়ে আমার আগ্রহ দিনে দিনে বাড়ছিল। আমাদের জীবনের একটা মহৎ উদ্দেশ্য আছে। তার জন্য ধৈর্য ধরে কাজ করে যাওয়া, নিজের ভাগ্যকে মেনে নেয়া, ধর্মের এই শিক্ষা আমাকে উদ্বুদ্ধ করেছিল।

১৯৯৩ সালে বড়দিনের উৎসবের পর আমি আর সুসান আবার লাহোরে যাই। ইমরান আমাদেরকে এয়ারপোর্ট থেকে তার বাড়িতে নিয়ে যায়।

www.pathagar.com

ইমরান তার বাবার বাসার উপরের তলায় থাকত। ইমরান যখন কাজ করত, আমি আর সুসান ব্যালকনিতে বসে চা খেতাম আর গল্প করতাম।

সুসান তার স্বামীর সাথে ইতালির মিলানে থাকত। দুজন মিলে ডিজাইনের কাজ করত। সুসান আমি দুজনেই ছিলাম যার যার কাজে মহাব্যস্ত। দুই বোনের দেখা করার সুযোগই হতো না। দেখা না হলেও দুবোনের সম্পর্ক ছিল চমৎকার। আমাদের পছন্দেরও অনেক মিল ছিল। বড়দিনের উৎসবে দুবোন তো একে অন্যকে পেয়ে মহাখুশী। তাকিয়ে দেখি দুজন একই ডিজাইনের কোট পরে আছি। ও কিনেছে মিলান থেকে, আর আমি লন্ডন থেকে।

সুসান কিছুটা দ্বিধায় ছিল, ইমরানকে পছন্দ করে আমি আসলে ঠিক কাজ করেছি কিনা। সুসান দেখল ইমরান কীভাবে আমাদের দুজনের খেয়াল রাখে। অনেক সিদ্ধান্ত নিতে আমি তার উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছি। সে তো অবাক। সে তো জানে, আমি কী রকম স্বাধীনচেতা। তার কাছে মনে হলো, এ ক্রিস্টিন তার চেনা ক্রিস্টিন নয়।

সেবারে ইমরানের তিন বোনের সাথে আমাদের দেখা হয়। চা আর সমুচা খেতে খেতে আমরা গল্প করছিলাম। তিন বোনের একজন ছিলেন ডাক্তার, একজন ইউনিভার্সিটিতে পড়ছে। আর আরেকজন ইউনিভার্সিটি থেকে পাস করেছে। এখন পুরো দস্তর গৃহিণী। তাদের স্বামীরা তাদের কাজে উৎসাহ দেয়।

আমি তাদেরকে ইসলামে নারীদের ভূমিকা নিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম। তারা জোর দিয়ে বললেন, 'ইসলাম সেই সপ্তম শতকেই নারীদের কী পরিমাণ অধিকার দিয়েছে। স্ত্রীর ভরণ-পোষণের দায়িত্ব স্বামীর। এমন কী স্বামী যদি খুব অভাবী হয়, আর স্ত্রী হয় রাজরানী, তবুও স্বামী তার দায়িত্ব এড়াতে পারে না। কোনো নারী যদি উপার্জন করে, পুরো টাকাটাই তার। সে সংসারে দিতে বাধ্য নয়। পাশাপাশি নারীদের সম্পদ অর্জন ও হস্তান্তরের পূর্ণ অধিকার আছে। তার অধিকার আছে স্বাধীন কোনো আদালতে দাঁড়িয়ে আত্মপক্ষ সমর্থন করার।'

পশ্চিমা নারী হিসেবে শেষের অংশ আমার কাছে ভালো লেগেছিল। মূলত একজন মানুষ হিসেবে এটা একজন নারীর মৌলিক মানবাধিকার। আমি ভাবছিলাম, ভোট দেয়ার অধিকারসহ সম্পদের অধিকার পাশ্চাত্য এই সেদিন নারীদের দিয়েছে। অথচ ইসলামে এই অধিকার প্রথম থেকেই ছিল।

পাকিস্তানে যত নারীর সাথেই আমার দেখা হয়েছিল, সবাই আমাকে বলেছিলেন নারীর উপর নির্যাতন আর তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা, এসবই জাহেলী আচরণ।

www.pathagar.com

একজন মুসলিম পুরুষকে অবশ্যই তার স্ত্রীর সাথে সে আচরণ করা উচিত, ঠিক যেমনটা মুহাম্মাদ ﷺ করেছিলেন উনার স্ত্রীদের সাথে। উনার স্ত্রীরা সবাই দৃঢ় ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন। প্রত্যকেই সমাজে সক্রিয় ভূমিকা রেখেছিলেন।

তারা আমাকে বললেন, ইসলামের অন্যতম উল্লেখযোগ্য নারী হলেন খাদিজা (রা.)। তিনি ছিলেন রাসূলের প্রথম স্ত্রী। খাদিজা ছিলেন সম্পদশালী ব্যবসায়ী। তিনি তার চাইতে ১৫ বছরের ছোট মুহাম্মাদ ﷺ কে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। রাসূলের উপর অহি নাযিল হবার পরে তিনি সাথে সাথে উনার উপর ঈমান এনেছিলেন। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি তার শক্তি সম্পদ দিয়ে এবং নির্ভরতা হয়ে রাসূলের পাশে ছিলেন।

খাদিজার ইন্তেকালের পর নবিজী আয়েশা (রা.)-কে বিয়ে করেন। আয়েশা (রা.) ছিলেন বয়সে স্ত্রীদের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ। তিনি ছিলেন বিদুষী এক মহিলা। নবিজীর মৃত্যুর পর তিনি ছিলেন উম্মাতের অন্যতম প্রধান শিক্ষক। উনার কাছ থেকে অসংখ্য হাদিস বর্ণিত হয়েছে। সাহাবিরা কেউ রাসূলের কোনো কথা কিংবা আমল বুঝতে ভুল করলে তিনি সাথে সাথে শুধরে দিতেন। এ নিয়ে মোটেও দ্বিধা করতেন না।

'তা তো বুঝলাম। কিন্তু সে তো ১৫০০ বছর আগের কথা। আজকের দিনে নারীরা এই ভূমিকা রাখে কি?' আমি প্রশ্ন করলাম।

'আজকের দিনেও নবিদের স্ত্রীরা আমাদের জন্য প্রাসঙ্গিক' ডাক্তার বোনটি উত্তর দিলেন। 'তারা আমাদের শিখিয়েছেন নারীরা কী করে আত্মমর্যাদাশীল হতে পারে। পারে সমাজে, পরিবারে, সক্রিয় ভূমিকা রাখতে। নারীদের জন্যও পুরুষদের মতো করেই দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত জ্ঞান অর্জন করা উচিত।'

পাকিস্তানে অনেক মহিলার সাথেই আমার কথা হয়েছে। যারা ঘরে-বাইরে সমান সক্রিয়।

তবে মুদ্রার উল্টো পিঠও আছে। এমন মহিলাদেরও দেখেছি যাদের অভাব নেই, কিন্তু আত্মমর্যাদাবোধের কমতি আছে। একবার ইমরানের এক পরিচিত লোকের বাড়িতে যাই। চা খেতে খেতে আমরা গল্প করছিলাম। সে ভদ্রলোকের স্ত্রী শূন্য চোখে তাকিয়ে ছিলেন। আমাদের সাথে কোনো আলোচনায় তিনি অংশ নেননি। মহিলাকে দেখে মনে হচ্ছিল তিনি খুব হতাশায় ডুবে আছেন। স্বামীটাকে মনে হলো, তিনি স্ত্রীর উপর খুবই কর্তৃত্ব খাটান।

www.pathagar.com

ইম্বেসাড আর সামিনা নামে দুজনের সাথে আলাপ হলো। একজন থাকেন লাহোরে, আরেকজন ইসলামাবাদে। তারা প্রায়ই পাকিস্তানি পুরুষদের নিয়ে বিস্তর অভিযোগ করতেন। 'স্বামীগুলো আস্ত স্বার্থপর। যখন মন চায়, আসে যায়। স্ত্রীরা মাঝে মাঝে রাতের খাবার নিয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা বসে থাকেন, তবুও তেনাদের আসার নাম নেই। কখনও রাত করে বাড়ি ফিরে এসে বলে, খেয়ে এসেছি। বউ যে এতক্ষণ না খেয়ে বসে থাকল, তার কোনো মূল্যই নেই। সব দোষ ঐ শ্বাশুড়িদের। লাই দিয়ে দিয়ে ছেলেগুলোকে একেবারে মাথায় তুলেছেন। এ কারণেই তো এই অবস্থা' তারা রাগে ফোঁসফোঁস করতেন।

একই ধরনের অভিযোগ আমি ইউরোপেও শুনেছি। স্বার্থপর স্বামী আর নির্যাতিত বউ আসলে পৃথিবীর সবখানেই আছে। তার পেছনে কারণও অনেক। বেড়ে উঠার পরিবেশ, সংস্কৃতি, ধর্মীয় পটভূমি থেকে ব্যক্তিগত ত্রুটি। কখনো কখনো এই সবকিছুই একসাথে ভূমিকা রাখে।

দিনে দিনে আমি বই পোকা হয়ে গিয়েছিলাম। সুযোগ পেলেই বইয়ের ভেতরে ডুবে যেতাম। আমি প্রাচ্য-পাশ্চাত্য দুঅঞ্চলের লেখকদের বই পড়তাম। ইমরান আমাকে 'Islam and the Destiny of Man' বইয়ের লেখক Gai Eaton -এর সাথে দেখা করিয়ে দিল। তার লেখা বইটা আমার আসলেই অনেক ভালো লেগেছিল। প্রাচ্যের শিকড় থেকে ইউরোপের ইতিহাস, সংস্কৃতি-এই বইয়ে লেখক ইসলামের প্রভাব নিয়ে অনেক বিস্তারিত লিখেছেন।

গাইয়ের সাথে কথা বলে অল্পক্ষণের মধ্যে আমার তাকে ভালো লেগে যায়। ইমরান তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, কী করে সে ইসলামে এল।

'আমি সব সময় দর্শনে খুব আগ্রহী ছিলাম' গাই বলা শুরু করল। 'আমি অনেক দার্শনিকের জীবনী পড়েছিলাম। কিন্তু তাদের জীবন ও দর্শন থেকে আমার বাস্তব জীবনের সাথে মিল খুঁজে পাইনি। তাদের কথাগুলো তাত্ত্বিক। তাদের দর্শন যার যার নিজস্ব বিবেচনা ও অভিজ্ঞতাপ্রসূত। কিন্তু আমার জীবন পরিচালনার কোনো দিক-নির্দেশনা ও কোনো খোরাক এগুলোতে নেই। এ পর্যায়ে ধর্ম গ্রন্থ নিয়ে পড়াশোনা শুরু করি। শেষে আমি যা খুঁজছিলাম, ইসলামে তাই পেয়ে গেলাম।'

'ইসলাম গ্রহণের পর তোমার জীবন বদলালো কী করে?' আমি জানতে চাইলাম।

'প্রথম দিকে মোটেও বদলায়নি' সে হাসল। 'আমি ১৯৫১ সালে মিসরের কায়রোতে আমার শিক্ষক Martin Lings-এর হাতে ইসলাম কবুল করি। এরপরে জ্যামাইকা চলে যাই। জ্যামাইকায় আমি কোনো মুসলিমের দেখা পাইনি।

www.pathagar.com

আমি নিজেও কোনো দিক দিয়েই ভালো মুসলিম ছিলাম না। কিন্তু আমার মনের ভেতরে সত্যের বীজ রোপন হয়ে গিয়েছিল।'

গাইয়ের কথা বলার ধরণ ছিল খুব প্রাণবন্ত, দিলখোলা। আমার মনে হয়েছিল, তার সাথে মন খুলে কথা বলা যায়। আমি তাকে বললাম, ইসলামের শিক্ষা নিয়ে আমি মুগ্ধ। কিন্তু আনুষ্ঠানিকভাবে ইসলাম গ্রহণ করতে আমি ভয় পাচ্ছি। আমি যদি সঠিকভাবে সব বিধি-বিধান মানতে না পারি?

'রাতারাতি কেউ পরিপূর্ণ মুসলিম হয়ে উঠতে পারে না' সে হাসিমুখে বলল। 'ইসলামের গভীরে যেতে পারা একটা দীর্ঘ সময়ের ব্যাপার। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত এই সাধনা শেষ হবে না। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, প্রতিদিন নিজের আয়নাতে নিজেকে দেখা। আর ভাবা, কী করে নিজেকে আরও উন্নত করা যায়।'

'কুরআন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উপর নাযিল হয়েছে ২৩ বছর ধরে' সে বলে চলল। 'যাতে তাঁর আশেপাশের মানুষ নিজেদের ধীরে ধীরে শুধরে নিতে পারে। আল্লাহ কখনই বলেননি, রাতারাতি সব বিধি-বিধান মেনে চলতে।'

গাইয়ের কথাগুলো ছিল উৎসাহ ব্যাঞ্জক। গাইয়ের সাথে আলোচনার পর আমি আরও বেশি করে উপলব্ধি করলাম, ইসলাম শুধুই বুদ্ধিবৃত্তিক দর্শন নয়। এটা হলো একটা জীবন পদ্ধতি, যা মানুষকে আল্লাহর আরও কাছে নিয়ে যায়। আমার কাছে মনে হলো, আমি নিজেও তার কিছু কিছু নিজের জীবনে বাস্তবায়ন করে দেখতে পারি। অনেক বড় কিছু না হলেও, এই ছোট ছোট জিনিস। আমি আমার জার্মান টিভি শোতে তরুণদের বললাম, তারা যেন তাদের দাদিকে দেখতে যায়। আমি পরিবেশ নিয়েও কথা বললাম। আমার এই আবেদন ভালোই সাড়া ফেলল। জানি না, আসলেই কেউ তাদের দাদিকে দেখতে গিয়েছিল কিনা।

হাসপাতাল উদ্বোধনের দিন যতই এগিয়ে আসতে লাগল, ইমরান তত বেশি ব্যস্ত হয়ে পড়ল। আমি খুব কমই তার দেখা পেতাম। ইমরান আমাকে বলল, তার অনুপস্থিতিতে আমি যেন তার লন্ডনের ফ্ল্যাটটি নিজের মতো করে সাজাই। যাতে বিয়ের পর দুজন একসাথে সুন্দর সময় কাটাতে পারি। আমি সানন্দে রাজি হলাম।

সময়গুলো দ্রুতই কাটছিল। ইমরানের সাথে আমার যোগাযোগ অনেক কমে গেল। একটি মানবিক ও মহৎ কাজের পেছনে সে ব্যস্ত। তাই এ নিয়ে আমিও আর খুব একটা উচ্চবাচ্য করিনি। ভাবলাম, প্রয়োজনে না হয় আমি তার জন্য একটু নিজের আনন্দকে বিসর্জন দিলাম!

www.pathagar.com

১৯৯৪ সালের এক সেপ্টেম্বরে আমি যখন পাকিস্তানে গেলাম, অনুভব করলাম কোথাও কিছু একটা গড়বড় হয়েছে। ইমরান যেন কিছুটা অন্যমনস্ক, আনমনা। আমি তাকে জিজ্ঞেসও করেছিলাম। সে এটা সেটা বলে পাশ কাটিয়ে গেল।

পাকিস্তান থেকে আমি সোজা উড়ে গেলাম বোস্টনে। বিখ্যাত ব্যান্ড Rolling Stone সহ আরও কয়েকজনের ইন্টারভিউ নিলাম। সময়টা ভালোই কেটেছে। আমার খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু মিকের সাথেও দেখা হলো। মিক ইমরানের ব্যাপারে জানতে চাইল। আমি বললাম, আমি সোজা পাকিস্তান থেকে উড়ে এসেছি। ইমরান গত দুবছর ধরেই বিয়ের কথা বলে আসছে। কিন্তু হাসপাতাল উদ্বোধনের আগ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে চাচ্ছে।

মিক আমার কথাটাকে সিরিয়াসলি নেয়নি। আমাকে বলল, আমি যেন গোটা সম্পর্ক আর সার্বিক অবস্থা নিয়ে ভালো করে ভাবি। বিশেষ করে ইউরোপিয়ান মানসিকতা নিয়ে পাকিস্তানি সমাজে নিজেকে মানিয়ে নেয়া অনেক কঠিন ব্যাপার।

আমি বললাম, আমার তো ভিন্ন অভিজ্ঞতা ভালোই লাগে। পাকিস্তানি সমাজে ভিন্ন কিছুর স্বাদ পেলে মন্দ কী।

মিক আমার কথায় খুব একটা আশ্বস্ত হলো না। 'তুমি জান না ইমরানের খ্যাতি কী রকম?'

আমি খুব ভালোভাবেই জানতাম। কিন্তু মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতাম, ইমরান আন্তরিকভাবেই আমাকে বিয়ে করতে চাইছে। মিককে সে কথা বলতেই মিক আমার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে চুপ করে রইল। তার সেই নিরবতাই যেন অনেক কথা বলে গেল।

আমার মনের কোণে মিকের কথাটা বাজতে থাকল। যে স্বপ্নে বিভোর হয়ে আমি আকাশে ভেসে বেড়াচ্ছিলাম, মনে হলো মিকের কথা আমাকে নামিয়ে আনলো বাস্তবের মাটিতে। বাস্তবতা নিয়ে আমি আসলেই গভীর করে ভাবা শুরু করলাম।

সে বছর নববর্ষ কাটলো ইমরানকে ছাড়াই। ইমরান নববর্ষ উদযাপন করত না। সে ছিল পাকিস্তানে। পাকিস্তানে এটা মুসলিমদের কোনো উৎসবের মধ্যে পড়ে না।

সে বছরের বসন্তেই ঘোষণাটা এল। আমার কাছে এ ছিল বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতো। ইমরান জানাল, তার এক আধ্যাত্মিক গুরু নাকি বলেছেন, আমাদের এই সম্পর্কের কোনো ভবিষ্যৎ নেই।

আমার গোটা পৃথিবী দুলে উঠল। কয়েক মাস ধরে তার সাথে আমার কোনো কথা হয়নি ঠিকই, আমি তার ফ্ল্যাটের কাজ চালিয়ে যাচ্ছিলাম। কত পরিকল্পনা, কত স্বপ্ন।

www.pathagar.com

তার মাঝে কথা নেই বার্তা নেই, হঠাৎ এই খবর। আশা আর হতাশার দোলাচলে আমার জীবনটা এলোমেলো হয়ে গেলে। কখনও তার কথা আমার খুব মনে পড়ত। মনে হতো সব আবার আগের মতো ঠিক হয়ে যাবে। পরক্ষণেই মনে হতো, আমাকে বাস্তববাদী হতে হবে। শরীর মনের উপর এই প্রচন্ড চাপে আমি গভীর অবসাদে ডুবে গেলাম। আমার সারা শরীরে ফুসকুড়ি উঠে গেল। ক্ষুধা নষ্ট হয়ে গেল। আমি খাবার মুখেই তুলতে পারতাম না। বন্ধুরা পরামর্শ দিল, আমি যেন খুব দ্রুত মানসিক ডাক্তার দেখাই।

মানসিক ডাক্তারের নাম ছিল ডাক্তার কক্সন। তার রুমটা ছিল দেখার মতো। খুব সুন্দর করে সাজানো ঘর। বিশাল বিশাল বইয়ের আলমারি। প্রথম দেখায় ডাক্তারের চেম্বারের চেয়ে কারও ব্যক্তিগত রুম বলেই মনে হয়। দেয়াল জুড়ে সুন্দর সুন্দর ক্যালিওগ্রাফি, মধ্যপ্রাচ্যের অনেক সুন্দর সুন্দর হস্তশিল্প। আছে আরব দেশের সুগন্ধী পারফিউম। সব মিলিয়ে পরিবেশটা মুগ্ধ হবার মতো। আমি তাকে একথা বললে, তিনি জানালেন এসবই তার এক আরব রোগীর উপহার।

আমি অবাক হয়ে গেলাম, যখন জানলাম তিনি একজন ধর্মান্তরিত মুসলিম। নীল নয়না, স্বর্ণকেশী, মিষ্টি হাসির এই মানুষটি ঠিক যেন ইংল্যান্ডের বাগানের এক ফুটন্ত গোলাপ। তিনি অনেক সময় নিয়ে আমার কথা শুনে গেলেন। আমাকে সান্ত্বনা দিলেন। আমি যখন বললাম, ইমরান তার এক আধ্যাত্মিক গুরুর কথা মতো আমাদের সম্পর্কের ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবছে, তিনি আমাকে বললেন, আমি যেন আমার অন্তরাত্মার কথা শুনি।

তিনি আমাকে বললেন, তার সাথে তার এক গুরুর মসজিদে যেতে। মসজিদটি ছিল টটেনহামের এক কোনো তুর্কি সম্প্রদায়ের মাঝে। মসজিদ ভর্তি অনেক মানুষ। তুরস্কের লোকই বেশি। তবে তার বাইরে পাকিস্তানি, আরব, ইউরোপিয়ান মুসলিমও আছে।

কক্সন আমাকে সেখানকার ধর্মগুরু শায়খ নাজিমের সাথে পরিচয় করিয়ে দিলেন। তিনি আমার কথা মনোযোগ দিয়ে শুনলেন। বললেন, আমি যেন ধৈর্য ধরি। আল্লাহকে ডাকি। বললেন, সুযোগ পেলে আমি যেন তার ইসলামিক লেকচার শুনতে আবার আসি। আমি তাকে ধন্যবাদ দিলাম। আমি নিশ্চিত ছিলাম না, এই মসজিদে আমার আবার আসা হবে কিনা। ইমরান ছাড়া এমন পরিবেশে এটাই ছিল আমার প্রথম পদক্ষেপ।

এত দিন পর্যন্ত ইসলামের প্রতি আমার অনুরাগ আমি গোপন রেখেছিলাম। জার্মান Bravo TV এর শততম বার্ষিকী সংস্করণ উপলক্ষ্যে আমরা বিরাট অনুষ্ঠানের আয়োজন করি। অনেক মিডিয়া কর্মীদের দাওয়াত দেই। অনেকের সাক্ষাৎকার দেই।

www.pathagar.com

এর মধ্যে এক সাংবাদিক আমাকে প্রশ্ন করে বসল, 'তুমি কি তোমার ছেলে বন্ধুর জন্য ইসলাম গ্রহণ করতে যাচ্ছো?' বোঝাই যায়, সে আমাকে নিয়ে ভালোই গবেষণা করে এসেছে।

আমি আমার মনের কথা বললাম, 'আমি এখনো ইসলাম গ্রহণ করিনি। তবে মনের দিক দিয়ে নিজেকে মুসলিম ভাবি।'

পরের প্রশ্নই হলো, ইমরানের সাথে আমার সম্পর্ক নিয়ে। এ বিষয় নিয়ে আমি কখনই জনসম্মুখে কিছু বলিনি। যদিও খুব রয়ে-সয়ে উত্তর দিয়েছিলাম, পত্রিকাগুলো পরের দিন বিশাল আকারের শিরোনাম করল 'ক্রিস্টিন বেকার': পাকিস্তানের পরবর্তী ফার্স্ট লেডি?'

এক সপ্তাহ বাদে, ইমরান পাকিস্তান থেকে ফোনে আমাকে দোষারোপ করল, আমার নাকি অন্যলোকের সাথে সম্পর্ক আছে। তাই আমাদের সম্পর্ক শেষ। আমাকে নাকি কোনো পুরুষের সাথে ভোরবেলায় দেখা গেছে। আমি তো আকাশ থেকে পড়লাম। আমার দুচোখ দিয়ে অঝোরে অশ্রু ঝরতে লাগল। আমি তাকে বুঝাতে চেষ্টা করলাম, দেখ নিশ্চয় কেউ একজন তোমাকে ভুল বুঝিয়েছে। সম্পর্ক যদি ভেঙেই দিতে হয়, আমরা তো একে অন্যের সাথে আলাপের ভিত্তিতেই করতে পারি। প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ হিসেবে এটাই কি আমাদের জন্য শোভনীয় নয়?

পরিস্থিতি ছিল সব আমার প্রতিকূলে। ইমরানকে আমি গভীরভাবে ভালোবাসতাম। আর সে কিনা আমার উপর মিথ্যা অপবাদ দিল।

ইতোমধ্যে ড. কক্সনের সাথে আমার বন্ধুত্ব হয়ে গেল। আমি ততদিনে তাকে তার মুসলিম নাম 'আমিনা' নামে ডাকা শুরু করলাম। এক সন্ধ্যায় খাবার টেবিলে আমি ইমরানের কথা তাকে বললাম। তিনি মাথা দোলালেন। বললেন, 'কোনো নারীর বিরুদ্ধে মিথ্যে অপবাদ দেয়া কবিরা গুনাহ। আল্লাহ সব সময় মজলুমদের সাথেই আছেন। যখনই কোনো নারীর বিরুদ্ধে এমন অভিযোগ আনা হয়, আল্লাহ তার পাশে থাকেন। তুমি মোটেও মন খারাপ কর না।'

তারপর তিনি আমাকে একটা ঘটনা শুনালেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ যখনই মদিনার বাইরে যেতেন, সাথে করে উনার কোনো না কোনো স্ত্রীকে নিয়ে যেতেন। তাদেরকে উটের হাওদায় বসিয়ে নিয়ে যাওয়া হতো।

হাওদা থাকত পর্দায় ঢাকা। যাতে সূর্যের আলো ও পরপুরুষের দৃষ্টি থেকে তাদেরকে আড়াল করা যায়। একবার এমনই এক সফরে উনার সাথে ছিলেন উনার স্ত্রী আয়েশা (রা.)।

www.pathagar.com

সফরে সাময়িক যাত্রাবিরতির পর কাফেলা যখন আবার যাত্রা শুরুর প্রস্তুতি নিচ্ছিল, আয়েশা (রা.) দেখলেন, তাঁর একটা গলার হার হারিয়ে গেছে। তিনি সেটি খুঁজতে গেলেন। কাফেলা ছেড়ে উনার বেরিয়ে যাওয়া কেউ খেয়াল করেনি।

আয়েশা (রা.) ফিরে এসে দেখেন কাফেলা তাকে ফেলে চলে গেছে। তিনি সেখানেই বসে রইলেন। ভাবলেন কেউ না কেউ নিশ্চয় তার খোঁজে আসবে। কিছুক্ষণ পরে রাসূলের এক সাহাবি সফওয়ান (রা.) সেখানে এলেন। যখন তিনি আয়েশা (রা.)-কে চিনতে পারলেন, তিনি আয়েশা (রা.)-কে তার উটের পিঠে চড়িয়ে নিজে উটের রশি ধরে আগে আগে হেঁটে চললেন। চলতে চলতে তারা কাফেলার সাথে গিয়ে একত্রিত হলেন।

কিছু লোক এটা নিয়ে আয়েশা ও সফওয়ান (রা.)-এর নামে কুৎসা রটাতে শুরু করল। শুরুর দিকে আয়েশা (রা.) এই গুজবের কিছুই জানতেন না। শরীর অসুস্থ থাকায় তিনি তাঁর বাবা-মায়ের কাছে ছিলেন। যখন এই খবর তাঁর কানে এল তিনি তীব্র কষ্টে ভেঙে পড়লেন।

এই কুৎসা রাসূলুল্লাহ ﷺ কানেও এল। তিনি লোকদের উদ্দেশ্যে একটা ভাষণ দিলেন। বললেন, আয়েশা ও সফওয়ান (রা.) সম্পর্কে সুধারণা পোষণ করতে। কিন্তু কিছু দুষ্ট লোক এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে নবি ও নবি পরিবারকে হেয় করতে শুরু করল। মুসলিমদের মাঝে একটা বিভ্রান্তি, অস্বস্তিকর পরিবেশ সৃষ্টির চেষ্টা করল।

এ অবস্থায় রাসূলুল্লাহ ﷺ আয়েশা (রা.)-এর কাছে গেলেন। বললেন, 'লোকেরা যা বলাবলি করছে তা যদি সত্য হয়ে থাকে, তুমি আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাও। আল্লাহ নিশ্চয় তাওবাকারীর তওবা কবুল করেন।'

আয়েশা (রা.) যখন এ কথা শুনলেন, তাঁর হতাশা রাগে পরিণত হলো। তিনি চাইলেন, তাঁর মা-বাবা যেন তাকে সমর্থন যোগায়, তাঁর পক্ষে কথা বলে। কিন্তু তারা নিরুত্তর রইলেন। তিনি তাঁর বাবা আবু বকরের দিকে তাকিয়ে কেঁদে উঠলেন, 'আপনাদের কি কিছুই বলার নেই?'

আবু বকর (রা.) জবাব দিলেন, 'আমাদের কী বলার থাকতে পারে। এই ঘটনা সম্পর্কে আমাদের কোনো জ্ঞান নেই।'

আয়েশা (রা.) ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলেন। শেষে একটু আত্মস্থ হয়ে বললেন, 'আপনি আমাকে যে অভিযোগ নিয়ে কথা বললেন, তার কিছু নিয়েই আমার তওবা করার নেই। আল্লাহর কসম! আমি যদি নিজের দোষ স্বীকার করি যে দোষে সবাই আমাকে অভিযুক্ত করছেন, অথচ আল্লাহ জানেন আমি নির্দোষ, তবে মিথ্যা বলা হবে।

www.pathagar.com

আর আমি যদি অস্বীকার করি, আপনারা কেউ আমাকে বিশ্বাস করবেন না। আল্লাহর কসম আমি তো তাই বলি, যা বলেছিলেন নবি ইউসুফের পিতা–

> ‘সুতরাং পূর্ণ ধৈর্যই শ্রেয়., তোমরা যা বলছ সে বিষয়ে একমাত্র আল্লাহই আমার সাহায্যস্থল।’ সূরা ইউসুফ : ১৮

রাসূলুল্লাহ ﷺ গভীর ভাবনায় ডুবে গেলেন। এ অবস্থায় কুরআনের আয়াত নাযিল হলো–

> ‘যখন তারা এটা শুনলো তখন মু'মিন পুরুষ এবং মু'মিন নারীগণ আপন লোকদের সম্পর্কে কেন ভালো ধারণা করল না এবং বলল না, ‘এটা তো সুস্পষ্ট অপবাদ।’ তারা কেন এ ব্যাপারে চারজন সাক্ষী উপস্থিত করেনি? যেহেতু তারা সাক্ষী উপস্থিত করেনি, সে কারণে তারা আল্লাহর নিকট মিথ্যাবাদী।’ সূরা নূর : ১২-১৩

আবু বকর (রা) আনন্দে তাঁর কন্যাকে জড়িয়ে ধরলেন। তাঁকে চুমু খেলেন। আয়েশা (রা.)-এর মা আয়েশা (রা.)-কে বললেন, স্বামীর কাছে যেতে। তিনি উত্তর দিলেন, ‘আল্লাহর কসম! আমি উনাকে ধন্যবাদ জানাব না। আমি সেই মহান আল্লাহর শুকরিয়া জানাই, যিনি আমাকে নির্দোষ প্রমাণ করেছেন।’

ডা. আমিনা এই ঘটনা বলার পরে আমাকে ব্যাখ্যা করলেন, কুরআনের বর্ণনা অনুযায়ী কোনো নারীর উপর মিথ্যা অপবাদ দেয়া ভয়ংকরতম কবিরা গুনাহ এবং ব্যভিচারের মতোই শাস্তিযোগ্য অপরাধ। আমিনার কথা শুনে মনে কিছুটা শান্তি পেলাম। আমি জানলাম, আল্লাহ নারীদের মর্যাদা দিয়েছেন এবং তাদের সুরক্ষা দিয়েছেন।

তবুও মন আমার কিছুতেই শান্ত হচ্ছিল না। আমি বাবা-মায়ের কাছে জার্মানিতে গেলাম। খাবারের টেবিলে বসে নিজেকে আর সামলাতে পারিনি। অঝোর কান্নায় ভেঙে পড়লাম। বাবা-মাকে জানালাম ইমরানের কথা। তারা জানতেন, ইমরানের প্রতি আমার টান কী রকম, তার জন্য আমি যেকোনো পরিস্থিতি মেনে নিতে তৈরি ছিলাম। আমি ভাবতেই পারিনি ইমরান এভাবে আমাকে ছোট করবে।

কিন্তু এই ঘটনায় আমার জন্য একটা শিক্ষা ছিল। কোনো মানুষের প্রতি নিজের সর্বস্ব, নিজের মনপ্রাণ সঁপে দেয়া যাবে না। একমাত্র আল্লাহই সকল আরাধনার যোগ্য।

আমার মা-বাবা আমাকে সাধ্যমতো সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করলেন। তবে তারা এটা ভেবে স্বস্তি পেলেন যে, আমি পাকিস্তান যাচ্ছি না। আমার মা ভিন্ন দুই সংস্কৃতির বিয়ের ভবিষ্যৎ নিয়ে উদ্বিগ্ন ছিলেন। মা ভিন্ন সংস্কৃতির বিয়ে সম্পর্কে জানতে একটা ম্যারিজ সেন্টারেও গিয়েছিলেন।

www.pathagar.com

সেখানকার পিয়ন বলল, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এই বিয়েগুলো টিকে না। সম্পর্ক ভেঙে গেলে নারীদেরকেই বেশি কষ্ট সইতে হয়। মা আমাকে একবার সে কথাও বলেছিলেন।

আমি মায়ের কথা উড়িয়ে দিয়েছিলাম। লন্ডনে এরকম কত বিয়ে দেখেছি, স্বামী-স্ত্রী দুজনেই সুখে সংসার করছে। মনে পড়ে গেল ইমরানের কথা। ইমরান বলেছিল, পাকিস্তানের প্রেমের বিয়েগুলোকে খুব একটা ভালো চোখে দেখা হয় না। এই সম্পর্ক নিয়ে সব সময় কিছু সন্দেহ করা হয়। মনে করা হয়, এই বিয়ে বেশিদিন টিকবে না। অন্যদিকে, পারিবারিক বিয়েগুলোকে মনে করা হয় মজবুত। মূলত এটাই রীতি।

এ পর্যায়ে মনে হলো, ইমরান কী আসলে নিজেকেই বুঝ দিচ্ছিল!

একসময় ফোনে ইমরানের সাথে আমার আবার কথা শুরু হলো। আমি তাকে বোঝানোর চেষ্টা করলাম, সে আমার সম্পর্কে যা শুনেছে তা সত্য নয়। সে বিশ্বাস করেছে। অন্তত আমার তাই ধারণা। ফোনে আমাদের মাঝে মাঝেই কথা হতো। কিন্তু আমাদের সম্পর্কটা আর আগের মতো জোড়া লাগেনি। আমি তাকে বলার চেষ্টা করতাম, সে যাতে তার আধ্যাত্মিক গুরুর কথা না শুনে বরং নিজের মনের কথা শুনে। কিন্তু তার মন পরিবর্তনের ক্ষমতা আমার ছিল না।

আল্লাহ হয়তো আমার জন্য এটাই চেয়েছিলেন। এই আমার নিয়তি।

বিশ্বাসী জীবন

ধীরে ধীরে নিজের জীবনকে আমি গুছিয়ে আনছিলাম। ভাবছিলাম, যা হয়েছে সব পেছনে ফেলে নতুন জীবন গড়তে হবে। এগিয়ে যেতে হবে সামনে। নিজেকে আমি বুঝ দিচ্ছিলাম, আগামী দিনগুলো নিশ্চয় আমার ভালো যাবে। কিন্তু তার বদলে আরেকটা বড় ধাক্কা খেলাম।

সেই যে সাক্ষাৎকারে আমি বলেছিলাম, 'মনের দিক দিয়ে আমি মুসলিম', পত্রিকাগুলোতে এই লাইন দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ল। পত্র-পত্রিকা মিডিয়ায় আমাকে নিয়ে নানা ঘটনা লেখা শুরু হলো।

এক পত্রিকা শিরোনাম করল, ভক্তরা যখন দল বেঁধে কনসার্টে যায়, ক্রিস্টিন তখন ব্যস্ত নামাযে। ঠিক আছে এমন খবর না হয় মেনে নিলাম। কিন্তু কিছু পত্রিকা বলা শুরু করল, আমি নাকি সন্ত্রাসবাদের সমর্থক।

www.pathagar.com

জার্মান টিভি কর্তৃপক্ষ আর আমার মা-বাবা আমাকে নিয়ে যত খবর প্রকাশ পাচ্ছিল, সবই নিয়মিত ফ্যাক্স করে পাঠাচ্ছিলেন। 'ইসলাম আমার মনের মধ্যে' এই কথায় যেন সবাইকে আমি আহত করেছি। আমি বুঝতেই পারিনি এই সাধারণ ছোট সত্য কথার এত তীব্র প্রতিক্রিয়া হবে! কিছুটা আফসোস হচ্ছিল। কেন যে আমি মিডিয়াকে এই কথা বলতে গেলাম!

লন্ডনের পরিবেশ আবার অন্যরকম। এখানে কেউ এটা নিয়ে মাথা ঘামায় না। বিভিন্ন ধর্ম-বর্ণ-গোষ্ঠীর মানুষ এখানে মিলেমিশে থাকে। এই সময়ে ইমরান আর পাকিস্তানে পাওয়া আন্তরিক পরিবেশের কথা খুব মনে পড়ছিল। বিশেষ করে ধর্ম নিয়ে ইমরানের সাথে আলাপ আলোচনা খুব মিস করছিলাম। থাক, যা নেই তা নিয়ে ভেবে কী লাভ!

ড. আমিনার সাথে আমি মাঝে মাঝে শায়খ নাজিমের ওখানে যেতাম। ওখানে অনেক মহিলার সাথে কথা বলে আমার মনের ভেতরটা হালকা হতো। একবার আমিনার সাথে আমি রেস্টুরেন্টে খেতে গিয়েছিলাম। কথায় কথায় আমি জানতে চাই, তিনি কী করে মুসলিম হলেন।

'আমি ছিলাম একজন ক্যাথলিক খ্রিষ্টান। আমি ক্যাথলিক পরিচালিত স্কুলগুলোতে পড়াশোনা করেছি' তিনি বলা শুরু করলেন, 'কিন্তু আমার শুধু মনে হচ্ছিল মনের কোথায় যেন একটা শূন্যতা। আমি মনে মনে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতাম, তিনি যেন আমাকে পথ দেখান। আরও কয়েকজন ডাক্তারের সাথে আমি মধ্যপ্রাচ্যে যাই। আমাদের দায়িত্ব ছিল ওমানের সুলতানের মায়ের চিকিৎসা করা।

একদিন রানী খুবই অসুস্থ ছিলেন। সবার অনুরোধ উপেক্ষা করে তিনি খুব ব্যস্ত সময় কাটালেন। রাতে তার বিছানায় যখন ক্লান্ত শ্রান্ত হয়ে শুয়েছিলেন, আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'আপনি তো সবাইকে অনেক কিছু দিচ্ছেন। কিন্তু আপনাকে কে দেয়?'

তিনি অনেক কষ্টে উঠে বসলেন। আকাশের দিকে আঙ্গুল উঠিয়ে ইশারা করলেন 'আল্লাহ!'

আমি ভালোই ধাক্কা খেলাম। যিনি কিংবা যে শক্তি এই অসুস্থ নারীকে এতটা মনোবল আর এত শক্তি দিয়েছেন, আমারও যে তাই চাই।

'আপনি কি ওমানেই ধর্মান্তরিত হয়েছিলেন?' আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

'না, আরও অনেক সময় লেগেছিল। একবার আমি ছুটি কাটাতে দক্ষিণ ফ্রান্সে গিয়েছিলাম। আমি ছিলাম নৌকায়। চোখে ঘুম চলে এসেছিল।

www.pathagar.com

স্বপ্নে দেখি, আমি আমার গাড়িতে করে লন্ডনে ফিরে এসেছি। আমার ফ্ল্যাটে তখন আগুন জ্বলছে। আমি ১৫ ডিগ্রি এঙ্গেলে গাড়ি ঘুরিয়ে রিজেন্ট পার্কের কাছে চলে আসি। তখন রাস্তায় কোনো গাড়ি ছিল না। আমার গাড়ি লন্ডনের মধ্য দিয়ে নদী পার হয়ে সোজা দিগন্ত রেখা বরাবর ছুটে চলল। দূরে একটা আলোর রেখা। কাছে গিয়ে দেখি সে আলোতে বড় করে লেখা 'আল্লাহ'।

আমি ধড়মড় করে ঘুম থেকে জেগে উঠলাম। আমার মনে হলো, আমাকে মুসলিম হতে হবে। অনেক পরে আমি যখন আমার ফ্ল্যাটে নামাযের জন্য দাঁড়িয়েছিলাম, খেয়াল করে দেখলাম কিবলা সেই রাস্তা থেকে ১৫ ডিগ্রি বামে।'

আমি তখনো মসজিদে নিয়মিত যেতাম। শায়খ আমাদেরকে নিয়মিত নামায পড়তে বলতেন। নামায মানুষকে কিয়ামতের দিন মুক্তি দিবে। এটি আত্মাকে উন্নত করে, পরিশুদ্ধ করে। নামাযে মানুষ আল্লাহর আরও অনেক কাছে আসে। এভাবেই বান্দার সাথে আল্লাহর গভীর সম্পর্ক তৈরি হয়।

ধর্ম নিয়ে পড়াশোনা আমার জন্য ছিল অনেক উপকারী। এটা ছিল আমার হৃদয়ের খোরাক। আমার মনে হচ্ছিল, আমি যেন খুব চমৎকার একটা দোকানের বাইরে দাঁড়িয়ে আছি। গ্লাসের মধ্য দিয়ে আমি দেখতে পাচ্ছি সুন্দর সুন্দর জিনিসে দোকান ঠাসা। আমি দূর থেকে কেবল দেখতেই পারি, কিন্তু ছুঁয়ে দেখতে পারছি না, কাছে গিয়ে স্পর্শ করতে পারছি না। যেন কোনো একটা পর্দা আমাকে তার থেকে আড়াল করে রেখেছে। সে পর্দা সরাতে হলে আমাকে মুসলিম হতে হবে, ইসলাম অনুযায়ী জীবনযাপন করতে হবে।

একবার লন্ডনের বাইরে গিয়েছিলাম। একটা বই পড়তে পড়তে আমি অনুভব করছিলাম, ইসলামই আমার জন্য সঠিক জীবনযাপন পদ্ধতি। এ অনুযায়ীই আমি আমার জীবন গড়তে চাই। আমাকে শুধু এক আল্লাহর উপরই ভরসা রাখতে হবে। তিনি সব সময় আমার পাশে আছেন। আমার সকল কাজের জন্য একমাত্র তার কাছেই আমাকে জবাবদিহি করতে হবে, আর কারও কাছে নয়। এই অনুভূতিতে আমার হৃদয়-মন এতটাই আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল, আমি পাটি বিছিয়ে নামাযে দাঁড়িয়ে গেলাম।

কিন্তু লন্ডনে ফিরে আমার দ্বিধা আবার ফিরে এল। ইসলাম গ্রহণ করে আমি ইসলাম অনুযায়ী জীবন গড়তে পারব তো? গাই ইটন, আমিনাসহ আরও অনেকেই আমাকে আশ্বস্ত করলেন, ভয়ের কিছু নেই। সবকিছু সময়ের সাথে সাথে ঠিক হয়ে যাবে। আস্তে আস্তে তুমি নিজেকে ইসলামের জীবন পদ্ধতির সাথে মানিয়ে নিবে।

শেষে একদিন আমি শায়খ নাজিমের মসজিদে গেলাম। আমার পরনে ছিল লম্বা জামা, গায়ে কোট। আমি একটা স্কার্ফ সংগ্রহ করে মাথায় লাগিয়ে এসেছিলাম।

www.pathagar.com

একসময় শায়খের সাথে সাথে শাহাদাহ উচ্চারণ করলাম। আমি হয়ে গেলাম মুসলিম। আজ থেকে কোনো মদ, শূকরের গোস্ত আমার জন্য নিষিদ্ধ। শায়খ আমার একটা নাম ও ঠিক করে দিলেন, 'ইউসরা'।

ড. আমিনা আমাকে বললেন, আমার নাম কুরআনেও উল্লেখ আছে[৭৪]। আমি ইসলামি বইয়ের দোকান থেকে নামায শিক্ষার একটা বই কিনে নিলাম। কম্পাস দিয়ে ঠিক করে নিলাম আমার কিবলা। কুরআনের কিছু সূরা মুখস্ত করে, সেগুলো দিয়ে নামায পড়া শুরু করলাম।

আমার বন্ধু-বান্ধবদের যখন বললাম আমি মুসলিম হয়েছি, তারা প্রথমটায় বেশ অবাক হয়েছিল। তারা বুঝতে পারছিল না, ঠিক কোনো জিনিস আমাকে ইসলাম গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করল। তবে তারা ছিল আমার প্রতি খুবই আন্তরিক। একজন বলল, 'ক্রিস্টিন তুমি মুসলিম হও কিংবা MTV-এর উপস্থাপক তাতে আমাদের কিছু যায় আসে না। আমরা তোমাকে সব সময় ভালোবাসি'। আমার এক খালাও আমার ইসলাম গ্রহণকে ভালোভাবেই নিয়েছেন। তিনি আমাকে ফোনে বললেন, 'ক্রিস্টিন! আমরা সবাই ঘুরে ফিরে নবি ইবরাহিমের বংশধর'। তিনি অবশ্য আমাকে একটা বইও পাঠিয়েছিলেন। জার্মান সাংবাদিক পিটারের লেখা 'Sword of Islam'। এই বইটা ইসলাম নিয়ে নেতিবাচক কথায় ভরপুর। খালা নিজে এই বই পড়েছেন কিনা সন্দেহ আছে।

মা-বাবা আমার ইসলাম গ্রহণের খবরে ধাক্কা খেয়েছিলেন। তারা ভেবেছেন আমি বোধহয় সাময়িক উত্তেজনার বশে এই কাজ করেছি। মুসলিম পুরুষদের সম্পর্কে তাদের আগে থেকেই নেতিবাচক মনোভাব ছিল। ইমরানের ঘটনা সেটি আরও বাড়িয়ে দিয়েছিল। তারা বুঝতে পারছিলেন না, আমার যখন ইমরানের সাথে বিয়ে হচ্ছে না, তখন তার ধর্ম গ্রহণ করার মানে কী?

আমি তাদের বুঝাতে চেষ্টা করলাম, আমি অনেক বুঝে-শুনেই ইসলাম কবুল করেছি। ইমরান ছিল আমার জন্য ইসলামে প্রবেশের দরজা মাত্র। তার মাধ্যমে ইসলামের সাথে আমার পরিচয় ঘটে। ইসলামের প্রতিটি বিধানই চমৎকার। আমি আশাবাদী, এই নতুন বিশ্বাস আমাকে আগের চেয়েও একজন ভালো মানুষ হয়ে উঠতে সাহায্য করবে।

মা-বাবা আমার কথায় আশ্বস্ত হতে পারেননি। ইসলাম সম্পর্কে তাদের ধারণা পুরোটাই মিডিয়া থেকে জানা। আমার বাবা আমাকে বললেন, 'মুসলিমদের চাওয়াই হলো সারা বিশ্বকে নিজেদের কব্জায় নিয়ে নেয়া।'

www.pathagar.com

তাদের চিন্তাধারা ছিল আমার বিশ্বাসের অনেক বাইরে। একটা সময় তারা আমাকে বললেন, আমি যেন তাদের সামনে ইসলাম নিয়ে আলোচনা না করি। আমি মেনে নিলাম। এরপরে দেখা হলে আমরা আমাদের পরিবার নিয়েই কেবল আলোচনা করতাম। শুধু শুধু বিরোধ বাড়িয়ে কী লাভ!

আমি সবচেয়ে বড় বাধার সম্মুখিন হই জার্মান মিডিয়ার কাছ থেকে। ইসলাম নিয়ে কথা বলার জন্য আমাকে একটা টিভিতে আমন্ত্রণ জানানো হয়। অতিথি প্যানেলে আরও তিনজন ছিল। মানসিকতার দিক দিয়ে তিন জনই কট্টর ইসলাম ও মুসলিম বিরোধী। আমন্ত্রণ পেয়ে আমি কিছুটা দ্বিধায় ছিলাম, যাব কী যাব না। শেষে ভাবলাম, ইসলামকে টিভিতে উপস্থাপনের এটা একটা সুযোগ। আমার নিজের কথা আমি বলে যাব। তারা কী ভাবল তাতে আমার কী এসে যায়।

অনুষ্ঠান শুরুই হলো কালো বোরকা পরা মহিলাদের ভিডিও দিয়ে। দেখানো হলো, কী করে আল্লাহু আকবার ধ্বনি দিয়ে সন্ত্রাসী হামলা চালানো হচ্ছে। আমি বলার চেষ্টা করলাম, এমন কাজ পুরোপুরি ইসলামের শিক্ষা বিরোধী। আমার কথা পুরোপুরি শেষ করার আগেই উপস্থাপক ও তিন অতিথি আমার উপর হামলে পড়লেন। তারা আমাকে কোনো কথাই শেষ করতে দিচ্ছিলেন না। আমি বুঝতে পারছিলাম, তারা আসলে ইসলাম নিয়ে জানতে মোটেও আগ্রহী নয়। তারা চাচ্ছিলেন, একজন মুসলিম হিসেবে আমাকে মঞ্চে রেখে আক্রমণ চালিয়ে যেতে। নিজের কাছে খুব হতাশ লাগছিল। আফসোস হচ্ছিল, এমন অনুষ্ঠানে আমি কেন এলাম!

অনুষ্ঠান শেষে আমার বন্ধু-বান্ধব ও মুসলিম ভাইবোনেরা আমাকে অভিনন্দিত করলেন। অন্তত আমি টিভিতে ইসলামের কিছু কথা বলতে পেরেছি। তাদের কথা আমার উৎসাহ বাড়িয়ে দিল।

জার্মান মিডিয়া আমার বিরুদ্ধে উঠে পড়ে লাগল। কিছুদিন পরে জানতে পারি Bravo Tv আমাকে অনুষ্ঠান সঞ্চালনা থেকে বাদ দিয়েছে। অথচ, তাদের সাথে আমার চুক্তি ছিল আরও লম্বা সময়ের জন্য। বুঝতে পেরেছিলাম আমার ইসলাম গ্রহণই ছিল মূল কারণ।

আমি চাইলে আইনি লড়াই চালিয়ে যেতে পারতাম। শেষে আর যুদ্ধ করতে মন টানেনি। কারও ব্যক্তিগত ধর্ম বিশ্বাসের কারণে তাকে এভাবে অনুষ্ঠান থেকে বাদ দিয়ে দেয়া- ইংল্যান্ডে এ ছিল কল্পনার বাইরে। ভাবখানা এমন, আমি যেন আমার বিশ্বাসকে জামার আস্তিনে নিয়ে হেঁটে বেড়াচ্ছি।

এমন দুর্দিনে আমার কারও পরামর্শ খুব দরকার। আমি গাই ইটনের সাথে দেখা করলাম। আমি তাকে ইসলাম গ্রহণ পরবর্তী সময়ের সমস্যা এবং ইমরানের সাথে সম্পর্কের বিচ্ছেদের কথা বললাম।

www.pathagar.com

সে খুব স্বাভাবিক স্বরেই বলল, 'ইসলাম গ্রহণের কারণে তোমার সাথে যা হচ্ছে, এটা মোটেও অস্বাভাবিক কিছু নয়। আল্লাহ বিশ্বাসীদের ঈমানের পরীক্ষা নেন। তাই মন খারাপ কর না। জীবনে যাই ঘটুক না কেন, মনে করবে নিশ্চয় এর পেছনে ভালো কিছু আছে। আল্লাহ নিশ্চয় তোমার জন্য ভালো কিছুই চিন্তা করেছেন। জীবন এমন অনেক ঝড়ঝঞ্ঝার মধ্য দিয়ে এগিয়ে যায়, সমৃদ্ধ হয়। জীবনটা কামারের হাতুড়ির মতো। যত পেটানো হয়, তত তার চেহারা সুন্দর হতে থাকে।'

ইটনের কথা শুনে মনটা কিছুটা প্রফুল্ল হয়ে উঠল।

দিন কয়েক পরে আমি ইমরানের ফোন পেলাম। ইমরান আমাকে জানাল, সে বিয়ে করতে যাচ্ছে। পারিবারিকভাবেই বিয়ে হচ্ছে। আমি কিছুটা ধাক্কা খেলাম। বুঝতে পারছিলাম না, আমার কী বলা উচিত। আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, তুমি কি আনুষ্ঠানিকভাবে প্রস্তাব দিয়েছিলে? ইমরান উত্তর দিল, অবশ্যই।

দুদিন পরে পাকিস্তান ক্রিকেট টিমের অফিশিয়াল ডক্টর হারুন আমাকে ফোন দিলেন, 'তুমি কি জান, ইমরান জেমাইমা গোলস্মিথকে বিয়ে করতে যাচ্ছে?'

ইমরানের সাথে কিছুদিন ধরে জেমাইমার দেখা সাক্ষাত চলছিল। জেমাইমা[২৭] ছিল ধন্যাঢ্য সুন্দরী ব্রিটিশ তরুণী। আমি আবারও ধাক্কা খেলাম। ইমরান আমাকে এ কথা বলেনি কেন? হারুনের ফোন রাখতে না রাখতেই আবার ফোন বেজে উঠল। এবার Sunday Times পত্রিকার সাংবাদিক। সে আমাকে খবরটা দিয়ে আমার মতামত জানতে চাইল। কিন্তু আমার তখন হতবুদ্ধি অবস্থা। আর আমার কী-ই বা বলার আছে?

বাসা থেকে বের হতেই সাংবাদিকদের মিছিল আমাকে ছেঁকে ধরল। গাদা গাদা মাইক্রোফোন আমার দিকে বাড়িয়ে দিল। আমি তখনো খবরটা ভালো করে হজম করতে পারিনি। শুধু একটা কথাই বলতে পেরেছিলাম, 'নো কমেন্টস।'

নাছোড় বান্দা সাংবাদিকরা তাও আমার ঠোঁট নড়া থেকে একটা অনুমান করে, পরের দিন নিজের মতো করে সংবাদ শিরোনাম করে নিল।

পরের দিন সকালে ঘুম থেকে জেগে দেখি, আমার প্রতিবেশী কাকে যেন আচ্ছা তরফে গালিগালাজ করছে। পরে বুঝতে পারলাম, কিছু সাংবাদিক আমার বাসা ভেবে ভুলে তার বাসার বেল টিপেছে।

ঘর থেকে বের হতেই সেই একই চিত্র। সব আঠার মতো আমার পেছনে লেগে রইল। এক পত্রিকা তো আমাকে বিরাট অংকের টাকা প্রস্তাব দিল, যাতে ইমরানকে নিয়ে আমি আমার মন্তব্য জানাই। আমি সেই প্রস্তাব ফিরিয়ে দিলাম। ইমরানের ভার আমি আল্লাহর উপর ছেড়ে দিলাম।

www.pathagar.com

নিজের আত্মমর্যাদা ধরে রাখাটাই আমার কাছে বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

ইমরানের পরিচিত বন্ধু-বান্ধবেরা আমার পাশেই রইলেন। সবাই আমাকে সান্ত্বনা দিলেন, সহমর্মিতা জানালেন। আমার মুসলিম বান্ধবী আমাকে ক্ষমা করার উপকারিতার কথা বললেন। বললেন, একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ কাছে এক লোক এসে জিজ্ঞেস করল, 'আমি কীভাবে আল্লাহর দয়া ও ক্ষমা পেতে পারি?'

তিনি বললেন, 'আল্লাহ তাকেই দয়া করেন যে অন্য মানুষের প্রতি দয়াবান'।

একসময় আমার মন শান্ত হয়ে এল। আমি ইমরানকে মন থেকে ক্ষমা করে দিলাম। আমি বিশ্বাস করি, আল্লাহ যা করেন তার মধ্যে নিশ্চয় কোনো কল্যাণ আছে। হতে পারে বাহ্যিকভাবে সেটি খারাপ। আল্লাহ ইমরানের মাধ্যমে আমাকে হিদায়েতের পথ দেখিয়েছেন। আজ যদি ইমরান না হয়ে অন্য কোনো লম্বা দাড়িওয়ালা মাওলানা আমার সামনে আসতেন, হয়তো আমি এভাবে মুসলিম হতাম না। আল্লাহ আমার কাছ থেকে ইমরান কে দূরে সরিয়ে নিয়েছেন। যাতে আমি তার চেয়ে মহত্তর ভালোবাসা, স্রষ্টার প্রতি ভালোবাসা উপলব্ধি করতে পারি।

আমি নিয়মিত নামায পড়ছিলাম, কুরআন তিলাওয়াত করছিলাম। কুরআনের কিছু কিছু আয়াত মুখস্ত করার চেষ্টা করছিলাম।

ইমরান আর জেমাইমার বিয়ের দিন পুরো মিডিয়া সার্কাস শুরু হয়ে গেল। আমি যতটা পেরেছিলাম লন্ডন থেকে দূরে রইলাম। মনের অস্থিরতা, কষ্ট তাও পুরোপুরি দূর হচ্ছিল না। আমিনা আমাকে সাথে করে মসজিদে নিয়ে গেল। আমিনার কথা শুনে, তার সহমর্মিতা পেয়ে মনের অস্থিরতা কিছুটা কমে এল।

MTV-এর পাশাপাশি আমি NBC Europe সহ আরও কিছু চ্যানেলে কাজ চালিয়ে গেলাম। কাজগুলো আমি উপভোগই করতাম। কিন্তু মনের গভীরে কোথাও একটা খচখচ করত। কাজের স্বার্থে এমন অনেক কিছুই আমার উপস্থাপন করতে হতো, যেগুলো আমার বিশ্বাস, আমার মূল্যবোধের বিপরীত। সন্দেহ হতো, না জানি কত দিন এই কাজ চালিয়ে যেতে পারব।

এর মধ্যে চলে এল রমজান মাস। সেবার রমজান আর ক্রিসমাস একই সময়ে ছিল। ক্রিসমাস উপলক্ষ্যে আমাদের ব্যস্ততা ছিল অন্য যেকোনো সময়ের চেয়ে অনেক বেশি। ক্রিসমাসের ছুটি যাতে নির্বিঘ্নে কাটাতে পারি, এ জন্য ডবল শিফটে কাজ করতাম। বলতে গেলে প্রায় সারাদিনই আমাকে ক্যামেরার সামনে থাকতে হতো। নানা রেকর্ডিং, ভিডিওর কাজ চলছিল।

www.pathagar.com

সাধারণত কাজের ভীড়ে আমি স্ন্যাকস খেতাম, চা কফিতে চুমুক দিতাম। কিন্তু রমজানে ভোর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কোনো কিছু মুখে দেয়ার জো নেই। একদিকে অক্লান্ত পরিশ্রম, অন্যদিকে সারাদিন কিছু না খেয়ে থাকা; আমার সন্দেহ হচ্ছিল, আমি আদৌ ঠিকমত সিয়াম পালন করতে পারব কিনা।

প্রথম দু-একদিন আমার মাথা ধরে গিয়েছিল। দিন কয়েক পরেই আমার শরীর নতুন অবস্থার সাথে মানিয়ে নিল। বিকেলের দিকে এসে মন জুড়ে এক স্নিগ্ধ প্রশান্তি অনুভব করতাম।

সিয়াম আমার শরীর মনে এক পরিবর্তন নিয়ে এল। ভোরে সেহেরি খাবার সময় আমি যেন গভীরভাবে খাবারের স্বাদ, গন্ধ অনুভব করতে পারতাম। সিয়াম আমার ভেতরে নতুন করে শৃঙ্খলাবোধ এনে দিল। কখনো কখনো মনে হতো, আমি বোধহয় আর পারব না। আমি তখন নিজেকে প্রবোধ দিতাম, 'এই তো আর কিছুক্ষণ। একটু কষ্ট কর ক্রিসটিন। সন্ধ্যা নামলেই তুমি মন ভরে খেতে পারবে।'

মজার বিষয় হলো, ইফতারে অল্প একটু খেলেই আমার পেট ভরে যেত। ঐতিহ্যগতভাবে মুসলিমরা সাধারণত ২/১ টি খেজুর দিয়েই ইফতার করেন। এটা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নাত। তিনি খেজুর দিয়েই তার ইফতার শুরু করতেন। আমি ইফতারে মাঝারি সাইজের দুইটি খেজুর আর দুধ খেতাম।

আমার চ্যানেলের সহকর্মীরাও আমাকে অনেক সহায়তা করতেন, সাপোর্ট দিতেন। একবার আমার এক প্রডিউসার আমাকে দুপুরে লাঞ্চের দাওয়াত দিলেন। পরক্ষণেই তার মনে পড়ল, আমি তো রোজা রেখেছি। বেচারা কিছুটা লজ্জা পেয়েই আমার কাছে মাফ চেয়ে নিলেন। রোজা রেখেও আমার ভেতরের উদ্যম দেখে তারা খুব অবাক হতেন। আমাকে এর জন্য প্রশংসাও করতেন।

রোজা আমার শরীর মনে বিশুদ্ধকরণের কাজ করছিল। না খেয়ে থাকার পাশাপাশি আমি অধৈর্য হয়ে যাওয়া, রাগ দেখানো, অনর্থক আলাপ-আলোচনা থেকেও দূরে থাকার চেষ্টা করতাম। চেষ্টা করতাম প্রতিদিন কুরআন থেকে কিছু কিছু অংশ পড়তে। কয়েক রাতে আমি তারাবিহের নামাযেও অংশ নিয়েছিলাম।

শেষের দিকে শরীর কিছুটা দুর্বল হয়ে উঠল। আমি ক্লান্ত হয়ে আরও আগেই শুয়ে পড়তাম। রমজান যখন শেষ হলো, আমার ভেতরটা কী এক আনন্দ-উচ্ছ্বাসে ভরে গেল! মনে হলো আল্লাহর সাথে আমার সম্পর্কটা আরও বেশি মজবুত হয়ে গেল। আল্লাহ যেন আমার খুবই ঘনিষ্ঠ, অন্তরঙ্গ বন্ধু। এত চমৎকার অনুভূতি, যা ভাষায় প্রকাশ করা কঠিন।

অবশ্য রমযানের কিছুদিন পরে আস্তে আস্তে সে অনুভূতি হারিয়ে গিয়েছিল।

www.pathagar.com

আরও জিজ্ঞাসা

পরের বছরের বসন্তকালে বেড়ানোর জন্য আমি স্পেন গেলাম। আলহামরা প্রাসাদ[২৮] আর নানা কারুকার্যময় ঐতিহ্যবাহী মুসলিম স্থাপত্য দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলাম। আরবিতে এই অঞ্চলের নাম আল-আন্দালুস[২৯]। ৭১১ সাল থেকে ১৪৯২ সাল পর্যন্ত এই অঞ্চল ছিল ইউরোপে মুসলিম সভ্যতার প্রাণকেন্দ্র।

গোটা ইউরোপ যখন গোঁড়ামি, কূপমণ্ডুকতা আর অজ্ঞতার গাঢ় অন্ধকারে ডুবে গিয়েছিল, মুসলিম শাসিত স্পেন[৩০] তখন জ্বলজ্বল করছিল জ্ঞানের আলোকবর্তিকা হয়ে। মুরিশ স্পেন ছিল আধুনিক সভ্যতার বাতিঘর। গণিত, বিজ্ঞান, চিকিৎসা, নতুন নতুন ওষুধ আবিষ্কার, দর্শন, ধর্মতত্ত্ব, বাণিজ্য, শিল্প-সভ্যতার সকল ক্ষেত্রেই তৎকালীন স্পেন ছিল কান্ডারির ভূমিকায়। আরবদের সে প্রভাব গোটা স্পেনের চিন্তাধারা, সংস্কৃতি পাল্টে দিয়েছিল। আজও স্পেনের সংস্কৃতিতে তার কিছু কিছু ছাপ পাওয়া যায়।

উচ্ছ্বাস ও মুগ্ধতা প্রকাশ করতে গিয়ে স্প্যানিশরা একটা শব্দ বলে, 'ওলে ওলে'। অনেকেই বলেন, এই শব্দ মূলত এসেছে 'আল্লাহ' শব্দ থেকে।

স্পেনের বেশ কিছু মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষের সাথে আমার কথা হয়েছিল। তাদের কারও কারও মাঝে দেখলাম, বহুবিবাহের প্রথা চালু আছে। আমার মনের ভেতর নতুন করে ভাবনাটা জেগে উঠল, মুসলিম পুরুষেরা কেন একসাথে চারজন স্ত্রী রাখতে পারে। আমি নিজেকে অমন কোনো পুরুষের স্ত্রী হিসেবে কল্পনাই করতে পারি না, যার আরও স্ত্রী আছে।

আমি লন্ডন ফিরে গাই ইটনের সাথে দেখা করলাম। বললাম, আমার মনের জিজ্ঞাসার কথা।

গাই তার সিগারেট ধরালেন। ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে কিছুটা শ্লেষের সাথেই বলল, 'তুমি তো জান, এই ইউরোপে একাধিক রক্ষীতা রাখার প্রচলন আছে।'

আমি সেটা জানতাম। এও জানতাম কোনো কোনো বাড়িতে রক্ষিতাদের জন্য থাকার আলাদা ঘর আছে।

গাই বলে চলল, 'ফ্রান্সে লন্ডনের চেয়েও আরও অনেক বেশি রক্ষিতা রাখার চলন আছে। এমনকি মি. প্রেসিডেন্টও এর বাইরে নন। পুরুষেরা স্বভাবগত ভাবেই বহুগামী।'

www.pathagar.com

'কিন্তু একগামী স্ত্রীর প্রতি বিশ্বস্ত পুরুষও তো আছেন, যারা এক স্ত্রী নিয়েই সন্তুষ্ট থাকেন' আমি পাল্টা উত্তর দিলাম।

'হ্যাঁ, কিন্তু পশ্চিমা পুরুষরা ধারাবাহিকভাবে একগামী। হতে পারে একসাথে একজন নারীর সাথেই সে বসবাস করছে। কিন্তু খেয়াল করলে দেখবে, তা মাত্র অল্প কিছুদিনের জন্য। একজন কে নিয়ে জীবন কাটিয়ে দেয়া, এমনটা পাবে হাতে গোনা গুটিকতক মাত্র। ঘুরেফিরে একাধিক নারীর সাথেই সে সম্পর্ক গড়ছে। কখনো স্ত্রী কিংবা প্রেমিকা হিসেবে, আবার কখনো রক্ষীতা কিংবা পরকিয়া সম্পর্কে জড়িয়ে।

ইসলামে কোনো পুরুষ যদি একের অধিক বিয়ে করে, সে তাকে সম্মান দেয়, মর্যাদা দেয়। তাদের সন্তানও বৈধতা পায়। প্রথম স্ত্রীর অধিকার পুরোটাই বজায় থাকে। আমাদের সমাজগুলোতে দেখা যায়, এক স্ত্রীর পাশাপাশি অনেক পুরুষের গোপন সম্পর্ক থাকে। বহুবিবাহের প্রথা চালু থাকলে এই সমস্যার সমাধান হতে পারত। যদি পুরুষ তার দায়িত্ব স্বচ্ছতার সাথে পালন করে।

এটা সত্য, একাধিক স্ত্রীদের মধ্যে মাঝে মাঝে ঈর্ষা কাজ করে। এটা মানবীয় দুর্বলতা। আমাদের নবির স্ত্রীদের ক্ষেত্রেও এমনটা দেখা গিয়েছিল।'

গাইয়ের যুক্তি আমি বুঝতে পেরেছিলাম। আমি বহুবিবাহ নিয়ে আরও গভীর পড়াশোনা চালিয়ে গেলাম।

তৎকালীন আরব সমাজে মানুষ যত খুশি ইচ্ছে বিয়ে করত। কুরআন এটাকে নিয়ন্ত্রণ করেছে। পশ্চিমা সমালোচকেরা রাসূলের অনেকগুলো স্ত্রী নিয়ে অভিযোগ তুলেন। এই মনোভাব তাদের অনায্য ও অন্যায়। অথচ তিনি প্রথম স্ত্রীর বাইরে পরবর্তী বিয়েগুলো করেছিলেন তার মধ্য পঞ্চাশে। সে সময় নবি ﷺ চাইলে যেকোনো স্ত্রীকে তালাক দিয়ে ইচ্ছেমতো বিয়ে করতে পারতেন। মানুষ অত্যন্ত আগ্রহের সাথে তাদের মেয়েকে নবি ﷺ-এর সাথে বিয়ে দিতেন।

নবি ﷺ সেই সব মহিলাদের বিয়ে করেছিলেন, যারা সমাজের কল্যাণে ভূমিকা রাখেন বা রেখেছেন কিংবা যারা নিরাশ্রয়। তিনি তার এক স্ত্রীকে বিয়ে করেছিলেন যাতে তার পুরো গোত্র বন্দি দশা থেকে মুক্তি পায়। এক আয়েশা (রা.) ছাড়া উনার স্ত্রীদের সবাই ছিলেন হয় তালাকপ্রাপ্তা নয়তো বিধবা। তাদের কেউ কেউ দেখতেও অত সুন্দরী ছিলেন না। বয়সেও ছিলেন বয়োবৃদ্ধ।

আমার এক বান্ধবী আমাকে বলল, 'আফ্রিকাতে বেশ কিছু মুসলিম নারী মনে করেন, যে পুরুষের এক বা একাধিক স্ত্রী আছে, তার স্ত্রী হতে পারাটা সৌভাগ্যের। কারণ এতে বুঝা যায়, সে পুরুষ বাকি স্ত্রীদের প্রতি কেমন।

www.pathagar.com

পাশাপশি এও বুঝা যায় অন্য স্ত্রীদের ভরণ-পোষণ ও অন্যান্য চাহিদা মেটানোর ক্ষমতা সে রাখে। তারা মনে করে এর মাধ্যমে তারা একজন মহান মানুষকে মিলেমিশে স্বামী হিসেবে কাছে পাচ্ছেন। একা একা তাকে পুরো সময় দেয়া, তার চাহিদা মেটানো কিছু কিছু ক্ষেত্রে একঘেয়েমীপূর্ণ। তাছাড়া একাধিক স্ত্রী থাকলে কাজের চাপও কম থাকে। কাজ ভাগাভাগি করে নেয়া যায়। অবসর সময়টা নিজের অন্য কাজ করে কাটে।'

ড. আমিনা অবশ্য বললেন, এটা আরবীয় সমাজের জন্যই অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ। আরেক বান্ধবী রুবি জানাল, তার চাচা পাকিস্তানে দুই বিয়ে করেছেন। দুজনেরই আলাদা আলাদা সংসার এবং দুজনেই যার যার জায়গায় খুব সুখী।

আমার এক আরব দেশীয় বান্ধবী আমাকে বলেছিল, সে কোনো পুরুষের দ্বিতীয় স্ত্রী হয়ে থাকার কথা কল্পনাই করতে পারে না। তার স্বামী যখন ঠাট্টা করে দ্বিতীয় স্ত্রী নেয়ার কথা বলেছিল, সে বলেছিল তাকে তালাক দিয়েই কেবল সেটা সম্ভব। কোনোভাবেই সে আরেক বউ সহ্য করবে না। তার শঙ্কা, ঈর্ষার অনুভূতি তাকে আল্লাহ পাকের রহম থেকে দূরে সরিয়ে নিবে।

সে অবশ্য ব্যাখ্যা করল, বহুবিবাহের কারণ। তৎকালীন আরব সমাজে বহুবিবাহ ছিল একটা সামাজিক সমাধান। অনেক নারীর স্বামী যুদ্ধে মারা যেতেন। বহুবিবাহের ফলে সে নারী আর তার সন্তানেরা একজন অভিভাবক পেতেন।

অবশ্য কোনো নারী চাইলে তার বিয়েতে শর্ত দিতে পারত, একাধিক বিয়ে করলে সে তালাক নিতে পারবে। শতাধিক বছর আগেও অনেক নারী এটা করত।

আমি দেখতে চাইলাম কুরআন কী বলে। কুরআন বহুবিবাহের অনুমতি দেয়। তবে কিছু শর্ত আছে। যেমন– স্বামীকে সকল স্ত্রীর সাথে সমান আচরণ করতে হবে, তাদেরকে সমান ভরণ-পোষণ দিতে হবে। এমনকি কুরআন স্পষ্ট ভাষায় বলেছে, এ শর্ত মানতে না পারলে এক স্ত্রী নিয়ে সন্তুষ্ট থাকাই উত্তম। (সূরা নিসা : ৩)

কুরআন আরও কিছু দূরে গিয়ে বলেছে, মানুষের যতই চেষ্টা থাকুক, একাধিক স্ত্রীর সাথে ইনসাফপূর্ণ আচরণ করা তার জন্য প্রায় অসম্ভব। (সূরা নিসা : ১২৯)

বিষয়টা নিয়ে আমি মোটামুটি সন্তোষজনক জবাব পেলাম।

কয়েক বছর পরে MTV-র সাথে আমার চুক্তি শেষ হয়ে যায়। MTV-র নতুন কর্মকর্তারা তাদের পলিসিতে পরিবর্তন আনেন। তারা চিন্তা করেন, নতুন নতুন উপস্থাপিকা দিয়ে অনুষ্ঠান চালানোর। এক উপস্থাপিকা দীর্ঘদিন থাকলে অনেক সময় অনুষ্ঠান ছাপিয়ে উপস্থাপিকা নিজেই বড় মাপের তারকা হয়ে যায়। তার ভাব ও চাহিদা দুটোই বেড়ে যায়। এর চেয়ে এই ভালো, নতুন নতুন মানুষ, নতুন মুখ।

www.pathagar.com

MTV-এর সাথে আমার চুক্তি শেষ হলেও আমি অন্যান্য সংবাদ মাধ্যমে কাজ চালিয়ে যেতে থাকি। ১৯৯৭ সালে বসনিয়া যুদ্ধ বিরোধী আন্দোলন ও বসনিয়া পুনর্গঠনে অর্থ সাহায্য কার্যক্রমের সাথে আমি জড়িয়ে যাই। বসনিয়ার মুসলিমদের কথা ভেবে আমার মনের ভেতর খুব কষ্ট হতো। আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন, সকল মুমিন মিলেমিশে একটি উম্মাহ, একটি শরীরের মতো। শরীরের কোনো অংশে রক্তক্ষরণ হলে সমস্ত শরীর তাতে ব্যথা অনুভব করে।

বসনিয়াতে সার্ব বাহিনী নরকীয় হত্যাযজ্ঞ চালায়। শুধু যুগোশ্লাভিয়াতে মানুষ মারা যায় দুই লাখের বেশি। সার্ব বাহিনী সারায়েভো[৩১] দখল করে রাখে টানা চার বছর। সে শহরে অন্তত দশ হাজার মুসলিম প্রাণ হারান। হাজারো মুসলিম নারীকে ধর্ষণ করা হয়। ধুলায় মিশিয়ে দেয়া হয় বাড়ি-ঘর, স্থাপনা। দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধোত্তরকালে এতটা নরকীয় ধ্বংসযজ্ঞ বিশ্ব আর দেখেনি।

সে সময় বিশ্বের বড় বড় শক্তিগুলো ছিল অনেকটা নীরব দর্শকের ভূমিকায়। জাতিসংঘের শান্তিরক্ষী বাহিনী সব দেখে শুনেও মুসলিমদের রক্ষায় এগিয়ে আসেনি। পরবর্তী সময়ে বলা যায় জনমত ও মিডিয়ার চাপেই, বড় দেশগুলো হস্তক্ষেপ করতে বাধ্য হয়।

পরবর্তি সময়ে এই নির্বিচার হত্যা আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতে গণহত্যা হিসেবে স্বীকৃতি পায়। বিচার হয় কয়েক জন যুদ্ধাপরাধী সার্ব নেতার।

আমি বসনিয়ার মুসলিমদের সাহায্যার্থে বিভিন্ন কনসার্ট, বিভিন্ন আয়োজনে সক্রিয়ভাবে অংশ নিই। ঘুরে দেখি বসনিয়ার বিভিন্ন অঞ্চল। আমি দেখতে পাই, দেয়ালে দেয়ালে নরকীয় ধ্বংসযজ্ঞের নিষ্ঠুর চিহ্ন। উপলব্ধি করতে পারি, যুদ্ধের মাঝেও এক আল্লাহর উপর বিশ্বাস কী করে মুসলিমদের আন্দোলিত করেছিল। আমি সেখানকার অনেক মানুষের সাথে কথা বলি। সবকিছু দেখে শুনে চোখের পানি ধরে রাখা ছিল সত্যিই কঠিন।

জীবনটা কেটে যাচ্ছিল এভাবেই।

এল ২০০১ সাল। জিহাদের নাম করে হামলা হয়, আমেরিকার টুইন টাওয়ারে। রাতারাতি ওসামা বিন লাদেন হয়ে যান বিশ্বব্যাপী পরিচিত এক নাম।

সে সময় পশ্চিমা বিশ্ব জুড়ে ইসলাম ও মুসলিম বিরোধী তীব্র স্রোত বয়ে যায়। মিডিয়া, পত্র-পত্রিকা আলোচনার টেবিলে সবখানেই ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে সমালোচনা চলতে থাকে। লন্ডনের মতো জায়গায়ও সে ঢেউ আছড়ে পড়ে। আমার মনে আছে এক মসজিদের দেয়ালে কে যেন লিখে দিয়ে যায়, 'আমেরিকায় হামলার প্রতিশোধ নাও, মুসলিমদের হত্যা কর।' এক আতঙ্কজনক পরিস্থিতি। জর্জ বুশ সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধের নামে দেশে দেশে মুসলিম বিরোধী মনোভাব উস্কে দিয়েছিলেন।

www.pathagar.com

তিনি সভ্যতার সংঘর্ষ[৩২] নামে নতুন এক তত্ত্ব হাজির করেন। তাতে বলা হয়, আগামীর পৃথিবী হবে ইসলাম ও পশ্চিমা সংস্কৃতির মধ্যে দ্বন্দ্বমুখর।

পরে অবশ্য পরিস্থিতি আস্তে আস্তে সহজ হয়ে আসে। আমি নিজে ইসলাম ও সন্ত্রাসবাদ নিয়ে পড়াশোনা শুরু করি। আমি জিহাদ নিয়ে ইসলামের মৌলিক উৎস থেকে জানার চেষ্টা করি। জানতে পারি, সুলতান সালাহ উদ্দিন[৩৩] ক্রুসেড[৩৪] যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে তার শত্রুদের প্রতি কী পরিমাণ উদারতা দেখিয়েছিলেন। এমনকি তিনি নিজের রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে শত্রুপক্ষের বিধবা স্ত্রীদের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করেছিলেন। সালাহউদ্দিনের উদারতা আজও ইউরোপিয়ানদের মনে দাগ কাটে। তার মহত্ত্ব সালাহউদ্দিনকে করে রেখেছে অমর।

আমি বেশ কিছু পন্ডিতের সাথেও এ নিয়ে আলাপ করি। তারা সকলেই আমাকে এক বাক্যে বলেছেন, ইসলামে আত্মহত্যা মহাপাপ। সন্ত্রাসবাদের কোনো স্থান ইসলামে নেই। কুরআনে বলা হয়েছে–

> 'কেউ যদি নিরপরাধ কোনো মানুষকে অন্যায়ভাবে হত্যা করে সে যেন পুরো মানবজাতিকেই হত্যা করল।' সূরা মায়েদা : ৩২

কুরআন মুসলিমদের উপস্থাপন করেছে মধ্যমপন্থী জাতি হিসেবে। সূরা বাকারা : ১৪৩

আল্লাহর নাম নিয়ে কিছু উগ্রপন্থী মুসলিমের আচরণ অত্যন্ত ভয়ংকর, কুরআনের শিক্ষা বিরোধী। তাদের এই সমস্ত কাজ সাধারণ শান্তিপ্রিয় মুসলিমদের জীবনকে ঝুঁকির মধ্যে ফেলে দেয়। সাধারণ মুসলিমরা অনর্থক অন্য মানুষদের ঘৃণার পাত্র হয়ে দাঁড়ায়।

গাই ইটনের সাথে দেখা হলে আমি এই প্রসঙ্গ তুলি।

গাই আমাকে একটা গল্প বলা শুরু করল। ৬২৩ সালে বদর যুদ্ধের ঘটনা। মক্কার মানুষেরা সে সময়ে সদ্যজাত মুসলিম সমাজকে ধ্বংস করে দিতে চেয়েছিল। মুসলিমগণ রাসূলের ﷺ নেতৃত্বে বদর প্রান্তরে তাদের মুখোমুখি হয়। কিন্তু যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তার সাহাবিরা বিজয়ী হন। মদিনা ফেরার পথে রাসূল ﷺ তার সাহাবিদের বললেন, 'তোমরা এখন ছোট জিহাদ থেকে বড় জিহাদের দিকে প্রত্যাবর্তন করলে'।

সাহাবিরা জিজ্ঞেস করল, 'বড় জিহাদ কী, ইয়া রাসূলাল্লাহ?'

তিনি উত্তর দিলেন, 'নিজের নফসের সাথে যুদ্ধ করা।' (অনেক মুহাদ্দিস হাদীসটিকে দুর্বল বলেছেন– সম্পাদক)

www.pathagar.com

'আল্লাহর রাসূল ছোট জিহাদ বলতে সম্মুখ যুদ্ধকে বুঝিয়েছেন। তিনি বুঝিয়েছেন, এই যুদ্ধ একমাত্র আত্মরক্ষার্থে এবং অত্যাচারী ও নিপীড়নকারী সংগঠিত শক্তির বিরুদ্ধে কার্যকারী। জিহাদ তখনই করা হয়, যখন যুদ্ধ ছাড়া কূটনৈতিক কিংবা ভিন্ন কোনো উপায় থাকে না। কিন্তু এই যুদ্ধেরও কিছু সুনির্দিষ্ট নিয়ম-কানুন আছে।' গাই বলে গেল, 'নিরস্ত্র নিরীহ সাধারণ মানুষের উপর আক্রমণ করা যাবে না। নারী ও শিশুদেরকে আক্রমণের বাইরে রাখতে হবে। এমনকি শস্য, ফসল ও জীব-জন্তুর কোনো ক্ষতি করা যাবে না।'

গাই আরও বলল, 'তা ছাড়া জিহাদের ডাক কেবলমাত্র ইসলামি রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান কিংবা দায়িত্বপ্রাপ্ত আলেমই দিতে পারেন। কোনো উগ্র লোকের নিজের খেয়াল খুশিমত জিহাদের ডাক দেয়ার কোনো অধিকার নেই।'

'তা হলে বিন লাদেনের আমেরিকা বিরোধী জিহাদ শরীয়াহ বিরোধী?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'হানড্রেড পারসেন্ট!' গাই উত্তর দিল। 'আর বৈধ জিহাদের ক্ষেত্রেও কুরআন আমাদের বলে মধ্যমপন্থা অবলম্বন করতে। নিজেদের রাগ ক্ষোভ কিংবা প্রতিশোধ স্পৃহা থেকে যুদ্ধ করা জিহাদ নয়। জিহাদ হতে হবে ন্যায়ের পথে ন্যায়সঙ্গত পন্থায়।'

গাই আমাকে বলল, বুকসেলফ থেকে কুরআনের কপিটা নামিয়ে আনতে। আমি এনে তার হাতে দিলাম। চোখে রিডিং গ্লাস লাগিয়ে গাই কোন আয়াত যেন খুঁজতে লাগল। একটু পরে পেয়ে গেল–

> 'যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, তাদের বিরুদ্ধে আল্লাহর পথে সংগ্রাম কর। সীমালংঘন কর না। আল্লাহ সীমালংঘনকারীদের পছন্দ করেন না।' সূরা বাকারা : ১৯০

গাই হতাশামাখা স্বরে বলল, 'সন্ত্রাসবাদের উৎস ঘৃণা আর প্রতিশোধ স্পৃহা। অথচ কুরআন আমাদের বলে–

> একে অন্যের প্রতি ঘৃণাবোধ তোমাদের যেন ন্যায়ের পথ থেকে দূরে সরিয়ে না নেয়'। সূরা মায়েদা : ৮

আমি আয়াতটি লিখে নিলাম। তাকে জিজ্ঞাসা করলাম আত্মঘাতি হামলা নিয়ে তার মূল্যায়ন কী?

গাই বলল, 'আত্মঘাতি হামলা করে বেহেশতে যাওয়া যায়, এই চিন্তা পুরোপুরি ইসলাম বিরোধী। ইসলামে আত্মহত্যা একেবারেই নিষিদ্ধ। এটি ন্যায়ের পথে ন্যায়সঙ্গত যুদ্ধের ইসলামি চেতনা থেকে অনেক দূরে।'

আমি গাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় নিলাম।

এভাবে দিনে দিনে আমার ইসলামি চেতনা বৃদ্ধি পাচ্ছিল, জ্ঞান হচ্ছিল সমৃদ্ধ।

www.pathagar.com

নতুন মানুষ

২০০৫ সালে আমি হজ্ব করতে যাই। সে বছর হজ্ব আর ক্রিসমাস একই সময়ে পড়েছিল। আমি মনে মনে হজ্বের নিয়্যাত করি। আমার কী ভাগ্য, হঠাৎ করে আমার ঘাড়ের ডিস্ক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ডাক্তার আমাকে বলেন, অপারেশন করতে হবে। কিন্তু আমি কোনোভাবেই অপারেশন করতে চাচ্ছিলাম না। শেষে ড. আমিনার পরামর্শে ফিজিওথেরাপি নেয়া শুরু করি। সেই সাথে ব্যথা কমানোর জন্য উচ্চমাত্রার ব্যথানাশক ওষুধ। আমার ফিজিওথেরাপির ডাক্তার আমাকে কড়াভাবে নিষেধ করেন, আমি যেন ভুলেও হজ্বে যাওয়ার চিন্তা না করি।

হজ্ব অত্যন্ত কঠিন ইবাদাত। শারিরীকভাবে এ ইবাদত পালন করা অনেক কষ্টসাধ্য। আমিও মনে মনে তার কথা মেনে নিই।

আল্লাহর কী রহমত! তিন সপ্তাহ পরে আমার অবস্থার অলৌকিক উন্নতি ঘটল। আমি যখন এক্সরে রিপোর্ট নিয়ে ডাক্তারের চেম্বারে যাই, তিনিও অবাক হয়েছিলেন। আমাকে বললেন, এ অবস্থা থেকে এত দ্রুত সুস্থ্য হওয়া আল্লাহ পাকের বিশেষ রহমত।

সুস্থ্য হয়ে উঠার পরে হজ্ব করতে না যাওয়ার কোনো কারণ নেই। আমি ড. আমিনাসহ আরও প্রায় একশ জন হাজির সাথে হজ্বের উদ্দেশ্যে যাত্রা করি। মদিনা ঘুরে আমরা মাক্কায় এসে ইহরাম বাঁধি। তারপর আরাফাহ, মিনা ঘুরে অন্যান্য আনুষ্ঠানিকতা সেরে নেই। যেদিন আমাদের হজ্বের সব কাজ শেষ হলো, আমরা একে অন্যকে অভিনন্দন জানাই। বলি 'হজ্ব মাবরুর!'

হজ্বের অনুভূতি এত চমৎকার, এত অসাধারণ- সে অনুভূতি ভাষায় প্রকাশ করা কঠিন। আমরা পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষ এক হয়ে আল্লাহর কাছে কাতর প্রার্থনা করেছি, ক্ষমা চেয়েছি। এই কয়টা দিন সবাই মিলেমিশে এক হয়েছিলাম। একে অন্যের সাথে সুবিধা-অসুবিধাগুলো ভাগ করে নিয়েছি। আমাদের হৃদয় প্রশান্তির এক সুশীতল ধারায় ভিজে উঠেছিল। মনে হচ্ছিল আল্লাহর সান্নিধ্যে আমরা যেন আরও তাঁর নিকটবর্তী হয়েছি।

> 'আমি এসেছি সমগ্র পৃথিবীর কেন্দ্রবিন্দুতে, যেখানে জাগতিক ও আধ্যাত্মিক জগত এক হয়ে মিশেছে। মনে হচ্ছিল, আমি যেন সুবিশাল মানব সমুদ্রের মাঝে ভাসছি। যেন আল্লাহর ঘরের চারদিকে নক্ষত্রের মতো পরিভ্রমণ করে চলেছি।
>
> এমন এক জায়গায় এসে পৌঁছেছি, যেখানে জাগতিক সব কামনা-বাসনা, চাওয়া-পাওয়া থেমে যায়। শুধু সর্বশক্তিমান এক আল্লাহর প্রতি আনুগত্য আর শান্তিপূর্ণ আত্মসমর্পণ আমার অন্তরাত্মাকে করে তুলে বিশুদ্ধ, স্বাধীন।'

হজ্ব নিয়ে ইউসুফ ইসলামের লেখা এই চমৎকার বক্তব্যের চেয়ে আর কী উত্তম উপায়ে সে অনুভূতি ব্যক্ত করা যায়!

www.pathagar.com

এক বিকেলে আমার ফোন বেজে উঠল।

'হেই ক্রিস্টিন, কেমন আছ?' একটা ভরাট খুব পরিচিত কণ্ঠ গুণগুণ করে আমার কানে বেজে উঠল, 'আমি ইমরান।'

'আহ! কী দারুণ সারপ্রাইজ!' আমি উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলাম তার গলা শুনে।

ইমরান আমাকে বলল, তার আর জেমাইমার বিচ্ছেদ হতে চলছে। ইমরান আমার কাছে ক্ষমা চাইল এতগুলো বছর ধরে সে আমাকে কষ্ট দিয়েছে বলে।

'আমি তোমাকে অনেক আগেই মন থেকে ক্ষমা করে দিয়েছি।' হঠাৎ তার এই ফোন পেয়ে আমি তখনো ঠিক আত্মস্থ হতে পারিনি।

ইমরান বলল, তারা দুজন আর কিছু দিনের মধ্যে আলাদা হয়ে যাবে। তার মনে হচ্ছে আমাকে এতগুলো বছর ধরে কষ্ট দেয়ার কারণেই আল্লাহ তাকে শাস্তি দিচ্ছেন।

শুনে সত্যি আমার খারাপ লাগল।

'আমি তোমার জন্য সব সময় দোয়া করে গেছি' ইমরান আমাকে বলল।

'আমিও। এমন কী তোমার বিয়ের দিনও আমি মনে মনে দোয়া করেছি, আল্লাহ যেন তোমাদের সুখী করে' আমি জবাব দিলাম।

ইমরান শুষ্ক গলায় বলল 'দেখতেই পাচ্ছ, তোমার দোয়া কাজ করেনি।'

নয় নয়টি বছর পর আমি ইমরানের গলা শুনতে পাচ্ছি। এতগুলো বছর পরেও সে যে আমাকে ফোন করেছে, তাতেই আমি অনেক খুশি। বহুদিন আগেই আমাদের বিচ্ছেদের কষ্ট আমি ভুলে গিয়েছিলাম। তাকে ক্ষমা করে দিয়েছিলাম। কিন্তু মনের এক কোণে একটা খচখচে কাঁটা যে সূক্ষ্ম হয়ে বিঁধেছিল, সে যে আমি নিজেও টের পাইনি। আজ ইমরানের ফোন আর ক্ষমা চাওয়া, সে কাঁটাকে দূর করে দিল।

আমি যেন এখন প্রাণভরে নিঃশ্বাস নিতে পারছি। আমি তো আর সেই আগের ক্রিস্টিন নেই।

আমি যে এখন বিশ্বাসে, ক্ষমায় এক নতুন মানুষ...

www.pathagar.com

পরিচিতি

ক্রিস্টিন বেকারের জন্ম জার্মানির হামবুর্গে ১৯৫৬ সালে। তরুণ বয়সে বিখ্যাত মিউজিক চ্যানেল MTV-এর উপস্থাপিকা (VJ) হিসেবে বিশ্বজুড়ে তার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। পাকিস্তানের বিশ্বকাপ জয়ী দলের অধিনায়ক ইমরানের খানের সাথে সাক্ষাত তার জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেয়। ইমরানের সংস্পর্শে এসে তিনি ইসলাম সম্পর্কে আগ্রহী হয়ে উঠেন। পাশ্চাত্যের জীবন ও দর্শনের সাথে ইসলামের আদর্শকে মিলাতে থাকেন। একসময় তিনি ইসলাম কবুল করেন।

'From MTV to Mecca: How Islam inspired My life' তার আলোচিত বই। এই বইতে তিনি আধুনিক সময়ের বিভিন্ন চিন্তা, দর্শন, ইসলামের বহু আলোচিত ও সমালোচিত দিক নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। ইসলামে নারীর অধিকার, বহু বিবাহ, পরিবার প্রথা, ফ্যাশন, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের দ্বন্দ্ব ইত্যাদি নিয়ে তুলনামূলক আলোচনা করেছেন হৃদয়গ্রাহী ভাষায়, গল্প বলার ঢঙয়ে। আধুনিক জীবন কিংবা ইসলামী জীবন...যেই জীবনেই অভ্যস্ত হন না কেন, এই বই পাঠকের চিন্তাশীল সত্ত্বাকে জাগিয়ে তুলবে। পাঠক খুঁজে পাবেন অনেক অনেক প্রশ্নের জবাব।

আলোচ্য লেখাটি সেই বইয়ের বাছাইকৃত অংশের সংক্ষিপ্ত, পরিমার্জিত রূপ।

পাদটিকা

১. নেলসন ম্যান্ডেলা (১৯১৮-২০১৩) : দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবাদ বিরোধী বিশ্ববিখ্যাত নেতা। ১৯১৮ সালে ম্যান্ডেলা দক্ষিণ আফ্রিকার এক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পূর্ব পুরুষের বিবেচনায় তার শরীরে রাজরক্ত বয়েছিল। তিনি আইনের উপর পড়াশোনা করে আইন পেশাকে জীবিকা হিসেবে বেছে নেন।

ম্যান্ডেলার যৌবনে দক্ষিণ আফ্রিকার রাষ্ট্রক্ষমতায় ছিল প্রচন্ড বর্ণবাদী শ্বেতাঙ্গ দল Nationalist Party। তারা ক্ষমতায় এসে নানা বর্ণবাদী নীতি গ্রহণ করেন। বিভিন্ন আইন প্রণয়নের মাধ্যমে কৃষ্ণাঙ্গদের অধিকার খর্ব করা হয়। শ্বেতাঙ্গদের স্কুল কলেজ রেস্তোরায় কৃষ্ণাঙ্গদের প্রবেশ ছিল নিষিদ্ধ। ভূমি, শিল্প, ব্যবসায় কৃষ্ণাঙ্গদের মালিকানা কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হয়। নিষিদ্ধ করা হয় শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণাঙ্গদের মাঝে আন্তঃবিবাহ।

ম্যান্ডেলা মার্ক্সিজমের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে এর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ গড়ে তুলেন। ১৯৬২ সালে তৎকালীন সরকার তাকে বন্দি করে। তিনি প্রায় দীর্ঘ ২৭ বছর কারাগারে বন্দি ছিলেন। দেশে-বিদেশে বর্ণবাদ বিরোধী আন্দোলন গণ-আন্দোলনে রূপ নেয়। ম্যান্ডেলা পরিণত হন জনমানুষের নেতায়। সারা বিশ্বব্যাপী তার মুক্তির জন্য দক্ষিণ আফ্রিকার উপর চাপ বাড়তে থাকে। অবশেষে ১৯৯০ সালে তিনি মুক্তি পান।

১৯৯৪ সালে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে জয়ী হয়ে তিনি সরকার গঠন করেন। প্রায় ৫ বছর ক্ষমতায় থাকার পর তার সহকারী থাবো এম্বেকির হাতে দায়িত্বভার ছেড়ে দিয়ে ক্ষমতা থেকে স্বেচ্ছায় সরে দাঁড়ান। পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন মানবিক আন্দোলনে তিনি সক্রিয় ভূমিকা রাখেন।

দীর্ঘদিন রোগভোগের পর ২০১৩ সালে ৯৫ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন এ বর্ষিয়ান নেতা।

২. বার্লিন ওয়াল : দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বিশ্বের রাষ্ট্রগুলো মোটা দাগে দুভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। কমিউনিস্ট সোভিয়েত রাশিয়া নিয়ন্ত্রিত ও প্রভাবিত সমাজতান্ত্রিক অঞ্চল ও আমেরিকার নেতৃত্বে

www.pathagar.com

কমিউনিজম বিরোধী অঞ্চল। যুদ্ধ পরবর্তী সময়ে সোভিয়েত রাশিয়ার নেতা স্ট্যালিন পোল্যান্ড, হাঙ্গেরীসহ জার্মানির এক অংশ নিজের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নেন। জার্মানী পূর্ব ও পশ্চিম এই দুই ভাগে ভাগ হয়ে যায়। পূর্ব জার্মানির শাসকদের উদ্যোগে ১৯৬১ সালে জার্মানীর বার্লিনে এক সুউচ্চ প্রাচীর গড়ে তোলা হয়। এই দেয়াল দুই জার্মানীকে একে অন্যের থেকে পুরোপুরি আলাদা করে দেয়। পরবর্তী সময়ে ধারাবাহিক বিক্ষোভ, বিপ্লব ও আন্দোলনের মুখে ১৯৯০ সালের গোড়ার দিকে বার্লিন ওয়াল ভেঙে ফেলা হয়। দুই জার্মানী আবার এক হয়ে যায়।

৩. উপসাগরীয় যুদ্ধ : নানা ইস্যুতে ইরাকের সাথে কুয়েতের দীর্ঘদিন ধরে দ্বন্দ্ব চলে আসছিল। সাদ্দামের নেতৃত্বে ইরাক ১৯৯০ সালের অক্টোবরে কুয়েত আক্রমণ করে কুয়েত দখল করে নেয়। আমেরিকার নেতৃত্বে অন্যান্য পরাশক্তিগুলোর পাশাপাশি জাতিসংঘ ইরাকের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামে। এই যুদ্ধ ইতিহাসে উপসাগরীয় যুদ্ধ নামে পরিচিত। যুদ্ধে ইরাক পরাজিত হয় ও কুয়েত থেকে পিছু হটে আসে। সে যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে সৌদি আরবসহ বিভিন্ন আরব দেশে আমেরিকা তাদের সেনা মোতায়েন করে। আজও সেই সব দেশে আমেরিকান সৈন্য মোতায়েন আছে।

৪. বসনিয়ার যুদ্ধ (১৯৯২-১৯৯৫) : সাবেক যুগোশ্লাভিয়া ভেঙে অনেকগুলো দেশের সৃষ্টি হয়। তন্মধ্যে বসনিয়া হার্জেগোভিনা অন্যতম। এই দেশের প্রায় ৪৪% ছিল বসনিয়ান মুসলিম, ৩২% সার্ব ও বাকিরা ছিল বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠির। স্বাধীনতার জন্য এক গণভোট আয়োজনের পর বসনিয়ান সার্ব নেতা রাদোভান কারাদজিস ও সার্বিয়া সরকারের প্রধান স্লভোদান মিলোসোভিচ এর নেতৃত্বে সার্বরা বসনিয়ার মুসলিমদের উপর এক গনহত্যা চালায়। এই যুদ্ধ প্রায় ৪ বছর ধরে চলে। চলে নির্বিচারে হত্যা, খুন, ধর্ষণ। লক্ষ লক্ষ মুসলিম এতে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। শুরুর দিকে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় নীরব থাকলেও তীব্র জনমতের কারণে পরবর্তী সময়ে হস্তক্ষেপ করতে বাধ্য হয়।।

৫. অলম্পিক মশাল : প্রতি চার বছর পর পর সারা বিশ্বের দেশগুলোকে নিয়ে অলিম্পিকের আসর বসে। বিভিন্ন ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। অলিম্পিক গেমস শুরু হবার আগে অলিম্পিকের মশাল নিয়ে বিশ্বের অনেক দেশে প্রদক্ষিণ করা হয়।

প্রাচীন গ্রিক পুরাণ অনুযায়ী ঈশ্বর জিউসের কাছ থেকে দেবতা প্রমিথিউস আগুন চুরি করে মানুষের হাতে দিয়ে দেয়। সেই আগুনকে কাজে লাগিয়ে মানুষ সভ্যতার উৎকর্ষ সাধন করে। এ ঘটনার স্মরণে গ্রীস থেকে মশালে করে আগুন নিয়ে দৌড় শুরু হয়। মশাল থেকে মশালে আগুন স্থানান্তরিত হয়ে ফিরে আসে আয়োজক দেশে।

৬. আলী শরীয়াতি (১৯৩৩-১৯৭৭) : ইরানের অন্যতম শীর্ষ গুরুত্বপূর্ণ গবেষক ও লেখক। ইরানের বিপ্লবের পেছনে তার লেখাও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল।

৭. রেজা শাহ পাহলভী : ১৯৭৯ সালে ইরান বিপ্লব ও তৎপূর্ববর্তীকালিন পাহলভী রাজবংশের শাসক। শাহ মূলত ছিলেন আমেরিকানপন্থী। তিনি তেল নীতিসহ আমেরিকার স্বার্থরক্ষায় এমন অনেক পদক্ষেপ নেন, যা ছিল জনবিরোধী। সমালোচকেরা তাকে অভিহিত করেছিলেন আমেরিকার হাতের পুতুল হিসেবে। পাশাপাশি তার অব্যাহত দুর্নীতি, নিষ্ঠুর শাসন ও ধর্মবিরোধী ক্রিয়াকলাপের কারণে মানুষ তার বিরুদ্ধে বিক্ষোভে ফেটে পড়ে।

পরবর্তী সময়ে আয়াতুল্লাহ আলি খোমেনীর নেতৃত্বে এক রক্তপাতহীন গণঅভ্যুত্থানের মুখে রেজা শাহ পাহলপভীর পতন ঘটে।

৮. বস্তুবাদ : বস্তুবাদ মূলত ধর্মীয় চেতনার বাইরের একটি মতবাদ। বস্তুবাদ অনুসারে বস্তুই সব। আমাদের আশেপাশের সবকিছু যা দৃশ্যমান সবই বস্তু থেকে উদ্ভুত। আমরা যা কিছু দেখি, যা কিছু শুনি কিংবা ইন্দ্রীয় দ্বারা উপলব্ধি করতে পারি এর বাইরে আর কোনো কিছুর অস্তিত্ব নেই। নেই স্রষ্টা কিংবা অতি জাগতিক কোনো কিছু।

৯. পুঁজিবাদ : পুঁজিবাদ এমন এক অর্থ ব্যবস্থার নাম যেখানে বাজার মূলত উৎপাদকের সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করে। দামও নির্ভর করে সম্পদের সরবরাহ ও তার গুণাগুণের উপর। পুঁজিবাদী

www.pathagar.com

ব্যবস্থা ব্যক্তিগত সম্পদ অর্জন ও সংরক্ষণকে দৃঢ়ভাবে সমর্থন করে। এ ব্যবস্থায় আদর্শের কোনো উপস্থিতি নেই। এখানে বাজারই আসল। বাজার ধরতে কিংবা বাজারে কোনো জিনিস লাভজনক করতে যে কেউ যেকোনো কিছু উৎপাদন করতে পারে, যেকোনো কিছু সরবরাহ করতে পারে। কোনো নিয়ন্ত্রক সংস্থা এতে বাধা সৃষ্টি করতে কিংবা প্রভাবিত করতে পারে না।

১০. প্রাচ্য : প্রাচ্য বলতে ইউরোপের পূর্বের দেশগুলো তথা এশিয়াকে বুঝায়। ধরে নেয়া হয় দর্শন সংস্কৃতি চিন্তাধারা ইত্যাদি ক্ষেত্রে ইউরোপের সাথে এ অঞ্চলের বড় ধরনের পার্থক্য আছে।

১১. পাশ্চাত্য : পাশ্চাত্য বলতে মূলত ইউরোপকেই বুঝায়। তবে বর্তমানে এই শব্দটি আমেরিকাকেও অন্তর্ভুক্ত করে। যেহেতু বর্তমান সময়ে ইউরোপ-আমেরিকার সংস্কৃতি, দর্শন প্রায় কাছাকাছি।

১২. বিশ্বায়ন : বিশ্বায়ন একটি ধারণা, একটি তত্ত্ব। এই তত্ত্বের মূল কথা হলো সারা পৃথিবীটা একটা গ্রামের মতো। দেশের সীমানা ছাড়িয়ে মানুষে মানুষে যোগাযোগ ঘটবে, সংস্কৃতি, চিন্তা, দর্শন, ব্যবসা বাণিজ্যের পারস্পরিক আদান-প্রদান ঘটবে এটাই বিশ্বায়নের মূল উপজীব্য।

১৩. কারাকোরাম মহাসড়ক : চীন ও পাকিস্তানের সাথে সংযোগকারী মহাসড়ক। ১৯৫৯ সালে শুরু হয়ে এই সড়কের কাজ শেষ হয় ১৯৭৯ সালে। এই মহাসড়কের দৈর্ঘ প্রায় ১,৩০০ কিলোমিটার।

১৪. সিল্ক রোড : উপমহাদেশীয় অঞ্চলগুলো মধ্য দিয়ে পূর্ব ও পশ্চিম এশিয়া, ইউরোপ ও ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলকে সংযুক্ত করে একটি প্রাচীন বাণিজ্যিক পথ। প্রায় ৪০০০ মাইল (৬৫০০ কি.মি.) দীর্ঘ এই পথের নামকরণ করা হয়েছে চীনা সিল্ক ব্যবসার নামে, যা হান রাজত্বকালে আরম্ভ হয়েছিলো। যদিও সিল্কই ছিল প্রধান পণ্য, অন্যান্য পণ্যও এই পথে আনা-নেওয়া করা হতো। চীনা, ভারতীয়, ফার্সী,আরব ও ইউরোপিয় সভ্যতার উন্নয়নে এই বাণিজ্য পথের বিশাল প্রভাব ছিল।

১৫. বাদশাহী মসজিদ : পাকিস্তানের লাহোরে অবস্থিত পাকিস্তান ও দক্ষিণ এশিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম মসজিদ এবং পৃথিবীর পঞ্চম বৃহত্তম মসজিদ। ষষ্ঠ মুঘল সম্রাট আওরঙ্গজেব ১৬৭১ সালে এই মসজিদটি নির্মাণ করেন এবং ১৬৭৩ সালে নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়। এই মসজিদ সৌন্দর্যের দিক থেকে মুঘল সম্রাজ্যের স্মৃতি বহন করে। পাকিস্তানের লাহোরের ইকবাল পার্কে অবস্থিত মসজিদটি একটি অন্যতম প্রধান পর্যটক আকর্ষণকারী স্থান।

১৬. শালিমার গার্ডেন : লাহোরে অবস্থিত শালিমার গার্ডেন ছিল মোঘল শাসকদের অবকাশ যাপন কেন্দ্র। নানা বাহারী আর সুগন্ধী ফুল, বিভিন্ন প্রজাতির ফল, নয়নাভিরাম পানির ফোয়ারা আর কারুকার্যময় স্থাপত্য এই বাগানকে করেছে মোহনীয়। লাহোর শহর থেকে ৫ কিলোমিটার উত্তর পশ্চিমে বাগবানপুরের কাছে শালিমার গার্ডেন অবস্থিত। এর খুব কাছে রয়েছে ঐতিহাসিক গ্র্যান্ট ট্রাঙ্ক রোড। মধ্য এশিয়া, কাশ্মীর, পশ্চিম পাঞ্জাব,পারস্য এবং দিল্লী সালতানাত এর স্থাপত্য ঘরানার মিশ্রণ ঘটেছে এই বাগানে। তবে ফোয়ারা ও স্থাপনার ক্ষেত্রে পুরোপুরি মোগল স্থাপত্যরীতির ঐতিহ্যকে বহন করছে শালিমার গার্ডেন। কারুকার্য করা উঁচু দেয়ালে ঘেরা আয়তকার এই বাগান উত্তর-দক্ষিণে ৬৫৮ মিটার এবং পূর্ব-পশ্চিমে ২৫৮ মিটার। ১৬৪১ খ্রিষ্টাব্দে মোগল সম্রাট শাহজাহানের নির্দেশে এই বাগানের নির্মাণ কাজ শুরু হয় এবং পরের বছর সমাপ্ত হয়। বাদশাহ শাহজাহানের দরবারের সম্ভ্রান্ত সদস্য খলিলুল্লাহ খান, আলী মর্দন খান ও মোল্লা আলাউল মুলকের সহায়তায় এর নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়।

১৭. ক্যামব্রিজ : ইংল্যান্ডের লন্ডন শহর থেকে প্রায় ৫০ মাইল উত্তরে অবস্থিত একটি শহর। এই শহরে অবস্থিত ক্যাম্ব্রিজ ইউনিভার্সিটি পৃথিবীর সেরা ইউনিভার্সিটিগুলোর মধ্যে একটি।

১৮. ফ্রাঙ্কফুর্ট : জার্মানীর পঞ্চম বৃহত্তম শহর। এই শহরেই প্রতি বছর বিশ্বের বৃহত্তম বই মেলার আয়োজন করা হয়।

১৯. আদী পাপ : খ্রিষ্টানদের বিশ্বাস অনুযায়ী প্রথম মানব ও মানবী আদম ও হাওয়া স্বর্গে ঈশ্বরের নির্দেশ অমান্য করে নির্দিষ্ট গাছের ফল খায়। তার শাস্তিস্বরূপ তাদের দুনিয়াতে নামিয়ে দেয়া হয়। প্রতিটি মানব শিশুই জন্মগতভাবে পিতা আদমের পাপে পাপী। কেবল মাত্র যিশুখ্রিষ্টের উপর আন্তরিক বিশ্বাসই সে পাপ থেকে মানুষকে মুক্তি দিতে পারে।

www.pathagar.com

২০. হলোকষ্ট : দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জার্মান নেতা এডলফ হিটলারের নেতৃত্বে প্রায় ৬০ লক্ষ লোককে হত্যা করা হয়। এর মধ্যে সিংহভাগই ছিল ইহুদি। এর বাইরে যাযাবর, রোমান, পোলিশ, প্রতিবন্ধী শিশু কিংবা মানুষও এই হত্যার শিকার হয়। তীব্র জাতীয়তাবাদী হিটলারের যুক্তি ছিল, ইহুদিরা সারা বিশ্বের দখল নেয়ার চেষ্টা চালাচ্ছে। এরা দেশ ও জাতির শত্রু। পাশাপাশি হিটলার প্রচার করত, জার্মান রক্ত উচ্চমানের ও সেরা। গোটা ইউরোপে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে এই রক্তের ধারা ত্রুটিমুক্ত রাখা চাই। চেষ্টা চালাতে হবে যাতে, এই রক্তের সাথে অন্য কোনো রক্তের মিল না ঘটে।

হিটলার কন্সেন্ট্রেশন ক্যাম্প নামে এক নিপীড়ণমূলক ব্যবস্থা চালু করে। এখানে এই সব মানুষদের ধরে এনে দাসের মতো অমানুষিক পরিশ্রম করতে বাধ্য করা হতো। কখনো 'গ্যাস চেম্বারে' ঢুকিয়ে দিয়ে বিষাক্ত গ্যাস প্রয়োগ করে এই মানুষগুলোকে নৃশংভাবে হত্যা করা হতো।

ইতিহাসের এই ভয়াবহ নিষ্ঠুরতম হত্যাকান্ড 'হলোকষ্ট' নামে পরিচিত।

২১. Martin Lings (১৯০৯-২০০৫) : তার আরেক নাম আবু বকর সিরাজ উদ্দিন। ১৯০৯ সালে ইংল্যান্ডের ম্যানচেস্টারে জন্মগ্রহণকারী Martin Lings ছিলেন ধর্মান্তরিত মুসলিম। সেক্সপিয়ারের সাহিত্যকর্মের উপর বিশেষ পারদর্শী মার্টিন অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি থেকে ইংরেজি সাহিত্যের উপর স্নাতক পাস করেন। পরবর্তী সময়ে তিনি পেশাগত কারণে মিসরে আসেন। সেখানেই মুসলিম ও ইসলামের সাথে তার পরিচয় ঘটে। রাসূলুল্লাহ ﷺ উপরে লেখা তার জীবনী Muhammad: *His Life* Based on the Earliest Sources ,ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা লাভ করে।

২২. জন কেপলার (১৫৭১-১৬৩০) : বিখ্যাত জার্মান গণিতবিদ ও জ্যোতির্বিদ। আগে একসময় মানুষ মনে করত, পৃথিবী স্থির আর সূর্য তার চারিদিকে ঘুরছে। তিনি বিজ্ঞান আর গণিতের সাহায্যে প্রমাণ করেন সূর্য নয়, বরং পৃথিবীই সূর্যের চারিদিকে প্রদক্ষিণ করছে।

২৩. বাইবেলে নবি লুত ﷺ ও মেয়ের ঘটনা : বাইবেলের আদীপুস্তক (genesis) এর ১৯:৩০-৩৮ অধ্যায়ে আছে, নবি লুত ﷺ তার দুই মেয়েকে সাথে নিয়ে একটি পর্বতের গুহায় আশ্রয় নেন। পরবর্তী সময়ে তার মেয়েরা তাকে মদ খাইয়ে মাতাল করে ও তার সাথে শারিরীক সংসর্গ করে (নাউজুবিল্লাহ)।

২৪. সাম্রাজ্যবাদ : সাম্রাজ্যবাদ হলো বৃহৎ পরাশক্তির অধিকারী রাষ্ট্রগুলোর দ্বারা ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলোর উপর আধিপত্য বিস্তারের নীতি। বিশ্বযুদ্ধের আগের সময়ে ফ্রান্স, ইংল্যান্ডসহ বড় বড় রাষ্ট্রগুলো ছলে-বলে-কৌশলে বিশ্বের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলো দখল করে নিয়েছিল। তাদের এই দেশ দখলের নীতিই সাম্রাজ্যবাদ হিসেবে পরিচিত।

২৫. জালাল উদ্দিন মুহাম্মাদ রুমি (১২০৭-১২৭৩) : তিনি ছিলেন ১৩ শতকের একজন ফার্সি মুসলিম কবি, আইনজ্ঞ, ইসলামি ব্যক্তিত্ব, ধর্মতাত্ত্বিক, অতীন্দ্রিবাদী, সূফী। রুমির প্রভাব সীমানা এবং জাতি ছাড়িয়ে ছড়িয়ে পড়েছে দেশে দেশে।

তাঁর কবিতা সারাবিশ্বে ব্যাপকভাবে বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছে। রুমিকে যুক্তরাষ্ট্রের 'সবচেয়ে জনপ্রিয় কবি' এবং 'বেস্ট সেলিং পয়েট' বলা হয়। রুমির কাজ বেশিরভাগই ফার্সি ভাষায় লেখা। কিন্তু মাঝেমধ্যে তিনি স্তবকগুলোতে তুর্কি, আরবি এবং গ্রিক ভাষা ব্যবহার করেছেন। তাঁর লেখা 'মসনবি' কে ফার্সি ভাষায় লেখা সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ হিসাবে তুলনা করা হয়।

২৬. জেমাইমা : জেমাইমা গোল্ড স্মিথ ধন্যাঢ্য ব্রিটিশ তরুণী। পেশায় ছিলেন সাংবাদিক। ১৯৯৫ সালে তিনি পাকিস্তানের বিশকাপ জয়ী অধিনায়ক ইমরান খানকে বিয়ে করেন। ২০০৪ সালে এই দম্পত্তির বিয়ে বিচ্ছেদ ঘটে। ইমরান ও জেমাইমার দুটি ছেলে আছে।

২৭. আলহামরা প্রাসাদ : মুসলিম শাসিত স্পেনের গ্রানাডায় অবস্থিত রাজকীয় প্রাসাদ। অপরূপ স্থাপত্য ও মুসলিম শিল্পকলার নিদর্শন সম্বলিত এই প্রাসাদ আজও পর্যটকদের জন্য আকর্ষণীয় স্থান। বর্তমানে এটি ইউনেস্কোর 'ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট' হিসেবে স্বীকৃত।

www.pathagar.com

২৮. আল আন্দালুস : বর্তমান স্পেন ও পর্তুগালের বিশাল অংশ জুড়ে স্থাপিত মুসলিম সাম্রাজ্য।

২৯. মুসলিম শাসিত স্পেন : উমাইয়া খলিফা ১ম আল ওয়ালিদের আমলে উত্তর আফ্রিকার গভর্ণর ছিলেন মুসা বিন নুসাইর। সে সময়ে এক অত্যাচারিত খ্রিষ্টান রাজা জুলিয়ান নির্যাতিত রাজা রডারিকের বিরুদ্ধে সাহায্য চান। মুসার নির্দেশে সেনাপতি তারিক বিন জিয়াদের নেতৃত্বে একটি ছোট্ট সেনাদল সাগর পাড়ি দিয়ে জিব্রাল্টার প্রণালী হয়ে স্পেনে প্রবেশ করে। ৭১১ সালে মুসলিম সেনাদলের সাথে তৎকালীন খ্রিষ্টান শাসক রাজা রডারিকের এক যুদ্ধ সংঘটিত হয়। যুদ্ধে মুসলিমরা বিজয়ী ও রডারিক নিহত হয়। এ বিজয়ের মধ্য দিয়ে এ অঞ্চলে মুসলিম শাসন কায়েম হয়। পরবর্তী সময়ে তারেক গভর্ণর মুসার সাথে এক হয়ে বিজয় অভিযান অব্যাহত রাখেন।

তারিক যে পাহাড়ের উপর অবতরণ করেন, তার নাম রাখা হয় জাবাল-উত-তারিক। অর্থাৎ তারেকের পাহাড়। কালক্রমে এই নাম পরিবর্তীত হয়ে পরিচিত হয় জিব্রাল্টার নামে।

মুসলিম শাসিত স্পেন ছিল সভ্যতার সোনালী যুগ। শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি, জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় স্পেন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল। বলা যায়, আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানের সূচনা স্পেনের মুসলিম বিজ্ঞানীদের হাত ধরেই হয়।

একসময়ে মুসলিমদের অন্তর্কলহ, কোন্দলের কারণে স্পেনের মুসলিম শক্তি দুর্বল হতে থাকে। রাণী ইসাবেলা ও রাজা ফার্ডিন্যান্ডের মিলিত শক্তির হাতে ১৪৯২ সালে তৎকালীন মুসলিম শাসকদের পরাজয়ের মধ্যে দিয়ে স্পেনে মুসলিম শাসনের অবসান ঘটে।

৩০. সারায়েভো : বসনিয়া হার্জেগোভিনার রাজধানী।

৩১. সভ্যতার সংঘর্ষ : আমেরিকার হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটির রাজনীতি বিজ্ঞানের প্রফেসর স্যামুয়েল পি হান্টিংটন ১৯৯৬ সালে লেখা এক বইতে এক নতুন তত্ত্ব নিয়ে হাজির হন। বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে সারা পৃথিবীতে পরাশক্তিগুলো মূলত সমাজতন্ত্র ও পুঁজিবাদের ভিত্তিতে বিভক্ত ছিল। এর উপরে ভিত্তি করেই চলছিল নানা সংঘাত, সংঘর্ষ। স্নায়ু যুদ্ধ পরবর্তী সময়ে সোভিয়েত রাশিয়ার পতনের পর এ বিভক্তির অবসান ঘটে।

হান্টিংটন নানা যুক্তি প্রমান দিয়ে উপস্থাপন করেন, আগামী দিনগুলোতে দেশের সাথে দেশের কিংবা আদর্শের সংঘাতের চেয়ে মূল সংঘাত হবে সভ্যতার সাথে সভ্যতার। তিনি বলেন, মূলত আগামীর বিশ্ব হবে পশ্চিমা সংস্কৃতির সাথে ইসলাম ও মুসলিম সংস্কৃতির সংঘাতের।

হান্টিংটনের এই তত্ত্ব 'সভ্যতার সংঘাত' নামে পরিচিত।

৩২. সুলতান সালাহ উদ্দিন আইয়ুবী (১১৩৭-১১৯৩) : পুরো নাম আন নাসর সালাহ উদ্দিন ইউসুফ ইবনে আইয়ুব। সংক্ষেপে সুলতান সালাহ উদ্দিন আইয়ুবী নামেই অধিক পরিচিত। তিনি ছিলেন তৎকালীন মিসর, সিরিয়া, ইয়েমেন, আফ্রিকাসহ বিশাল সম্রাজ্যের কুর্দী বংশোদ্ভুত শাসক। একদিকে বীর যোদ্ধা অন্যদিকে মহৎ হৃদয়ের অধিকারী সালাহ উদ্দিন ছিলেন মুসলিম অমুসলিম নির্বিশেষে সবার কাছে বিশেষ শ্রদ্ধা ও সম্মানের পাত্র।

জেরুজালেম নিয়ে তার সাথে তৎকালীন খ্রিষ্টান শাসকগোষ্ঠির সম্মলিত বাহিনীর সাথে একাধিক যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে সালাহ উদ্দিনের নেতৃত্বে মুসলিম বাহিনী জয়ী হয় এবং জেরুজালেম মুসলিমদের অধিকারে আসে। সালাহ উদ্দিনের মহত্ত্ব বিশ্বখ্যাত। এক ক্রুসেডের সময় সম্মিলিত খ্রিষ্টান বাহিনীর প্রধান ছিলেন ইংল্যান্ডের রাজা রিচার্ড। সে সময় রাজা রিচার্ড গুরুতর অসুস্থ ছিলেন। খ্রিষ্টান চিকিৎসকগণ তার বাঁচার আশা ছেড়েই দিয়েছিলেন।

সালাহ উদ্দিন রাজা রিচার্ডের অসুস্থতার খবর শুনতে পেয়ে ব্যক্তিগত চিকিৎসক পাঠিয়ে তাকে সুস্থ্য করে তুলেন। পাশাপাশি তিনি যুদ্ধক্ষেত্রেও রাজা রিচার্ডের প্রতি উদারতা দেখান। রাজা রিচার্ড সালাহউদ্দিনের ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে তার সাথে সন্ধি করে যুদ্ধ বন্ধ করে ফিরে যান দেশে। সালাহউদ্দিন উদারতা আজও ইতিহাসে বিখ্যাত হয়ে আছে।

৩৩. ক্রুসেড : পবিত্র নগরী জেরুজালেম ও মসজিদে আকসা ইহুদি, খ্রিষ্টান ও মুসলিম তিন ধর্মের মানুষের কাছেই অত্যন্ত সম্মানিত। এই পবিত্র নগরীর উপর কতৃত্ব গ্রহণ নিয়ে বেশ কয়েকবার মুসলিমদের সাথে খ্রিষ্টানদের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ হয়। ইতিহাসে এই যুদ্ধগুলি ক্রুসেড নামে পরিচিত।

www.pathagar.com

গার্ডিয়ান পাবলিকেশন-এর প্রকাশিত বইসমূহ

ক্রম	বই ও লেখকের নাম	মূল্য
১.	প্যারাডক্সিক্যাল সাজিদ- আরিফ আজাদ	৩০০/-
২.	কয়েকটি গল্প : অতঃপর- নাসরিন সুলতানা সিমা	১৩০/-
৩.	হালাল বিনোদন- মূল : ইসমাঈল কামাদার অনুবাদ : মাসুদ শরীফ	১৫০/-
৪.	৫০০০ প্রশ্নোত্তরে সীরাতুন্নবী ﷺ- ড. মো: আবদুল মান্নান	৪৯০/-
৫.	নেতৃত্বের প্রাথমিক বোঝাপড়া- ড. মুনির উদ্দিন আহমেদ (বাদল)	২০০/-
৬.	মুক্তিযুদ্ধের বয়ানে ইসলাম- পিনাকী ভট্টাচার্য	২৫০/-
৭.	বি স্মার্ট উইথ মুহাম্মাদ ﷺ- মূল : ড. হিশাম আল আওয়াদি অনুবাদ : মাসুদ শরীফ	২৫০/-
৮.	বিয়ে- রেহনুমা বিনত আনিস	২৫০/-
৯.	দ্যা রিভার্টস : ফিরে আসার গল্প– সামছুর রহমান ওমর, কানিজ শারমিন সিঁথি	৩৫০/-
১০	বন্ধন– উস্তাদ নোমান আলী খান	২৫০/-
১১	ডেসটিনি ডিজরাপ্টেড- মূল : ড. তামিম আনসারি অনুবাদ : আলী আহমাদ মাবরুর	৪৫০/-
১২	এরদোয়ান : দ্যা চেঞ্জ মেকার- হাফিজুর রহমান	৪০০/-

প্রকাশিতব্য বইসমূহ

১. প্যালেস্টাইনের বুকে ইজরাঈল- মো: আছাদ পারভেজ
২. আমরা বাংলাদেশি বাঙালি- মো: আছাদ পারভেজ
৩. মানবাধিকার ও ইসলাম- প্রফেসর ড. মো: নুরুল ইসলাম
৪. জ্বলে উঠো সাহসের মন্ত্রে- আ জ ম ওবায়দুল্লাহ
৫. আল কুরআনের বিষয়ভিত্তিক আলোচনা- ডা. আবদুল মোমিন
৬. রোহিঙ্গা : অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ- মো: আছাদ পারভেজ
৭. বেবি'জ ডায়েরি (শিশুদের জন্মদিনের ডায়েরি)
৮. বাতিঘর– মাসুদা সুলতানা রুমি

www.pathagar.com

গার্ডিয়ান
পাবলিকেশনস

www.pathagar.com

এই ধর্মবিবর্জিত আধুনিক সময়ে আঠারো-উনিশ বছরের তরুণ-তরুণী আসলে কী চায়? কী তাদের সুখি করে? ঘুরে ফিরে আসবে দামি ল্যাপটপ, মোবাইল, নাটক-সিনেমা, গান, মাদক কিংবা একজন ভালোবাসার মানুষের কথা। কিন্তু বাস্তবেই কি এগুলো মানুষকে সুখি করতে পারে? তাই যদি হতো, তাহলে কেন আজ ঘরে ঘরে এত অশান্তি? কেন বাড়ছে আত্মহত্যা, হতাশা আর মাদকের ব্যবহার? কেন বাড়ছে খুন, হত্যা, ধর্ষণ? সত্যিকারার্থে মানুষের সুখ কোথায়? কোথায় পাওয়া যায় মনের গভীরের প্রশান্তি? আসলে মানুষের জীবনের উদ্দেশ্যই বা কী?

এসব প্রশ্নের উত্তর নিয়ে আমাদের প্রয়াস 'দ্যা রিভার্টস : ফিরে আসার গল্প'। আমরা জানব, পশ্চিমা দুনিয়ায় আধুনিক সব সুযোগ-সুবিধার মধ্যে বেড়ে ওঠেও কী করে মানুষ শান্তির আশায় হন্য হয়ে ঘুরছে। আমরা জানব, কী করে তারা খুঁজে পেলেন জীবনের আসল উদ্দেশ্য, আলোর পথ। জেনে নিব, অতীত মুছে ফেলে নতুন জীবন গড়তে কোন জিনিস তাদের উদ্বুদ্ধ করেছে।

গার্ডিয়ান
পাবলিকেশন
৩৪, বাংলাবাজার, ঢাকা-১০০০।
www.guardianpubs com

ISBN: 978-984-92959-8-3